কুয়াশা ১৬

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ১৯৬৯

এক

সারওয়ার বললো, 'অসম্ভব!'

কাওসার বললো, 'সম্ভব।'

সারওয়ার বললো, 'না, সম্ভব নয়। দেবেন না।'

কাওসার নিজের অনুমানে অটল, 'কেন সম্ভব নয়, বাধাটা কোথায়?'

সারওয়ার তাকালো কাওসারের দিকে। যমজ ভাই ওরা। সারওয়ার একঘন্টার বড় কাওসারের চেয়ে। ওদের দুজনেরই বয়স ষোলো। সবেমাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বের হতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে। বাড়িতে বসে বসে সময় কাটছে না বলে সময় কাটানো যায় কিভাবে তাই নিয়ে আলাপ করছিল।

প্রসঙ্গটা সারওয়ারই প্রথমে তুললো। কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় সে কথা ঠিক করতে পারছিল না ওরা। কাওসার কক্সবাজার, সিলেট ইত্যাদি জায়গার নাম করছিল। কিন্তু কোনটাই পছন্দ হচ্ছিলো না সারওয়ারের। হঠাৎ তার মারীর কথা মনে পড়ে। কাওসারকে কথাটা বলতে খুশির চোটে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সে। কিন্তু সারওয়ার হঠাৎ শুকনো মুখে বলে, 'কিন্তু অতো টাকা কোথায় পাবো। চাচা অতো টাকা কিছুতেই দেবেন না। মারী যেতে হলে চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে হবে না!'

সারওয়ারেরা তিন ভাই। বাবা মারা গেছেন বছর দু'য়েক আগে।মা গত হয়েছেন পাঁচ বছর হল। পাঁচ বছরের একটা ছোটো ভাই আছে ওদের। মন্টি।

কাওসার বলে, 'তাহলে মারী যাওয়া হবে না?' বড় ভাইয়ের উপরই যেন অভিমান করে সে।

সারওয়ার কথা বলে না। মনটা দমে গেছে তারও। পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়াতে যাবে ভাবতেই সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার। কাওসারের চেয়ে কম আগ্রহী নয় সে। কিন্তু মারীতে বেড়াতে যাওয়া সহজ কথা নয়। মাসখানেক না থাকলে বেড়ানো হবে না ভালো করে। যেতে হবে প্লেনে। ফিরতেও হবে প্লেনে। পানির জাহাজে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে। যদিও প্লেনের চেয়ে জাহাজের ভাড়া অনেক কম।

'তুমি এতো ভীতু তা আমি জানতাম না,' কাওসার বলে।

তবু কথা বলে না সারওয়ার। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে। তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায় কাওসার চেয়ার ছেড়ে। বলে, 'ঠিক আছে, তুমি না যেতে চাইলে যেয়ো না, আমিই গিয়ে চাচাকে বলি। তোমার মতো নই আমি, বুঝলে!'

'এই দাঁড়া,' হেসে ফেলে ডাকে সারওয়ার। বলে, 'চল, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু তুই বলবি কথাটা। আমি কিছু বলতে পারবো না।'

'আমিই বলবো। এসো।'

দু'ভাই ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। দুজনেই সমান লম্বা। স্বাস্থ্যও একই রকম। সারওয়ার গায়ের রঙের দিক থেকে একটু ফর্সা কাওসারের চেয়ে।

সারওয়ার যদিও বড় কাওসারের চেয়ে তবু বড়কে বড় বলে মানতে আপত্তি কাওসারের। তুই না বলে তুমি বলে সে সারওয়ারকে, কিন্তু কাজে এবং কথাবার্তায় গার্জেনগিরি ফলাতে কুণ্ঠা নেই তার। আসলে দু'ভাইয়ের সম্পর্কটা ওদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ছোটবড় ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে ওরা ছোট বেলা থেকে। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ে এতো বড়টি হয়েছে ওরা। ঝগড়াঝাঁটি হয় না যে তা নয়। কিন্তু বন্ধুতে বন্ধুতে যেমন ক্ষণস্থায়ী অভিমানের পালা চলে, তার চেয়ে বেশি কিছু না। মা-বাবা হারা এই ছেলে দুটি ছোটবেলা থেকে একজন আরেকজনের সঙ্গী, সহায়, বন্ধু।

দুরুদুরু বুকে মি. নাসিরুদ্দিনের ঘরে পা রাখলো ওরা।

'কি ব্যাপার?'

মি. নাসির সোফায় বসে ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। ভাইপোদেরকে অমন জড়সড় হয়ে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াতে দেখে একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করেন তিনি।

'বল!' সারওয়ার কাওসারের কানে কানে বলে।

'তুমি বলো না!'

বাহাদুরি দেখানো শেষ হয়েছে কাওসারের। চাচার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে কথা সরতে চাইছে না তার।

'ব্যাপার কি বল তো! অমন বোকার মতো ঠেলাঠেলি করছিস কেন? কি চাই?'

'আমরা মারীতে বেড়াতে যাব···তাই···'

'মারীতে বেড়াতে যাবি!' সারওয়ারের কথা শুনে আঁতকে ওঠেন মি. নাসির।

কাওসার এবার কথা বলার সাহস পায়। সে বলে, 'হ্যাঁ, রেজাল্ট বের হতে এখনও দেরি আছে তো, তাই আমরা ঠিক করেছি মারী যাবো। আপনি শুধু অনুমতি দিলেই···

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন মি. নাসির কাওসার এবং সারওয়ারের দিকে। মুখ থেকে কথা সরে না তাঁর।

চাচাকে কথা বলতে না দেখে সারওয়ার শঙ্কিত হয় মনে মনে। কিন্তু কাওসার উৎফুল্ল স্বরে বলে বসে, 'আপনি অনুমতি দিচ্ছেন তো!'

'না!'

গম্ভীর স্বর গমগম করে ওঠে মি. নাসিরের। চমকে উঠে তাকায় ওরা দুজন। মুখ দুটো শুকিয়ে যায় পলকের মধ্যে। সারওয়ার সামলে নেয় কোনমতে নিজেকে। কিন্তু কাওসার কিছুটা সেন্টিমেন্টাল ধরনের। চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে তার প্রচণ্ড অভিমানে। এতো সাধের আশায় এমন করুণ ভাবে ছাই পড়বে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

'মারীতে বেড়াতে যাবে! বলি বেড়াতে গেলে টাকাপয়সার দরকার সে খেয়াল আছে?'

খেঁকিয়ে ওঠেন এবার মি. নাসির। ওদেরকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও রাগ হয় তাঁর। বলেন, 'আবদারের একটা সময় আছে, সীমা-পরিসীমাও আছে! জানিস, কতো টাকা লাগবে মারীতে বেড়াতে গেলে দুজনের?'

কথা বলতে পারে না ওরা।

'পাঁচ হাজার টাকা লাগবে। তার কমে তোমাদের হবে না, রাজা বাদশা তোমরা!'

এ কথারও উত্তর দেয় না ওরা। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'যাও! আমাকে এভাবে আর বিরক্ত কোরো না কখনও। আমার মাথা ঠিক নেই এখন হাজারো দুশ্চিন্তায়, ওনারা আবদার নিয়ে এলেন—মারীতে ছুটি কাটাতে যাবো। আশ্চর্য!'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় ওরা দুজন। একজন অন্যজনের দিকে তাকাতে পারে না।

'মন্টি কোথায়? ছোটো ভাইটার দিকে একটু খেয়াল দিয়ো। কখন, কোথায় কোথায় যে সে ঘুরে বেড়ায় কে জানে। নিজেদেরকে নিয়ে সবসময় ব্যস্ত না থেকে তার কথাও ভেবো একটু। পাঠিয়ে দাও ওকে আমার কাছে।' মি. নাসির তিরস্কার করে বলেন কথাগুলো।

মাথা নেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে ওরা। বারান্দা ধরে হাঁটে ওরা পাশাপাশি। কেউ কারও দিকে তাকায় না। কথাও বলে না। মিসেস নাসিরের ঘর পেরিয়ে হাঁটতে থাকে ওরা মাস্টার সাহেবের ঘরের দিকে।

মি. নাসির বছরখানেক হলো দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন! প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেছেন বছর কয়েক আগে। কোন পক্ষেরই ছেলেপুলে হয়নি।

চাচীর ঘরের দিকে আড়চোখে তাকায় ওরা। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন তিনি

একমনে। মাস্টার সাহেবও তাঁর নিজের ঘরে বই হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। ওদের পদশব্দেও চোখ তুলে তাকান না তিনি।

বারান্দা থেকে নেমে উঠান পেরিয়ে বাগানে প্রবেশ করে ওরা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সারওয়ার। বলে, 'আমি আগেই বলেছিলাম—অসম্ভব। টাকা দিতে পারবেন না চাচা।'

'দেবেন না বলো! দিতে পারবেন না কেন, ইচ্ছে করলেই দিতে পারতেন। কিন্তু দেবেন না।'

রাগে ফেটে পড়ে কাওসার। সারওয়ার কি যেন ভাবে। তারপর কাওসারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নারে, দিতে পারলে ঠিক দিতেন। কিন্তু দেবেন কিভাবে বল? আব্বার উইলে কি লেখা আছে জানিস না?'

চুপ করে যায় এবার কাওসার। মাথা নিচু করে বসে পড়ে সে বাগানের ঘাসে। সারওয়ার বলে, 'আব্বা উইল করে গেছেন এমনভাবে যে ব্যাঙ্ক থেকে এক হাজার টাকার বেশি কোনো মাসে তোলা যাবে না। এখন ভেবে দেখ, চাচা অতো টাকা পাবেন কোথায়? চাইলেই তো আর হলো না।'

'দাদা।' হঠাৎ উত্তেজিত গলায় ডেকে ওঠে কাওসার।

'কিরে?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সারওয়ার।

'দাদা, উইলে আব্বা আরও একটা কথা লিখে গেছেন, মনে নেই তোমার?' চাপা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে কাওসার।

সারওয়ার রীতিমতো আশ্চর্য হয় এবার। কাওসারের কথা ঠিক ধরতে পারে না সে। বলে, 'কি কথা লিখে গেছেন আব্বা উইলে? আর তুই এমন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠছিস কেন?'

অধৈর্য স্বরে কাওসার বলে, 'কিছু মনে থাকে না তোমার! উইলে লেখা আছে, ছেলেরা অসুখবিসুখে পড়লে বা তারা তেমন গুরতর কোনো বিপদের মধ্যে পড়লে, উপযুক্ত কারণ দর্শাবার পর, ব্যাঙ্ক থেকে যে কোনো পরিমাণ টাকা তুলতে পারবেন চাচা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে হয়েছে কি?'

'বলছি!' নিচু স্বরে কথাটা বলে চারপাশে তাকায় কাওসার।

ওদের ঠিক পিছনেই রান্নাঘর। বাঁ পাশে কয়েকটা গাছ। দূরে দেখা যাচ্ছে ড্রাইভারের ঘর এবং গ্যারেজ দুটোর ছাদ। বাড়ির গেটটা এখান থেকে দেখতে পাবার কথা নয়। ডান পাশে বাগানের বিস্তারিত এলাকা। সামনেও একই রকম।

'বসো, গোপনীয় একটা পরামর্শ আছে...'

কাওসারের ব্যবহারে হতবাক হবার জোগাড় সারওয়ারের। কথা না বলে ঘাসের উপর বসে পড়ে সে। কাওসার দাদার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে। কানে কানে কথা বলার মতো এগিয়ে এসে সে বলে, 'মন্টিকে চুরি করবো আমরা! তারপর পাঁচ

হাজার টাকার দাবি জানিয়ে চিঠি লিখবো চাচাকে!'

নিচু স্বরে ষড়যন্ত্রটার কথা বলতে চাইছিল কাওসার। কিন্তু উত্তেজনায় তার গলা বেশ চড়ে আছে।

'কি বলছিস তুই কাওসার! মাথাটা…'

'আহা! ঘাবড়াচ্ছ কেন তুমি, সত্যিসত্যি তো আর মন্টিকে চুরি করছি না আমরা। একদিন কি দুদিন লুকিয়ে রাখবো শুধু। মাঝখান থেকে মারীতে বেড়াতে যাবার টাকা পেয়ে যাবো আমরা।'

'কিভাবে?' ধীরে ধীরে সারওয়ারও আগ্রহী হয়ে ওঠে।

'আমাদের চিঠিতে পাঁচ হাজার টাকার দাবি থাকবে। পাঁচ হাজার টাকা দিলে মন্টিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। চিঠি দেখিয়ে চাচা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা, তুলে…।'

'কিন্তু আমাদের হাতের লেখা দেখে বুঝে ফেলবেন না চাচা?'

'আমরা লিখবো কেন, প্রথমে একটা খসড়া করে নিয়ে সেটাকে বাংলা টাইপ রাইটার দিয়ে টাইপ করিয়ে নিয়ে আসবো।'

'কোথা থেকে? যে টাইপ করবে সে জেনে ফেললে…'

'জানবে না। আমাদের স্কুলে টাইপ রাইটার আছে। বেয়ারাকে পয়সা দিয়ে আমরা নিজেরাই টাইপ করে আনবো।'

'তার পর?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করে ওঠে সারওয়ার।

'চিঠিতে লেখা থাকবে—টাকা না দিলে তোমাদের মন্টিকে আর কখনও দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু…'

কাওসার দাদাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'চিঠির নিচে লেখা থাকবে—ব্ল্যাক অ্যারো।

'ব্ল্যাক অ্যারো!'

'না, হাতে লিখলে বা টাইপ করলে চলবে না। ব্যাপারটার গুরুত্ব কমে যাবে তাতে! রবারস্ট্যাম্প তৈরি করতে হবে একটা।'

'কিন্তু মন্টিকে কোথায় লুকিয়ে রাখবো?'

কাওসার বলে, 'তাও ঠিক করে ফেলেছি। বাগানের শেষ মাথায় যে কয়েকটা ঘর আছে, তার একটিতে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবো ওকে।'

'কিন্তু ঘরগুলোতে যে তালা মারা। আর অনেক মালপত্তর ঠাসা?'

'চাবি জোগাড় করা কি আর অতোই কঠিন। আমি জানি ঐ ঘরগুলোর চাবি কোথায় ফেলে রেখেছেন চাচা। আর মালপত্তর সরিয়ে একজনের মতো জায়গা বের করে নিতে কতক্ষণ?'

সারওয়ার বলে, 'কিন্তু মন্টি যদি ওখানে যেতে না চায়?'

'সে আমি দেখবো। ঠিক ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবো।'

'কিন্তু বাড়ির ভিতরেই রাখবো ওকে? চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলে?'

'কেউ শুনতে পাবে না হাজারো চিৎকার করলেও। ওখানে বোমা ফাটলেও কেউ শুনতে পাবে না এখান থেকে।'

'কিন্তু ক'দিন রাখতে হবে ওকে?'

'ক'দিন আর, বড় জোর তিন দিন।'

সারওয়ার বললো, 'এই কদিন খাবে কি ও?'

'আমরা খাবার দিয়ে আসবো।'

'কিন্তু···যদি ধরা পড়ে যাই?'

কাওসার বলে, 'ধরা তো পড়বোই। কিন্তু, তখন আমরা মারীর পথে প্লেনে চড়ে বসেছি।'

এরপর ওরা দুজন নিচু স্বরে আরও খানিকক্ষণ গোপন পরামর্শ করলো। তারপর মন্টির খোঁজে দুজনে উঠে এলো বারান্দার উপর। কিচেনরুমে ঢুকে দেখলো সোনার মায়ের কোলে চড়ে কোকো খাচ্ছে মন্টি। মন্টির খুব প্রিয় কোকো।

সারওয়ার বললো, 'সোনার মা, ওকে খাইয়ে চাচার ঘরে পৌঁছে দিও। চাচা ওর খোঁজ করছিলেন।'

'দাদা কোকো খাবে?' পাঁচ বছরের মন্টি দাদাদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে।

'না, তুমি খাও, মন্টি।' উত্তর দেয় কাওসার।

তারপর ওরা বেরিয়ে আসে কিচেনরুম থেকে। ড্রইংরুমের একটা আলমারি থেকে কাওসার পুরানো একগোছা চাবি বের করে পকেটে ভরে নেয়। এরপর সিধে গিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে হাজির হয় ওরা।

জমিদারী আমলের বাড়ি এটা। বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল। ওদের দাদা তৈরি করেছিলেন এটা। নাম রেখেছিলেন শান্তিনীড়। বাড়ির পিছন দিকে নদী। নদীর ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ এসে পৌঁছেছে বাড়ির ঠিক নিচে। নদীর কিনারায় একটা বোট-হাউসও আছে। আজকাল আর সেটা ব্যবহার হয় না। একটা মোটরবোট আছে ওদের। মাঝে মধ্যে ওরা দুভাই মোটরবোটে করে বেড়িয়েটেড়িয়ে আসে।

নদীর কিনারা থেকে বাড়িটা প্রায় আড়াইশ গজ দূরে। মধ্যবর্তী জায়গাটায় নানারকম গাছ-গাছড়া জন্মেছে।

বাড়ির সদর গেটটাকে বাঁ দিকে রেখে ওরা এগোলো। গেটটাও অনেক দূরে। বাড়ির ডান দিকে বাগান। বিরাট এলাকা নিয়ে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি শত শত গাছ। বাগানের শেষ প্রান্তে কয়েকটি ছোটো ছোটো ঘর। আজেবাজে মালপত্তরে ঠাসা।

পৌঁছে গেল ওরা। বারান্দায় উঠে চাবি দিয়ে একটা ঘরের দরজা খুললো কাওসার। দিনের বেলাতেও ঘরটা অন্ধকার। জানালাগুলো খুলে দিতে আলো এলো

ঘরটায়। রাশ রাশ ছেঁড়া বালিশ, তোশক, কাঠের ভাঙা তক্তা ইত্যাদিতে ঘরটা ভরাট। দেরি না করে কাজে লেগে পড়লো ওরা। আধঘন্টার মধ্যে অর্ধেকটা ঘর পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভাঙা একটা হ্যারিকেন দেখে খুশি হলো ওরা। মন্টিকে রেখে যাবার সময় জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। অবশ্য তেলের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ধকার রাতে হ্যারিকেন না থাকলে ভয় পাবে মন্টি ঘুম থেকে উঠে। বিছানাপত্রের দরকার হবে না। ছেঁড়াখোঁড়া তোশক আর বালিশ সাজিয়ে একটা চমৎকার বিছানাও করে ফেললো ওরা।

ওখানকার কাজ সেরে ফিরে এসে স্নানাহার করে যে যার ঘরে ঠাঁই নিলো। একটু পরই কাওসার এলো সারওয়ারের ঘরে। বেলা তখন দুটো।

'এই সুযোগ!' ফিসফিস করে বললো সে।

'চাচী কোথায় যেন গেলেন গাড়িতে করে। মন্টি ঘুমোচ্ছে। চাচার দরজা বন্ধ। সোনার মা খেতে বসেছে। আর মাস্টার সাহেব খেয়েদেয়ে ঘুমাচ্ছেন।

'আর ড্রাইভার?'

'বললাম তো, চাচী কোথায় যেন গেলেন। ড্রাইভারকে নিয়ে গেছেন।'

সারওয়ার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'কিন্তু মন্টি ঘুমোলে হবে কি করে?'

'হবে! আমি কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি ওকে। ঘুম ভাঙবে না। তুমি কেরোসিন আর মন্টির খেলনাগুলো নিয়ে এসো।'

সারওয়ার বলে, 'ঠিক আছে। কিন্তু তুই পারবি মন্টিকে নিয়ে যেতে? উঠে পড়লে?'

'উঠবে না! দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চললাম!'

দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল কাওসার। সারওয়ার চৌকির তলা থেকে একটা মাঝারি আকারের বোতল বের করলো কেরোসিনের। আগেই সে জোগাড় করে রেখেছে সুযোগ বুঝে। খেলনাগুলোর জন্যে ড্রয়িংরুমে যেতে হবে।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হলো সারওয়ার। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে তার। হঠাৎ বুঝি কেউ দেখে ফেলে জিজ্ঞেস করে বসবে—কোথায় যাচ্ছো তুমি?

ড্রয়িংরুমে একটা ট্রামগাড়ি এবং দুটো পুতুল দেখতে পেলো সারওয়ার। একহাতে কেরোসিনের বোতল, অপর হাতে খেলনাগুলো নিয়ে ড্রয়িংরুম থেকে বের হয়ে এলো সে। কিন্তু সোনার মাও খাবার ঘর থেকে বের হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে দেখতে পেলো সে। তাড়াতাড়ি আবার ড্রয়িংরুমে ঢুকে হাতের জিনিসগুলো ঘরের এক কোণে লুকিয়ে ফেললো। তারপর ঝটপট একটা বই তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলো। সোনার মা ড্রয়িংরুমেই এসে ঢুকলো। টেবিলের উপর

দুটো পিরিচ ছিলো, সে দুটো নিয়ে তখুনি বের হয়ে গেল সে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সারওয়ার। ইতিমধ্যেই কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে তার।

দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিলো এবার সারওয়ার। সোনার মা বাথরুমে ঢুকেছে। তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে আবার ড্রয়িংরুমের বাইরে এলো সারওয়ার। এবার সে কোনো দিকে ফিরে না তাকিয়ে বারান্দা থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো বাগানের দিকে।

কাওসারকে দূর থেকেই দেখতে পেলো সারওয়ার। বারান্দার উপর উঠে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'ওঠেনি?'

'না। ঘুমোচ্ছে! দাও, খেলনাগুলো ওর বিছানার পাশে রেখে দিই।'

সারওয়ারের হাত থেকে খেলনাগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকলো কাওসার। পিছন পিছন নিঃশব্দ পায়ে সারওয়ারও ঢুকলো। মন্টি বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে দেখতে পেলো সে। হ্যারিকেনটায় তেল ভরে দেয়াশলাই বের করে জ্বাললো সে। সলতেটা কম করে দিলো। কাওসার ইতিমধ্যে ঘরের সব কটা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

'চলো!'

কাওসার তাড়া লাগালো জানালাগুলো বন্ধ করেই। মন্টির ঘুমন্ত মুখের দিকে চোখ পড়তে বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে সারওয়ারের। কাজটা কি ভালো হচ্ছে? মনটা কেমন যেন করে ওঠে। কাওসারের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চায় সে। কাওসার বুঝতে পারে দাদার মনের কথা। তারও কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা আতঙ্ক জাগে মনে। এতো আদরের ভাইটিকে এখানে ফেলে রেখে যেতে তারও ভালো লাগে না। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে যেতেও কেমন যেন লাগে। হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, আমি নাহয় রাতেরবেলা ওর কাছে এসে শুয়ে থাকবো। ভোর হবার আগে ঘরে ফিরে গেলেই হবে। কি বলো?'

কি যেন বলতে চায় সারওয়ার। কিন্তু মুখ থেকে কথা বের হয় না তার। নিজেদের অপরাধের সীমা অনুধাবন করে বোবা হয়ে গেছে সে।

'চলো দাদা! এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় আমাদের।'

একরকম ঠেলে ঠেলেই সারওয়ারকে বের করে আনে কাওসার ঘর থেকে। চাবি বের করে ঘরটায় তালা লাগাবার সময় হাত দুটো কাঁপতে থাকে তার। চোখ দুটোও ছলছল করে ওঠে মায়ায়।

তালা লাগিয়ে কাওসার বলে, 'বাড়িতে নয়, চলো বাইরে বের হয়ে পড়ি আমরা।'

সারওয়ার বলে, 'কেন?'

'একটু পরই মন্টির খোঁজ করবে সবাই। আমাদের শুকনো মুখ দেখে ধরে ফেলতে পারে যে আমরা মন্টির কথা জানি। তারচেয়ে চলো সিনেমা দেখে আসি। বাড়ি ফিরে হঠাৎ শুনবো খবরটা, তখন আমাদের শুকনো মুখ দেখে ওরা কিছু

বুঝতে পারবে না। কিন্তু সাবধান দাদা, ধমক খেয়ে ফাঁস করে দিয়ো না যেন কোনো কথা! তাহলে আর লাঞ্ছনা গঞ্জনার সীমা থাকবে না।'

'তাই চল।' যন্ত্রচালিতের মতো বলে সারওয়ার।

কাওসার বলে, 'সিনেমায় যাবার আগে স্কুলে যেতে হবে, আর রবারস্ট্যাম্প বানাবার দোকানেও যাবো। আসার সময় নিয়ে আসবো ওটা।'

'স্কুলে কেন?' সারওয়ার প্রশ্ন করে।

কাওসার বলে, 'চিঠি টাইপ করতে হবে যে, ভুলে গেছো নাকি কথাটা?'

সারওয়ার বলে, 'ওঃ, হ্যাঁ!'

সন্ধ্যার পর বাড়ির দিকে ফিরলো ওরা।

বাড়ির গেটের কাছেই নাটকের সূচনা হলো। ড্রাইভার শামসু রাস্তার উপর ছটফট করছিল ওদের অপেক্ষায়।

'সারওয়ার সাহেব! মন্টি কোথায়!'

'কি হয়েছে শামসু?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কাওসার। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে মিসেস নাসির বের হয়ে এলেন।

'একি! তোমরা মন্টিকে নিয়ে যাওনি? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?'

সারওয়ার মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। চাচীর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো সে। ড্রাইভার ভীত গলায় বললো,'মন্টিকে দুপুরবেলা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে! আপনারা নিয়ে যাননি তাকে সঙ্গে করে?'

'কি বলছো, শামসু? মন্টিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!' কাওসার আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে ওঠে।

সারওয়ার চাচীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'এসব কি বলছেন, চাচী! মন্টি...'

মিসেস নাসির ধীরে ধীরে বলেন, 'তার মানে মন্টি তোমাদের সাথে যায়নি!'

সারওয়ার বলে, 'সেকি কথা! আমরা তো সিনেমায় গিয়েছিলাম। যাবার সময় মন্টি আপনার ঘরে ঘুমোচ্ছিল দেখে গেলাম!'

চিৎকার করে প্রশ্ন করে কাওসার, 'সব কথা খুলে বলুন, চাচী! মন্টি...'

মিসেস নাসির বলেন, 'মন্টিকে আমার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি মার্কেটিং করতে গিয়েছিলাম ড্রাইভারকে সাথে নিয়ে। ঘন্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি ঘরে মন্টি নেই। সারা বাড়ি খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। পুলিসে খবর দেয়া হয়েছে। তোমার চাচা থানাতেই আছেন, কোনো খবর পাবার আশায়।'

সন্ধ্যা সাতটার সময় মি. নাসির থানা থেকে বাড়িতে ফোন করে জানতে চাইলেন কাওসার এবং সারওয়ার ফিরেছে কিনা। ফোন ধরলেন মিসেস নাসির। এর

আধঘন্টা পরই ফিরে এলেন মি. নাসির। ফিরেই দু'ভাইকে জেরায় জেরায় ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। প্রকৃতপক্ষে পাগলপারা হয়ে গেছেন তিনি মন্টির নিরুদ্দেশে। বাড়ির সব লোককে ধমক মারছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর চোখে জল এসে পড়ছে থেকে থেকে। মুখে কালো রঙের ছাপ পড়েছে। চোখ দুটো লাল। মাথার চুল বিশৃঙ্খল।

জেরার উত্তরে বেশিরভাগ সময় মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো ওরা দু'ভাই। মি. নাসিরও ব্যস্তভাবে চলে গেলেন একসময়। খবরের কাগজের অফিসে মন্টির নিখোঁজ সংবাদটা পৌঁছে দিতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি। আসার সময় থানা থেকে আরও একবার ঘুরে এলেন। এর একটু পরই প্রৌঢ় মাস্টার সাহেব ফিরলেন। মন্টির নিখোঁজে তিনিও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি কয়েক ঘন্টা মন্টির খোঁজে।

কাওসার ও সারওয়ার বাড়ির গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো ঘন্টা দুয়েক। ওদের চাচী মিসেস নাসিরও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠায়। রাস্তার এদিক ওদিক আশায় আশায় সারাক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। যদি কেউ মন্টিকে খুঁজে পেয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতে আসে এই আশায়।

ড্রাইভার শামসু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আবার বের হয়ে পড়লেন মাস্টার সাহেব। যাবার সময় ওদের দু'ভাইকে বাড়ি থেকে বের হতে মানা করে গেলেন। মিসেস নাসির মেয়েমানুষ, বাড়িতে আর একজন মেয়েমানুষ সোনার মা ছাড়া আর কেউ থাকবে না ওরাও বের হয়ে গেলে, তাই।

সোনার মা বারান্দায় বসে কাঁদছে সারাক্ষণ। ঘন্টা দুয়েক পর ওরা তিনজন ফিরে এলো গেট ছেড়ে বাড়িতে। ড্রয়িংরুমে বসলো ওরা। কারও মুখে কথা নেই। গম্ভীর একটা পরিবেশ। দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা!

আরও দু'ঘন্টা কাটলো অপেক্ষায় অপেক্ষায়।

মি. নাসির ফিরে এলেন নিরাশ হয়ে। মাস্টার সাহেব এবং ড্রাইভারও ফিরলো। সোনার মাকে কোনমতে থামানো গেল না। একনাগাড়ে কেঁদেই চলেছে সে। হাজার হোক, জন্মাবার পর থেকে মন্টির দেখাশোনার ভার তার উপরই ছিলো। মা হারা ছেলেটির সে ছিলো মায়েরও বাড়া।

খাওয়া দাওয়া করার কথা কেউ তুললো না। কাওসার ও সারওয়ারকে যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলা হলো। একটু পরই মি. নাসির বারান্দা থেকে ওদের দু'ভাইয়ের উদ্দেশে বললেন, 'জানালা দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকো তোমরা। বাইরে বের হবার দরকার নেই। আমি বেরুচ্ছি।'

একটু পর মাস্টার সাহেবও ঐ এক কথাই বলে গেলেন ওদেরকে উদ্দেশ্য করে। সব শেষে ওদের চাচী মিসেস নাসির এসে সাবধান করে দিয়ে বললেন,

'বিপদ যখন একটা ঘটেছে তখন বলা যায় না এরপর কি হয় না হয়, তোমরা সব জানালা দরজা বন্ধ করে দাও।'

রাত একটা পর্যন্ত নিঃশব্দে পড়ে রইলো সারওয়ার তার বিছানায়। মন্টির জন্যে অসহ্য একটা অপরাধবোধে জর্জরিত হচ্ছে সে। বালিশ ভিজে গেছে এতক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে। খাওয়া হয়নি সেই দুপুরের পর থেকে মন্টির। কথাটা ভাবতেই বুকে একটা তীব্র যন্ত্রণা জাগছে তার।

ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠে বসলো সারওয়ার। বিছানা থেকে মেঝেতে নেমে দরজার দিকে এগোলো সে নিঃশব্দ পায়ে। দরজা খুলতে গিয়েই থমকাল সে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে হঠাৎ! আকাশে কখন মেঘ জমে উঠেছে খেয়ালই করেনি সে।

বৃষ্টি থামলো আধঘন্টা পর।

কোনো শব্দ না করে দরজা খুলে পা পা করে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে চললো সারওয়ার। গামবুটটা পরে নিয়েছে সে। বৃষ্টিতে মাটি ভিজে কাদা হয়ে গেছে। গামবুট না পরলে পায়ে কাদা লাগবে, পিছলে পড়ারও ভয় আছে।

কাওসারের সাথে কোনো কথা বলার সুযোগ হয়নি সারওয়ারের। মন্টিকে কে খাবার পৌঁছে দিতে যাবে তাও ঠিক হয়নি। সারওয়ার ঠিক করে ফেলেছে সে-ই চুপিচুপি মন্টিকে খাবার দিয়ে আসবে। আর মন্টি যদি খুব বেশি কান্নাকাটি করে তবে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ঘরে। তারপর যা থাকে কপালে। এমন নির্মমতা করা উচিত হয়নি তাদের কোনমতেই। বাড়ির সব মানুষকে এভাবে দুশ্চিন্তায় ফেলা রীতিমত একটা পাপ।

কাওসারকে ডাকবে না ভাবলো সে। চাচী এবং সোনার মা কান খাড়া করে জেগেই আছে যে যার ঘরে। ডাকতে গেলে দরজা খুলে বের হয়ে পড়বে বাইরে। ধরা পড়ে যেতে হবে তখন।

রান্নাঘর থেকে বিশেষ করে টফি এবং কোকো নিলো সারওয়ার। তাছাড়া রুটি, জেলী, কলা এবং সন্দেশও একটা প্লেটে সাজিয়ে নিলো।

টর্চ নিয়েছিল ঘর থেকে। কিন্তু তখুনি সে জ্বাললো না সেটা। বারান্দা থেকে নেমে বাগানের সীমানায় যতক্ষণ না পৌঁছুলো ততক্ষণ অন্ধকারে আন্দাজ করে করে পা বাড়ালো সে। বাগানে পৌঁছে টর্চ জ্বাললো।

গামবুট পরা সত্ত্বেও অতি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিলো সারওয়ারকে। ঝমঝম করে একনাগাড়ে আধঘন্টা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাগানের নরম মাটি বৃষ্টির পানিতে প্যাচপেচে কাদা হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে পিছলে পড়ার ভয়।

আর এক ভয়! হঠাৎ সারওয়ার যেন জমে গেল পাথর হয়ে। কাঁপা কাঁপা বুকে মাথার উপর তাকালো সে। গাছের পাতা থেকে মাথার উপর দু'এক ফোঁটা পানি পড়েছে। ভূতের ভয় চেপে ধরলো। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে সে কথা মনে

পড়লো না তার তখুনি। চমকে উঠে ভাবলো সে, ভূত বুঝি তার গায়ে-মাথায় থুথু ফেলছে।

দৈত্য! রাতের নির্জন বাগানের সবগুলো গাছই যেন মস্ত মস্ত দানবের মূর্তি হয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৈত্যদের একটা চোখ থাকে। সারওয়ার ভাবলো, একচোখা দৈত্যগুলো কটমট করে চেয়ে আছে তার দিকে।

মিনিট খানেক কাটলো। চাঁদের আলো ফুটছে বৃষ্টির পর। চোখে সয়ে এলো আস্তে আস্তে গাছ-পালার কালো ছায়া। মনে পড়লো ভূতের থুথু নয়, বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে তার গায়ে গাছের পাতা থেকে। মনে মনে একটু হাসলো সে নিজেকে সাহস দেবার জন্যে। তারপর পা বাড়ালো।

হাঁটতে হাঁটতে বুকটা কেমন যেন একটা আনন্দে ভরে উঠলো সারওয়ারের। আদরের ছোটো ভাইটির প্রতি সত্যি সত্যি জঘন্য ব্যবহার করেছে তারা। যাই হোক, খাবার দেখে খুশি হবে মন্টি। সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে সারওয়ার ওকে আদর করে।

বাগানের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে সারওয়ার দেখলো সামনের দিকে নিচু মতো জায়গাটায় বৃষ্টির পানি জমেছে। এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। ঘুরে যেতে হবে।

ঘুর পথে হেঁটে মন্টির ঘরের বাঁ পাশের জানালার ধারে গিয়ে পৌঁছুলো সে। কি মনে করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে টর্চ দিয়ে ঠেলা দিলো সারওয়ার কপাটে। বেশ জোরেই চাপ দিয়েছিল সে জানালার কপাটে। পুরানো হয়ে গেছে ছিটকিনি। স্ক্রু খুলে পড়ে গেল ছিটকিনিটা। জানালার কপাট দুটো দু'পাট হয়ে খুলে গেল। ঘরের ভিতর তাকালো সারওয়ার কৌতূহলী চোখে। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুকটা।

ঘরের একটি মাত্র দরজার পাল্লা দুটো হাঁ হাঁ করছে!

পলকের মধ্যে চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল সারওয়ারের। জানালার গা ঘেঁষে সরে এলো সে আরও একটু। ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে বারবার তাকালো। হ্যারিকেনটা এখন জ্বলছে ঘরে। ঘরটা বেশ আলোকিত। কিন্তু মন্টির বিছানায় মন্টি নেই! ঘরের কোনদিকেই কারো ছায়ামাত্র দেখা গেল না!

জানালার সামনে থেকে ছিটকে সরে এলো সারওয়ার। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে ওর। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না সে। আবার একবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু না, চোখের ভুল হয়নি তার। সত্যি সত্যি ঘরে কেউ নেই।

থরথর করে কেঁপে উঠলো সারওয়ারের ঠোঁট দুটো। নিজেকেই কি যেন সে বলতে চাইলো। একটা অশুভ আশঙ্কায় দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে যেন তার। জানালার সামনে থেকে সরে দুরু দুরু বুকে কাঁপা কাঁপা পায়ে ঘরটার বারান্দার দিকে এগোল সে। বারান্দার দিকে পৌঁছে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। হঠাৎ

নিজের অজান্তেই ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল তার। কাঁপা কাঁপা, ভীত এবং ব্য. গলায় ডেকে উঠলো, 'মন্টি!'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না মন্টির।

ভয়ঙ্কর একটা ভয় জাগলো সারওয়ারের বুকে। চোখ দুটো শক্ত হয়ে উঠলো। জলে ভরে গেল পলকের মধ্যে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত চেপে বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখলো সে। দ্বিতীয় সিঁড়িটিতে পা রাখতে রাখতে টর্চের আলোর পিছু পিছু তার চোখ জোড়া গিয়ে পড়লো হঠাৎ বারান্দার উত্তর প্রান্তে।

'অ্যাঁক!' ডুকরে কেঁদে ওঠার মতো অদ্ভুত একটা আর্তধ্বনি বের হলো সারওয়ারের গলা চিরে।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের প্লেটটা বারান্দার সিঁড়িতে পড়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বারান্দার উত্তর প্রান্তে পড়ে থাকা কাওসারের মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে রইলো সারওয়ার। তার হাতের টর্চটা তখনও কাওসারের মুখের উপর তীব্র আলো ছড়াচ্ছে!

রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে বারান্দার উপর। কাত হয়ে পড়ে আছে লাশটা। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রয়েছে মাথাটা। পাশেই পড়ে রয়েছে একটি প্লেটের টুকরো অংশ। কয়েকটা টফিও ছড়িয়ে রয়েছে আশপাশে। কিছুক্ষণ আগেই নিহত হয়েছে সে। কাওসার এখানে এলো কিভাবে? কে তাকে এভাবে মারলো? মন্টি কোথায়?

পাথরের মূর্তির মতো কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো সারওয়ার কাওসারের লাশের দিকে। হাতের টর্চটাকে অসুরের শক্তি দিয়ে চেপে ধরেছিল সে। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে নিভে গেল সেটা। চিন্তাশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেললো সে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে চারপাশ থেকে ভয়ানক একটা ভীতি চেপে ধরলো তাকে। কারা যেন গলা টিপে ধরার জন্যে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কথাটা ভাবতেই শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো তার। পলকের মধ্যে বারান্দা থেকে নেমেই প্রাণপণে ছুটলো সে বাড়ির দিকে।

দুই

ভোর পাঁচটা।

শখের গোয়েন্দা শহীদ খান সবেমাত্র ব্যায়াম শেষ করে বাগান থেকে ঘরের দিকে ফিরে আসছিল। এমন সময় গফুর এসে খবর দিলো, 'চা-নাস্তা তৈরি, দাদামণি। কামালদা এখনও এলো না যে?'

উত্তর দিলো না শহীদ।

'কামালদা কখন আসবে, দাদামণি?'

'এই আসলো বলে।' হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিলো শহীদ।

গফুর আর কিছু জিজ্ঞেস না করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তার দাদামণি আর কামালদা আজ শিকার করতে যাবে কোথায় যেন। নাস্তা তৈরি করা হয়েছে। কামালদা আসলেই হয় এখন।

একতলা বাড়িটা ভেঙেচুরে তিনতলা করা হয়েছে মাসখানেক হলো। সিঁড়ি বেয়ে সিধে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো শহীদ। দশমিনিট সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করলো। স্নান করতে করতেই শুনতে পেলো টেলিফোন বাজছে। তারপরই কামালের কণ্ঠস্বর শুনলো। ফোন ধরেছে সে-ই। শহীদ ভাবলো, এতো ভোরে আবার কার কি দরকার পড়লো? নিশ্চয়ই বুড়োটা কোনো সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব চাপাবার জন্যে ফোন করেছে। মৃদু হাসলো শহীদ তোয়ালে দিয়ে গা-হাত মুছতে মুছতে। বুড়োটা মানে—পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ঘুঘু অফিসার মি. সিম্পসন।

গ্যাবার্ডিনের অ্যাশ কালার স্যুট পরে শোবার ঘর থেকে বের হয়ে এলো শহীদ। ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই দেখলো কামাল মুখ গোমরা করে বসে আছে সোফায়।

'কেমন?' খবর জিজ্ঞেস করলো শহীদ।

'খারাপ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো কামাল।

'কেন, কি হলো?' সোফায় বসতে বসতে প্রশ্ন করলো শহীদ, 'মি. সিম্পসন ফোন করেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তুই বুঝলি কিভাবে?'

'এতো সকালে আর কে খোঁজ করতে পারে শহীদ খানের।' মৃদু হেসে উত্তর দিলো শহীদ।

'শিকারে যাওয়া হবে না।' দুঃখিত কণ্ঠে ঘোষণা করলো কামাল, 'মি. সিম্পসন দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন। খুন হয়েছে।'

'কে খুন হয়েছে, বাল্যবন্ধু? আমাদের শিকার করতে যাবার প্রোগামটা নিশ্চয়ই?'

'ঠাট্টা রাখ, শহীদ। রীতিমত রাগ হচ্ছে আমার খুনীটার ওপর। ব্যাটা আর সময় পেলো না খুন করার। আজকে আমরা শিকারে যাবো, আর ঠিক আজকেই হারামজাদা কাণ্ডটা করে বসেছে।'

হেসে ফেলে শহীদ বললো, 'বাহ্ বাহ্! এই না হলে তুই শহীদ খানের সহকারী! ইতিমধ্যেই খুনীকে চিনে ফেলেছিস দেখছি—সাবাশ!'

'তারমানে!'

শহীদ কামালের আশ্চর্যবোধক প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'এই তো তুই খুনীকে 'ব্যাটা' এবং 'হারামজাদা' বললি। তারমানে খুনী যে পুরুষ মানুষ তা তুই ধরে ফেলেছিস ইতিমধ্যেই। ঠিক বলিনি?'

শহীদের কথা শুনে লজ্জা পেলো কামাল। বললো, 'না, মানে, ওসব কথা ভেবে বলিনি আমি…'

'কিন্তু তোর মতো লোকের না ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত নয়, বাল্যবন্ধু।'

'তা ঠিক,' মেনে নিলো কামাল শহীদের যুক্তি।

'হ্যাঁ, বল এবার মি. সিম্পসন কি বললেন। কেন আসছেন তিনি?'

এমন সময় গফুর ট্রে ভর্তি ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কামালের পাণ্ডুর মুখে জ্যোতি ফিরে এলো সেই সাথে। হাফ-বয়েল একখানা ডিম প্রথমেই মুখে পুরলো সে। তারপর গাল নাড়তে নাড়তে শহীদের প্রশ্নের উত্তর দিলো, 'শান্তিনীড়ের মি. নাসিরউল্লাহর ছোট ভাইপো নিখোঁজ হয়েছে, মেজটি খুন। মি.সিম্পসন আর কিছু জানাননি।'

ভুরু কুঁচকে শহীদ প্রশ্ন করলো, 'শান্তিনীড়ের মি. নাসিরউল্লাহ! তারমানে নামজাদা অভিজাত বংশের…?'

কামাল আরও একখানা ডিম মুখে পুরে ছোট্ট করে উত্তর দিলো, 'হুঁ।'

ওদের ব্রেকফাস্ট শেষ হতেই মি. সিম্পসনের গাড়ির হর্ন শোনা গেল। প্রস্তুত হয়েই ছিলো ওরা। বাক্যব্যয় না করে ড্রয়িংরুম থেকে বের হয়ে পড়লো দু'জন।

'তৈরি?' মি. সিম্পসন একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে প্রশ্ন করেন শহীদকে দেখে।

'গুডমর্নিং মি. সিম্পসন। তৈরি। কিন্তু…'

'গুডমর্নিং, মাই বয়েজ। গাড়িতে ওঠো আগে, তারপর কথা বলা যাবে যেতে যেতে।'

গাড়িতে উঠে বসলো ওরা। ড্রাইভার স্টার্ট দিলো। মি. সিম্পসনই মুখ খুললেন এবার, 'মি. নাসির-এর বাড়িতে একটা খুন হয়েছে, আর একটা ছেলে নিখোঁজ হয়েছে—এছাড়া এখনো আমি কিছু জানি না শহীদ। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কারণ হলো এই যে, যতটুকু শুনেছি ততটুকুতেই আমার ধারণা হয়েছে ব্যাপারটা কুৎসিত রকমের জটিল। চলো, ওখানে গিয়ে নিজেই সব দেখতে পাবে। কিন্তু তোমাকে একটা খবর শোনাই…।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায় শহীদ। মি. সিম্পসন বলেন, 'গতকাল কুয়াশা এসেছিল আমার অফিসে।'

চমকে উঠে শহীদ তাকায় মি. সিম্পসনের দিকে। ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো তার। কামাল ও গফুরকে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে আকস্মিকভাবে প্লেনে করে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল কুয়াশা। পঁচিশ দিন হলো ঢাকায় পৌঁছেছে ওরা। হঠাৎ কুয়াশা পেরুতে একা রয়ে গেল কেন তা কামালও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেনি। সাজামো থেকে পেরুর উদ্দেশে ফিরছিল কুয়াশা কামাল ও গফুরকে

নিয়ে। বৈজ্ঞানিক কোটেযের যারা শত্রু ছিলো তাদের হোতা মাতব্বরটি লুকিয়ে পড়েছিল টারাটাকা শহরে। তার সন্ধানেই যাচ্ছিলো ওরা। লোকটাকে খুঁজে বের করে ধরার ইচ্ছা ছিলো কুয়াশার। কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটলো। মহাশূন্য থেকে কোনো গুরুতর খবর এসে পৌছলো একদিন। চঞ্চল হয়ে উঠলো কুয়াশা। তাড়াহুড়ো করে কামাল ও গফুরকে ঢাকার উদ্দেশে প্লেনে চড়িয়ে দিলো সে। কামালকে বলেছিল আমি ফার্ণান্দোর কাছ থেকে স্বর্ণের যে বস্তাগুলো উদ্ধার করে নদীতে ডুবিয়ে রেখেছি সেগুলো তুলতে যাচ্ছি। পরে সব রহস্য পরিষ্কার করে বলবো যখন আবার দেখা হবে। চলি। তারপর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি কুয়াশার।

'কুয়াশা এসেছিল আপনার অফিসে?' কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করে কামাল। 'কেন? সে আবার ঢাকায় ফিরলো কবে?'

'কবে ফিরলো জানি না, তবে এসেছিল একজন প্রাক্তন পুলিস অফিসার সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে। ব্যস্ত ছিলো সে, আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।'

'প্রাক্তন পুলিস অফিসার?' প্রশ্ন করে শহীদ।

মি. সিম্পসন বলেন, 'লোকটার নাম ইকরামুল্লা খান। কোনো একটা গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার করতে গিয়ে একটা হাত খসে যাওয়ার ফলে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় তাকে। বার্মা থেকে লোকটা সম্প্রতি ঘুরে এসেছে। তার সম্পর্কেই জানতে চায় কুয়াশা।'

'কি জানতে চায়? ইকরামুল্লা খান সম্পর্কে তার তথ্য সংগ্রহের কারণ?'

মি.সিম্পসন বলেন, 'তা কুয়াশা আমাকে বলেনি। তবে রহস্য একটা নিশ্চয়ই আছে।'

কামাল বলে, 'সে কথা ঠিক। তা না হলে কুয়াশা নিজে তথ্য সংগ্রহের জন্যে আপনার কাছে আসতো না।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই শান্তিনীড়ে পৌছুলো ওরা। মি. নাসির দ্রুত পায়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওরা তিনজনই তাকালো মি. নাসিরের দিকে। এক পলকের দৃষ্টিতেই সবাই বুঝতে পারলো যে, ভদ্রলোক পাগল হয়ে যেতে যা বাকি আছেন। খুনীর মতো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। দাঁড়াবার ভঙ্গিটিও স্বাভাবিক নয়। টলটলায়মান অবস্থায় কোনরকমে যেন দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন তিনি। চোখের কোণে এবং গালে এখনও জলের রেখা। দৃষ্টি ঘোলাটে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন মি. নাসির। কথা বলতে পারছেন না যেন। মি. সিম্পসনই এগিয়ে গেলেন।

'আমরা এসে গেছি, মি. নাসির। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান, আর ইনি ওঁর সহকারী কামাল আহমেদ। আমার বিশেষ অনুরোধে এঁরা এসেছেন তদন্ত পর্যবেক্ষণ করতে।'

মাথা নেড়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালেন মি. নাসির। কথা বলতে পারলেন না।

'চলুন, ঘটনাস্থলের দিকে যাওয়া যাক। লাশ কেউ ছোঁয়নি তো?'

'না। চলুন।' ভাঙা গলায় এই প্রথম কথা বললেন মি.নাসির। তারপর পথ দেখিয়ে আগে আগে হেঁটে চললেন। বাড়ির ভিতর ঢুকে বাগানে প্রবেশ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর শহীদের দু'কাঁধে হাত তুলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মি. শহীদ, আপনি···যেই হোক আমার ভাইপোর খুনী, আপনি নামটি বলবেন আমাকে শুধু···তারপর আমি দেখবো তাকে···'

দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করলেন মি. নাসির। শহীদ ধীর এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে আশ্বাস দিলো,'বিচলিত হবেন না, মি. নাসির। আপনারা বিচলিত হলে খুনীকে ধরা অসম্ভব। আপনাদের তথ্য দানের ওপরই নির্ভর করছে আসল খুনীকে খুঁজে বের করার সম্ভাবনা।'

আবার ওরা হাঁটতে শুরু করলো। বাগানের বিরাট এলাকা পেরিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হলো ওরা। দু'জন পুলিস কনস্টেবল আগেই পৌঁছে গেছে। কাওসারের লাশ পাহারা দিচ্ছে তারা। অদূরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে একজন মহিলা। অপর একজন মহিলা একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে চলেছেন। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে যে সে হলো এ বাড়ির পুরাতন চাকরাণী—প্রৌঢ়া সোনার মা। গাছের নিচে যিনি তিনি মিসেস নাসির। মাস্টার সাহেব বারান্দার উপর একটা খামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন অনবরত। আর ড্রাইভার শামসু বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে কাওসারের মৃতদেহের দিকে। সে যেন পাথর হয়ে গেছে। সারওয়ারকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

শহীদ এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো লাশটার ওপর। কাওসারের মাথায় আঘাত করেছে খুনী। মোটা রড বা ঐ জাতীয় লোহার কোনো অস্ত্র দিয়ে করা হয়েছে আঘাতটা।

'রড যদি হয় তবে সেই রডের মাথাটা ছিলো মোটা।' কামালের উদ্দেশে নিচু গলায় বললো শহীদ।

মি. সিম্পসনও দেখলেন লাশের মাথার ঠিক মাঝখানে গভীর একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহের আশেপাশে কয়েকটা টফি, একটা ভাঙা পিরিচ, মাখন মাখানো কয়েক পিস পাউরুটি ইত্যাদি ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। মি. নাসিরের দিকে তাকিয়ে শহীদ প্রশ্ন করলো, 'এসব খাবার এলো কোথা থেকে?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না, মি. শহীদ। আমার কাওসার কেমন করে এখানে এলো, কে তাকে এভাবে হত্যা করলো কিছুই অনুমান করতে পারছি না আমি। একটি কথাই কেবল বলতে পারি আপনাকে। তা হলো, টফিগুলো আমার ছোটো

ভাইপোর খুব প্রিয়! তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে। তাকেও বুঝি শেষ করে…,

কথা শেষ করতে পারলেন না মি. নাসির। ছেলে মানুষের মতো ডুকরে কেঁদে ফেললেন। শহীদ মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বললো, 'আপনি এবার লাশের ব্যবস্থা করতে পারেন। চলুন বৈঠকখানায় গিয়ে বসে সব কথা শোনা যাক।'

লাশ পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে ওঁদের ড্রয়িংরুমের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন মি. সিম্পসন। শহীদ বারান্দার সিঁড়ি ধরে নামার সময় থমকে দাঁড়ালো। সিঁড়ির ধাপে একজোড়া গামবুটের ছাপ চোখে পড়েছে তার।

'এদিকে বৃষ্টি হয়েছে ঠিক কখন?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন মিসেস নাসির। তিনি গাছের তলা থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'রাত সোয়া একটায় শেষবার বৃষ্টি হয়েছে।'

শহীদ আপন মনেই বললো, 'তুমুল বৃষ্টি হয়েছিল কি? মাটি দেখছি এখন শুকিয়ে গেছে প্রায়। কাদাটাদা, নেই।'

'হ্যাঁ।' সায় দিলেন মিসেস নাসির।

শহীদ মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি সকলকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসুন। আমি আসছি এখুনি।'

চোখেচোখে কি যেন কথা হয়ে গেল ওদের দুজনের। মি. সিম্পসন বাক্যব্যয় না করে সকলকে নিয়ে চলে গেলেন বাগানের পথ ধরে ড্রয়িংরুমের দিকে। শহীদ ও কামাল রয়ে গেল ঘটনাস্থলে। বাকি দুজন পুলিস কনস্টেবল লাশ পাহারা দেবার জন্যে রইলো শুধু।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করলো কামাল।

শহীদ বললো, 'সিঁড়ির দিকে চোখ ফেলে দেখ। গামবুটের চিহ্ন, তাই না? তারমানে রাতে যখন বৃষ্টি হয়েছিল তার পরপরই কেউ গামবুট পরে এসেছিল এদিকে। কিন্তু সে বারান্দার ওপর ওঠেনি বোঝা যাচ্ছে। এক কাজ কর, তুই আশপাশটা ভালো করে দেখ, খুনী কোনো কিছু ফেলে গেছে কিনা। আর আমি এই গামবুটের ছাপ ধরে এগোই। ড্রয়িংরুমে দেখা করবো।'

কামালকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শহীদ গামবুটের ছাপ লক্ষ্য করে এগোতে যাবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়েই ক্ষান্ত হলো। দেখলো সিঁড়ির বাঁ পাশে ছোটো ছোটো গাছের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দু'টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে একটা পিরিচ, কয়েকটা টফি, রুটি ইত্যাদি। জিনিসগুলো তুলে কামালের হেফাজতে দিয়ে শহীদ চিন্তিত মুখে গামবুটের চিহ্ন অনুসরণ করতে শুরু করলো।

মাটি এখনও ভিজে ভিজে, কিন্তু কাদা নেই কোথাও। মাটির উপর গামবুটের ছাপ পড়ে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার।

দাগ লক্ষ্য করে সারওয়ারের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো শহীদ। ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ। ফিরে এলো সে ওখান থেকে। বৈঠকখানায় সকলে জমায়েত হয়েছে এতক্ষণে। শহীদ বারান্দা ধরে এগোতে এগোতে বৈঠকখানাটা দেখতে পেলো। ঢুকলো সে ধীর পদক্ষেপে।

বাড়ির সকলে উপস্থিত হয়েছে বৈঠকখানায়। কেবল সারওয়ার তার নিজের ঘর থেকে বের হয়নি।

'আপনাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে লাশ দেখেন?' শহীদ একটা সোফায় আসন গ্রহণ করতে মি. সিম্পসন সকলের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন।

'আ-আমি!' প্রৌঢ় মাস্টার সাহেব কিছুটা অপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দেন।

মি. সিম্পসন বলেন, 'আচ্ছা, শুধু আপনি থাকুন। আর সবাইকে একে একে জেরা করবো আমরা।'

মি. সিম্পসনের কথা শেষ হতে মাস্টার সাহেব ব্যতীত আর সকলে ড্রয়িংরুম ছেড়ে বের হয়ে যান। মি. সিম্পসন শহীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কেসটা জটিল বুঝতেই পারছো। আমি চাই তুমি নিজের হাতে নাও এটা। তুমিই জেরা করে যা জানবার জেনে নাও।'

ফর্মালিটির ধার না ধেরে মেনে নেয় শহীদ মি. সিম্পসনের অনুরোধ। সত্যি বলতে কি, কেসটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে শহীদের। মাস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে, 'আপনি মি. নাসিরের...'

'আমি এ বাড়ির বহুদিনের গৃহশিক্ষক। এখানেই থাকি।'

'আচ্ছা। তা মাস্টার সাহেব, আপনাকে আমি প্রথমে কোনো প্রশ্ন করবো না। কালকের এবং আজকের ঘটনা যা ঘটেছে শুধু তাই হুবহু বলে যান আপনি। যা জানেন।'

কিন্তু গতকালকের ঘটনাই বলতে গিয়ে বারবার গুলিয়ে ফেলতে লাগলেন মাস্টার সাহেব। খুব বেশি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন দেখে শহীদ বললো, 'ঠিক আছে, আপনাকে আমি একটা একটা করে প্রশ্ন করি, আপনি ধীরেসুস্থে উত্তর দিতে থাকুন। আচ্ছা বলুন তো, কাওসারকে শেষবার আপনি কখন দেখেছেন কাল রাতে।'

'শেষবার ওকে দেখেছি সম্ভবত রাত ন'টায়। ও যখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তখন রাত এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে। ওর এবং সারওয়ারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মন্টিকে আবার খুঁজতে বের হবার আগে বলে যাই ওরা যেন জানালা দরজা ভালো করে বন্ধ করে শোয়।'

'আপনি ঐ গুদাম ঘরের দিকে আজ অতো সকাল বেলা কি দরকারে গিয়েছিলেন?'

মাস্টার সাহেব ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'নাসির সাহেব কয়েকজন লোক ঠিক

করে নিয়ে আসেন বাড়ির পিছনের নদীতে মন্টিকে খুঁজে দেখার জন্যে। লোকগুলো জেলে, কিন্তু তাদের নৌকো ছিলো না। এ বাড়িতে কোষা নৌকো আছে একটা। সেটা আবার ঐ গুদাম ঘরের একটিতে ছিলো। গুদাম ঘরের চাবি খুঁজতে গিয়ে পাননি নাসির সাহেব। তাই আমাকে বলেন গুদাম ঘরে তালা দেয়া আছে কি না দেখে আসতে। আমি গিয়ে দেখি…কাওসার মরে পড়ে আছে…'

শহীদ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, মাস্টার সাহেব, কাওসারকে কে খুন করতে পারে বলে মনে হয় আপনার? কাউকে সন্দেহ হয় কি আপনার? আর মন্টিকে চুরি করেছে যে সে-ই কি খুনি বলে মনে হয় আপনার?'

শহীদের প্রশ্ন শুনে মাস্টার সাহেব অবাক হয়ে তাকান। তারপর বলেন, 'আমি তো জানি না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে শহীদ বলে, 'সত্যি জানেন না?'

'না।'

স্পষ্ট অজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাস্টার সাহেব। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তবে একটা কথা বলতে চাই, এ বাড়িটাকে গত দু'বছর ধরে কেমন যেন ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়। আগে এরকম ছিলো না। জানেন, গত প্রায় দু'বছর ধরে প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে এ বাড়ির ভিতর একটা ছায়াকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।'

'ছায়া! ছায়াকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়!' শহীদ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে।

মাস্টার সাহেব বলেন, 'বিশ্বাস করুন মি. শহীদ, আমি নিজের চোখেও দেখেছি।'

'আর কে কে দেখেছেন আপনার মতো?'

'সোনার মা, এ বাড়ির চাকরাণী। মিসেস নাসিরও দেখেছেন।'

'আপনার কি মনে হয় রহস্যটা সম্পর্কে?'

'কি আর মনে হবে, ভুতুড়ে বাড়ি এটা তাই মনে হয়।'

মাস্টার আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে ছেড়ে দেয় শহীদ। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর মি. নাসির প্রবেশ করেন ঘরে। তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে একটি সোফায় ধপ্ করে বসে পড়েন।

শহীদের অনুরোধে মি. নাসির মন্টির নিখোঁজ হবার ঘটনা থেকে আজ সকালের সব ঘটনা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করেন। শেষে শহীদ জেরা করতে শুরু করে, 'আচ্ছা মি. নাসির, আপনার বড় ভাইপো সারওয়ারকে দেখলাম না তো? সে বুঝি কিচেন রুমের পাশের ঘরটিতে থাকে?'

'হ্যাঁ। মন্টির নিখোঁজ সংবাদ শুনে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে ও। কাল রাতে দরজা বন্ধ করার পর ভোরবেলা কাওসারের নিহত হবার খবর শুনে দরজা খুলেছিল একবার। তারপর আবার ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। কোনমতে খুলতে চাইছে না।'

শহীদ বললো, 'ওকে সবার শেষে প্রশ্ন করবো। আচ্ছা মি. নাসির, কাল রাতে যখন বৃষ্টি আসে তখন আপনারা কে কোথায় ছিলেন বলতে পারেন?'

'আমি ছিলাম থানায়। মন্টির কোনো খবর পাবার আশায়। আমার স্ত্রী ছিলো তার নিজের ঘরে। কাওসার ও সারওয়ার ছিলো তাদের নিজ নিজ ঘরে। সোনার মাও নিজের ঘরে ছিলো। আর মাস্টার সাহেব আর ড্রাইভার গিয়েছিল সম্ভাব্য জায়গায় মন্টির খোঁজ করতে।'

'কখন ফেরেন আপনারা?'

'আমি ফিরেছি চারটের দিকে। ওরা ফিরেছে সাড়ে চারটের দিকে। আমি জেলে পাড়ার কয়েকজন জেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। নদীতে পড়ে মন্টি ডুবে গেছে কিনা জানার জন্যে ওদেরকে ডেকে এনেছিলাম। ওদের আবার নৌকো ছিলো না। আমাদের বাড়ির নৌকোটা...'

শহীদ বললো, 'ওকথা শুনেছি আমরা। আচ্ছা, এবাড়িতে বছর দুয়েক ধরে প্রতি পূর্ণিমার রাতে নাকি একটা ছায়াকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। কথাটা কতটা সত্যি?'

শহীদের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠেন মি. নাসির। শহীদের নজর এড়ায় না মি. নাসিরের ভাবান্তর।

'আমি কখনও ওরকম কিছু দেখিনি। তবে ওরা বলে দেখেছে।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শহীদকে তাকাতে দেখে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন মি. নাসির।

শহীদ বলে, 'আচ্ছা, মন্টি নিখোঁজ এবং কাওসার খুন এ দুটো ঘটনার সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে করেন আপনি?'

'ঠিক বুঝতেই পারছি না, মি. শহীদ, কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে, কে ঘটিয়েছে...'

শহীদ বলে, 'আপনার কোনো শত্রু আছে, মি. নাসির?'

শহীদের এ প্রশ্ন শুনেও চমকে ওঠেন, মি. নাসির।

'চুপ করে থাকবেন না, মি. নাসির। মনে রাখবেন, আপনাদের সত্য কথনের উপর নির্ভর করছে অপরাধী বা অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া।'

'না। আমার কোনো শত্রু নেই।' শহীদের প্রশ্নের উত্তর দেন মি. নাসির।

শহীদ একই প্রশ্ন করে একটু ঘুরিয়ে, 'আপনাকে বিপদে ফেলে লাভবান হবে এমন কেউ আছে কি?'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে উত্তর দেন মি. নাসির, 'বুঝতে পারছি না আমাকে বিপদে ফেলে কার কি লাভ হতে পারে।'

'কারো উপর সন্দেহ হয় আপনার?'

'না।'

শহীদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'এ বাড়ির মালিকানা কার নামে?'

'আমার জীবিত অবস্থায় এ বাড়ি ভাগ-বাঁটওয়ারা করা যাবে না। আমার মৃত্যুর পর এ বাড়ি পাবে আমার ভাইপোরা। আমার সন্তান হলে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে। বড়দা মারা যাবার আগে উইলে সেরকম ব্যবস্থাই করে গেছেন।'

শহীদ বলে, 'আপনার বড়দা উইল করেছিলেন? আচ্ছা, আপনাদের সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার একটা হিসেব দিতে যদি আপত্তি না থাকে...'

'আপত্তি আর কি। এ বাড়িটা ছাড়া আমাদের আর কোনো বাড়ি নেই। বড়দা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন মোট দশ লাখ। প্রতিমাসে এক হাজার টাকার বেশি তোলা যাবে না, যতদিন সারওয়ার বিয়ে না করে। আমার অবর্তমানে আমার ভাইপোরা তুলতে পারবে টাকা।'

শহীদ বলে, 'কিছু মনে করবেন না, মি. নাসির, আমি একটা প্রশ্ন করছি আপনাকে। আপনার বড়দা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে যান দশ লাখ, কিন্তু প্রতিমাসে এক হাজারের বেশি না তুলতে পারার ব্যবস্থা করে গেলেন কেন উইলে?'

একমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন মি. নাসির। তারপর বললেন, 'বড়দা ঠিকই করেছিলেন। তা না হলে টাকাগুলো এতদিনে শেষই করে ফেলতাম। আসলে আমার খরচাপাতির হাত অত্যন্ত লম্বা, এবং দাদা সেটা জানতেন। অবশ্যি আমার ভাইপোদের কোনো...'

হঠাৎ কি যেন ভেবে থেমে যান মি. নাসির। শহীদ বলে, 'থামলেন কেন, বলুন?'

'না, কিছু না। আমার আর কিছু বলার নেই।'

শহীদ অপর একটি প্রশ্ন করে এবার, 'আচ্ছা, মি. নাসির, কাওসার এবং সারওয়ারের মধ্যে সপ্তাহখানেকের ভিতর কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কিনা বলতে পারেন?'

'কাওসারের সঙ্গে সারওয়ারের ঝগড়া! অসম্ভব, মি. শহীদ। যদিও মাত্র তিনদিন হলো বাড়িতে ফিরেছি আমি, এক সপ্তার কথা ঠিক জানি না। তবু বলছি, কাওসারের সঙ্গে সারওয়ারের তেমন ঝগড়াঝাঁটি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ওরা পরস্পরের প্রাণের বন্ধু।'

'তিন দিন মাত্র বাড়ি ফিরেছেন বললেন? কোথায় গিয়েছিলেন?'

শহীদের প্রশ্ন শুনে স্পষ্ট অপ্রতিভ হয়ে পড়েন মি. নাসির। বেশ একটু বিচলিত মনে হয় তাঁকে। তারপর শুকনো কণ্ঠে উত্তর দেন, 'বার্মায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি? তা কতদিন ছিলেন? সঙ্গে কেউ ছিলো, না একাই গিয়েছিলেন?'

'ছিলাম পনেরো দিন। না, একা যাইনি। আমার একজন বন্ধুও গিয়েছিল সঙ্গে।'

'কিছু মনে না করলে আপনার বন্ধুর নামটি...'

অনিচ্ছাসহকারেই নামটা বলেন মি. নাসির, 'ইকরামুল্লা খান। প্রাক্তন পুলিস অফিসার।'

নামটা শুনে চমকে ওঠে শহীদ। মি. সিম্পসনের দিকে তাকায় সে। মি. সিম্পসনও চমকে উঠেছেন। কুয়াশা মি. সিম্পসনের অফিসে এসেছিল ইকরামুল্লা খানের সম্পর্কেই তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে। তার সঙ্গে কি সম্পর্ক মি. নাসিরের?

'কতদিনের বন্ধুত্ব ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তর দেন মি. নাসির ছোটো করে, 'বছর সাতেকের।'

আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ভাবছিল শহীদ, এমন সময় কামাল ঢুকলো ঘরে। কামালের দিকে তাকিয়েই শহীদ বুঝতে পারলো কামাল ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। মি. নাসিরের দিকে ফিরে সে বলে, 'ঠিক আছে এবার আপনি যেতে পারেন। মিনিটপাঁচেক পর আপনি ড্রাইভার শামসুকে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে। আর একটি কথা, যতদিন না সব রহস্যের মীমাংসা হয় ততদিন এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না কেউ। সকলের বেলাতেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

মি. নাসির মৌনসম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে কামাল পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে আনে। রুমালটা শহীদের হাতে দিয়ে বলে, 'খুলে দেখ! এটা দিয়েই খুন করেছে কাওসারকে খুনি।'

একটা হাতুড়ি পেয়েছে কামাল। শহীদ রুমালটা সরিয়ে দেখলো হাতুড়ির মাথায় রক্ত এবং কয়েক গোছা চুল সেঁটে আছে। দেখেই বুঝলো কাওসারকে এটার সাহায্যেই খুন করা হয়েছে। প্রশংসার দৃষ্টিতে কামালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'কোথায় পেলি এটা?'

'ড্রাইভারের কোয়ার্টারে।'

মুহূর্তের জন্যে কঠিন হয়ে গেল শহীদের মুখ। তারপর মি. সিম্পসনের হাতে রুমাল সুদ্ধ হাতুড়িটা সমর্পণ করে সে বললো, 'এর বাঁটে হাতের ছাপ পাওয়া যাবে সম্ভবত।'

শহীদের কথা শেষ হবার সাথে সাথে ঘরে এসে ঢুকলো ড্রাইভার শামসু। ঘরের মাঝখানে এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো সে। মনোযোগ সহকারে ড্রাইভারের আপাদমস্তক দেখলো শহীদ। বেশ লম্বা লোকটা। বয়েস আন্দাজ ছাব্বিশ। গায়ের রঙ শ্যামলা। তীক্ষ্ণ নাক। চোখ দুটো কেমন যেন নিষ্প্রভ আর চঞ্চল এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তবে কাঠামোটা শক্তসমর্থ। পরনে প্যান্ট-শার্ট।

'তোমার নাম শামসু? এ বাড়ির ড্রাইভার?'

'জ্বি।'

'কতদিন ধরে কাজ করছো তুমি এ বাড়িতে? বিয়ে করেছো, না?'

'পাঁচ বছর। বিয়ে করেছিলাম···কিন্তু···'

হঠাৎ শহীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে চুপ করে যায় ড্রাইভার। শহীদ ড্রাইভারের আকস্মিক পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে। বলে, 'ওঃ, মারা গেছে বুঝি?'

'না!'

বেশ জোরে চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ ড্রাইভার, 'মারা যায়নি সে! বিশ্বাস করুন আপনারা, সে মারা যায়নি···হারিয়ে গেছে, না···'

'হারিয়ে গেছে! কবে?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে শহীদ।

ড্রাইভার নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আজ দু'বছর হলো এবাড়ি থেকেই নিখোঁজ হয়েছে আমার স্ত্রী। সাহেব সেদিন আমাকে একটা কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলেন, ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে তাকে আর দেখিনি আমি। কেউ বলতে পারেনি কোথায় গেছে সে। থানায় খবর দিয়েছিলাম, কোনো সংবাদ দিতে পারেনি তারা।'

শহীদ বলে, 'অবাক কাণ্ড তো! বাড়ি থেকে জলজ্যান্ত একজন মেয়েছেলে গায়েব হলো অথচ কেউ জানলো না কোথায় সে গেছে? বাড়িতে তখন কে কে ছিলো?'

'সাহেব ছিলেন। আর কেউ ছিলেন না। তিনি নিজের ঘরে ছিলেন, তাই জানতে পারেননি।'

গম্ভীর হয়ে ওঠে ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর। শহীদ বলে, 'তোমার সঙ্গে তোমার বউয়ের ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল নাকি?'

'না। ঝগড়া করার মতো মানুষ ছিলো না সে।'

'তার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে ড্রাইভার শামসু। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে, 'জানি না।'

'এ ব্যাপারে কারো হাত আছে বলে সন্দেহ করো তুমি?'

'ঠিক বুঝতে পারি না কাকে সন্দেহ করবো।'

একটু ভেবে শহীদ প্রশ্ন করে, 'যেদিন তোমার স্ত্রী নিখোঁজ হয়েছে সেদিন কতো তারিখ ছিলো বলতে পারো?'

তারিখটা বললো ড্রাইভার। লিখে নিলো কামাল। শহীদ আবার জেরা করা শুরু করলো, 'কতদিন থেকে এ বাড়িতে আছো তুমি?'

'তিন বছর।'

'আচ্ছা, প্রতি পূর্ণিমার রাতে এবাড়িতে নাকি একটা ছায়াকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যায়?'

'আমি জানি না। দেখিনি কোনদিন।'

শহীদ এবার উঠে দাঁড়ায় সোফা ছেড়ে। ড্রাইভারের মুখের সামনে গিয়ে

দাঁড়ায় সে। বলে, 'কাওসারকে খুন করার উদ্দেশ্যটা কি? কেন কাজটা করলে তুমি?'

'অ্যাঁ!'

অকস্মাৎ আঁতকে ওঠে ড্রাইভার শহীদের কথা শুনে। ফ্যালফ্যাল করে কয়েক সেকেণ্ড তকিয়ে থাকে সে। তারপর পাংশু হয়ে যায় তার সারা মুখ। কাকুতি মিনতি করে বলে ওঠে, 'আমি! আমি না! আমি কেন খুন করবো মেজ সাহেবকে! বিশ্বাস করুন! আমি...'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে লোকটা কথা বলতে বলতে। কিন্তু শহীদ কঠিন স্বরে বলে ওঠে, 'ন্যাকামি রাখো!'

শহীদ মি. সিম্পসনের কাছ থেকে রুমালে জড়ানো হাতুড়িটা চেয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে দেখায়। বলে, 'এটা এলো কিভাবে তোমার ঘরে?'

'আমার ঘরে!' বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে লোকটা শহীদের হাতের হাতুড়িটার দিকে। কথা বলে ওঠে শহীদ, 'কি, বোবা হয়ে গেলে যে একেবারে!'

কথা শেষ হতেই ড্রাইভার আছাড় খেয়ে পড়ে শহীদের পায়ের ওপর। বলে, 'না না! আমি জানি না ওটার কথা। বিশ্বাস করুন স্যার, আমি রাখিনি ওটা আমার ঘরে। আমি খুন করিনি মেজ সাহেবকে...কিছুই জানি না আমি...'

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে শহীদ ধমক দেয়, 'উঠে দাঁড়াও!'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় ড্রাইভার। শহীদ জিজ্ঞেস করে, 'কাল রাতে বাইরে ছিলে কতক্ষণ?'

'প্রায় সারা রাতই ছোট সাহেবকে খুঁজেছি স্যার! বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখবেন মাস্টার সাহেবকে। উনিও আমার সঙ্গে ছিলেন।'

'তুমি এখন যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো এ বাড়ি ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলে ভালো হবে না। মিসেস নাসিরকে ডেকে দিয়ো গিয়ে।'

কিন্তু মিসেস নাসিরের বদলে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ওরা তিনজন।

'মাফ করবেন, আমি এ বাড়ির ফ্যামিলি সলিসিটর। এখুনি এসে পৌঁছেছি আমি। কয়েকটা কথা বলবার আছে আমার।'

ভদ্রলোককে বসতে অনুরোধ করে নামটি জেনে নেয় শহীদ। ভদ্রলোকের নাম আহমদ হোসেন। সুপুরুষ। কালো রঙয়ের স্যুট পরনে। শহীদের দিকে একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে আহমদ হোসেন বলেন, 'এই হুমকিপত্রটি এই মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে মি. নাসিরের ঘরের টেবিলের ওপর থেকে। দেখুন।'

আহমদ হোসেনের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে শহীদ চিঠিটা নিলো। বাংলায় লেখা চিঠিটা। পরিচ্ছন্ন পুরুষালী হাতের লেখা।

মি. নাসিরউল্লাহ,

অতি অল্প কথায় আদেশ করছি। আশা আছে, কোনরকম চালাকি না করে আদেশ পালন করবে। যদি না করো, তাহলে কাওসার যেভাবে শেষ হয়েছে মন্টিও সেভাবে শেষ হবে।

মন্টিকে পেতে হলে নগদ দশ হাজার টাকা জিন্না অ্যাভিনিউয়ের সামনে কামানের মুখের ভিতর রেখে ফিরে আসবে। টাকাটা রাখতে হবে রুমালে জড়িয়ে। আগামী পরশু ঠিক রাত আটটার সময়। এরপর সোজা চলে যাবে ডি.আই.টি. বিল্ডিংয়ের দিকে। আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, পুলিসে খবর দিয়ে বা অন্য কোনভাবে কোনো ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলে ভালো হবে না। তোমার মন্টির দশা কাওসারের মতো হবেই যদি তেমন কিছু করো— আশা করি একথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

আমি জানি, তোমার বড়দা উইলে কি ব্যবস্থা করে গেছে সুতরাং আমি এ-ও জানি যে এই চিঠির বলে তুমি অনায়াসে ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকা তুলতে পারবে।

ইতি

তোমার যম।

চিঠিটা পড়া শেষ করে শহীদ সেটা মি. সিম্পসনের দিকে বাড়িয়ে ধরে আহমদ হোসেনকে প্রশ্ন করলো, 'উইলের ব্যাপারটা কি বুঝলাম না তো। পত্রলেখক কি বলতে চায়?'

আহমদ হোসেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মি. নাসিরের বড়দা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। সে জানতো মি. নাসিরের খরচ করার হাত খুব বেশি লম্বা। তাই প্রতি মাসে এক হাজার টাকার বেশি না তুলতে পারার ব্যবস্থা করে যায় উইলে। তবে তার তিন সন্তানের কোনো বিপদ বা অসুখবিসুখ দেখা দিলে প্রয়োজনমত টাকা তুলতে পারার ব্যবস্থা উইলে করা আছে।'

'তাই নাকি! কই, মি. নাসির তো সে কথা বলেননি?' শহীদ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করতে আহমদ হোসেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই প্রকাশ করলেন না। শহীদ চিন্তিত হয়ে উঠলো মনে মনে। মন্টিকে তাহলে চুরি করা হয়েছে। এবং মন্টিকে যে বা যারা চুরি করেছে সে বা তারাই হত্যা করেছে বেচারা কাওসারকে। এই মার্ডার এবং কিডন্যাপের মোটিভ স্পষ্টই অর্থলোভ। শহীদ প্রশ্ন করলো, 'চিঠিটা এইমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে না? যদি নতুন কোনো লোক বাড়িতে ঢুকে না থাকে কিছুক্ষণ আগে, তাহলে এ কাজ করেছে আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন···কি বলেন?'

আহমদ হোসেন বিচলিত দৃষ্টিতে তাকান শহীদের দিকে। তারপর বলেন, 'নতুন লোক বলতে আমাকেই বোঝায়। আমি মি. নাসিরের ঘরে ঢোকার একটু পরই চিঠিটা টেবিলের ওপর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই আমাকে

সন্দেহ করছেন না?'

শহীদ বলে, 'ও কথা এখন থাক।'

শহীদকে বাধা দিয়ে আহমদ হোসেন বলেন, 'একটা কথা বলতে হচ্ছে, আমার সঙ্গেই মি. নাসির তাঁর ঘরে ঢোকেন। এবং এর আগে তিনি ঘরে ঢোকেননি। কাল রাতেও ঘরে প্রবেশ করেননি তিনি। সুতরাং এটা খুবই সম্ভব যে, চিঠিটা অনেক আগে থেকেই টেবিলের ওপর ছিলো।'

শহীদ ফ্যামিলি সলিসিটর আহমদ হোসেনের কথায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, মি. নাসির কি এই চিঠির হাতের লেখা চিনতে পারেননি?'

'না!'

শহীদ বলে, 'আপনার নিজস্ব কোনো ধারণা আছে এসব ঘটনা সম্পর্কে?'

আহমদ হোসেন কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে যান। শহীদ আবার জিজ্ঞেস করে, 'মি. নাসির সম্পর্কে আপনার মতামত কি?'

একটু ভেবে নিয়ে আহমদ হোসেন হঠাৎ বলে ওঠেন, 'খরচা-পাতির দিক থেকে বারবার সাবধান করে আসছি আমি। কিন্তু আমার কথা কে মানে। টাকা পয়সার টানাটানি চলছে এখন, এটুকু আমি জানি।'

শহীদ বলে, 'মি. নাসিরের খুব বেশি খরচার প্রয়োজন হয় কেন?'

'ঠিক জানি না। তবে বংশ পরম্পরায় বিলাস-ব্যাধি তো আছেই, তার ওপর উনি একটু বেসামাল ভাবেই চলেন।'

'যেমন?'

আহমদ হোসেন একটু নিচু স্বরে বলেন, 'প্রতি রাত এগারটার সময় গাঙচিল বারে একবার করে হাজির হওয়া চাই-ই ওনার। বুঝতেই পারছেন, মদ এবং মেয়েমানুষে প্রবল ঝোঁক।'

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে শহীদ। তারপর বলে, 'আচ্ছা, আপনি ঢাকার বাইরে যাবেন কিছুদিনের মধ্যে?'

'না, কেন?'

'আপনি এখন যেতে পারেন। তবে আবার আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন পড়তে পারে। আপনার বাড়ির ঠিকানা?'

আহমদ হোসেন একটা ঝকঝকে কার্ড বের করে দেন। তারপর ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান দৃঢ় পদক্ষেপে। শহীদ ভদ্রলোকের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।

শহীদের হাত থেকে কাগজ কলম নিয়ে কামাল এতক্ষণ ধরে সকলের জবানবন্দি লিখে নিচ্ছিলো। খাতা থেকে মুখ তুলে কিছু বলবার জন্যে ঠোঁট খুলতে গিয়ে খুললো না সে। মিসেস নাসির দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। শহীদ ভদ্রমহিলাকে ঘরে আহ্বান করে বসতে বলে। আসন গ্রহণ করার পর শহীদ বলে,

'চিঠিটা নিশ্চয় দেখেছেন আপনি?'

'জ্বি।' ছোট্ট করে উত্তর দেন মিসেস নাসির।

অপূর্ব সুন্দরী বলতে আপত্তি নেই ভদ্রমহিলাকে। একহারা গড়ন। গায়ের রঙ দুধে-আলতা। চোখ দুটি টানা টানা। এবং চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভঙ্গি ফুটে আছে।

'কি মনে হয় চিঠিটা সম্পর্কে? আমার তো মনে হয় বাড়িতে এই মুহূর্তে যারা অবস্থান করছে তাদের একজনেরই কাজ এটা।'

শহীদের কথা শুনে নিজের অজান্তে একটু যেন চমকে ওঠেন মিসেস নাসির। ভীত চোখে তাকান তিনি শহীদের দিকে। তারপর সাথে সাথে সামলে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কি! তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কাওসারের খুনি আমাদের মধ্যেই কেউ?—মাগো!'

শহীদ প্রশ্ন করে, 'মন্টি যখন নিখোঁজ হয় তখন বাড়িতে কে কে ছিলো বলতে পারেন?'

'আমি ছিলাম না!'

আত্মসমর্থনের কণ্ঠে বলেন মিসেস নাসির, 'আমি মন্টিকে আমার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে ড্রাইভারকে সাথে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিলাম। মার্কেটিং করে ফিরতে দেরি হবে বলে নিউ মার্কেট থেকে ড্রাইভারকে ফেরত পাঠাই।'

'আচ্ছা!' অবাক কণ্ঠে বলে শহীদ, 'তারপর বলুন।'

বিচলিত দৃষ্টিতে তাকান মিসেস নাসির শহীদের দিকে। তারপর বলেন, 'যাবার সময় আমার স্বামীর ঘরে ঢুকেছিলাম আমি। উনি নিজের ঘরেই ছিলেন। সোনার মা-ও ছিলো। সারওয়ার এবং কাওসার কোথায় ছিলো দেখিনি আমি। মাস্টার সাহেবও সম্ভবত ওনার ঘরেই ছিলেন। ফিরে এসে আমিই প্রথম লক্ষ্য করি যে মন্টি ঘরে নেই। তারপর থেকেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। সারওয়ার ও কাওসার তখন বাড়িতে ছিলো না। সিনেমায় গিয়েছিল, কিন্তু কাউকে বলেনি।'

'আপনার স্বামী কি আলাদা ঘরে থাকেন?'

কি যেন ভাবেন মিসেস নাসির শহীদের প্রশ্ন শুনে। তারপর মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।'

এরপর আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে ছেড়ে দেয় শহীদ মিসেস নাসিরকে। ভদ্রমহিলা শহীদের প্রশ্নের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বেঁচে যান যেন। দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান তিনি। এতক্ষণ তাঁকে যেন বাধ্য করা হচ্ছিলো প্রশ্নের উত্তর দিতে। এরপর সোনার মা এলো ড্রয়িংরুমে। কিন্তু প্রৌঢ়া চাকরাণীর মুখ থেকে একটি কথাও আদায় করতে পারলো না শহীদ। ধমক-ধামকেও কাজ হলো না। ভয় দেখাতেও কসুর করলো না শহীদ। কিন্তু সোনার মা এক মুহূর্তের জন্যেও কান্না

থামালো না। একনাগাড়ে ফুঁপিয়েই চললো ফুলে ফুলে। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে শহীদ বিদায় করলো তাকে।

মি. নাসির শহীদকে সঙ্গে নিয়ে সারওয়ারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নাম ধরে কয়েকবার ডাকলেন তিনি সারওয়ারকে। কিন্তু দরজা খুললো না। অবশেষে শহীদ নিজের পরিচয় দিয়ে আশ্বাস দিলো এই বলে যে, কেউ তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না। তার নিজের কোনো কথা বলবার থাকলে তাই শোনা হবে। তার বেশি কিছু না। শহীদের কথায় সারওয়ার দরজা খুললো। শহীদ ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলো সে। দরজা বন্ধ করেই শহীদকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেললো সে। শহীদ তাকে দু'হাতে ধরে খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে বসালো। নিজেও বসলো তার পাশে। হঠাৎ কি মনে করে খাটের নিচের দিকটা ঝুঁকে দেখলো শহীদ। যা ভেবেছিল সে ঠিক তাই– খাটের নিচে কাদামাখা একজোড়া গামবুট রাখা। সারওয়ারের দিকে তাকালো শহীদ। কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে গেছে ছেলেটা। কেমন যেন হুহু করে উঠলো শহীদের বুকটা তার দিকে তাকিয়ে। ছেলেটার জন্যে দুঃখ হলো তার। কিন্তু সেই সাথে হাজারটা আশঙ্কার কথাও তার মনে হতে লাগলো। সে ভাবছিল, কাওসারের মৃত্যু এবং মন্টির নিখোঁজ সম্পর্কে কি কি জানে সারওয়ার? ও নিজেও কি জড়িত এসবের সঙ্গে? কতটুকু?

ভীত-ত্রস্ত চোখে দেখছিল সারওয়ার শহীদকে। শহীদ কোমল কণ্ঠে বললো, 'ভয় কি, ভাই। আমি পুলিসের লোক নই। ডিটেকটিভ বইয়ে পড়ো না, শখের গোয়েন্দা?—আমি সেই। আমি তোমাকে কোনো কথা বলবার জন্যে জোর করবো না। কিন্তু তোমার যদি কিছু বলার থাকে তবে নিশ্চয়ই তা শুনবো। আর এটা তো নিশ্চয়ই জানো যে, তোমার ভায়ের খুনিকে খুঁজে বের করার জন্যে আমি এসেছি। সুতরাং আমি জানি—তুমি যদি কিছু জানো নিশ্চয়ই আমাকে তা বলবে। তাই না?'

শহীদের কথা শেষ হতে কেমন যেন বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সারওয়ার তার দিকে। তারপর আবার কেঁদে ফেললো ঝরঝর করে। কাঁদতে কাঁদতেই খাট থেকে নেমে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। শহীদ তাকিয়ে রইলো তার দিকে। সারওয়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজ এবং একটি রবারস্ট্যাম্প বের করে শহীদের কাছে ফিরে এলো। সেগুলো শহীদের সামনে রেখে ঝাঁপিয়েপড়লো অস্ফুট একটা শব্দ করে বিছানার উপর। কান্নার কোনো শব্দ পাওয়া গেল না তার। শুধু দেহটা প্রচণ্ড আক্ষেপে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। শহীদ সারওয়ারের দিকে একবার দেখে নিয়ে বাংলায় টাইপ করা চিঠিটা পড়তে শুরু করলো। চিঠিটা নিম্নরূপঃ

মিস্টার নাসির,

মন্টিকে পাইতে হইলে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া আপনার বাড়ির গেটের সামনে রাখিবেন। তাহা না হইলে ছেলেটাকে পাইবার আশা ত্যাগ করিবেন। পুলিসে খবর দিয়া কোনো লাভ হইবে না।

ইতি

ব্ল্যাক অ্যারো।

চিঠিটার নিচে কালো রঙের একটা তীরের রবারস্ট্যাম্প মারা রয়েছে। শহীদ চিঠিটা পড়ে সারওয়ারের দিকে ফিরলো। তারপর ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বুঝি চিঠিটা টাইপ করিয়ে নিয়ে এসেছিলে, সারওয়ার?'

শহীদের কথা শেষ হতে খাটের উপর উঠে বসলো সারওয়ার। তারপর শুধু একটি কথাই বললো, 'এখন আমি আপনাকে কিছু বলতে পারবো না। কিছুই ভাবতে পারছি না আমি···আপনি আমাকে এ বাড়ি থেকে কয়েকদিনের জন্যে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন দয়া করে···এখানে থাকলে কথা বলতে পারবো না আমি···'

'বেশ তো, তাই হবে, সারওয়ার। আমি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়েই রাখবো। যখন বলতে পারবে, তখনই সব বলবে।'

শহীদের কথা শেষ হতে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলো সারওয়ার। কথা বললো না আর।

তিন

সেদিন রাতের ঘটনা।

গাঙচিল হোটেল অ্যাণ্ড বার। রাত আটটা। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বয়-বেয়ারা হুকুম তামিল করছে। প্রচুর লোক জমেছে ইতিমধ্যেই। মদ্যপানের স্বর্গ এটি, রাত যতো বাড়বে ততই জমজমাট হয়ে উঠবে আসর। অধিক রাতে হৈ-হল্লা শুরু হবে, গ্লাস ভাঙবে, ভদ্রসন্তানেরা খিস্তির মহড়া শুরু করবেন।

গাঙচিল বারের প্রোপাইটার ইকরামুল্লা খান বসে আছে হলঘরেই। একটা টেবিল দখল করে মোট তিনজন বসে আছে। অন্যান্য খরিদ্দারদের দিকে খেয়াল নেই তাদের। নিজেদের কোনো গোপন পরামর্শ চলছে এখন। এদের মধ্যে আমাদের পূর্ব পরিচিত মি. নাসিরকেও উপস্থিত দেখা যাচ্ছে। তিনি অবশ্য কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না। মাঝে মধ্যে মাথা নাড়ছেন শুধু। মি. নাসিরকে দেখেই বোঝা যায় যে, মানসিক দিকটা তাঁর এখনও স্বাভাবিক হয়ে আসেনি। অপর দুজন সঙ্গীর মতো মদ্যপানও আজ তিনি করছেন না।

মিনিট পাঁচেক পর একজন উর্দি পরা বেয়ারা ইকরামুল্লা খানের পাশে এসে দাঁড়ালো। কানে কানে কি যেন বললো সে। ইকরামুল্লা খান বেয়ারার কথা শুনে আড়চোখে তাকালো অদূরবর্তী একটা টেবিলের দিকে। সেখানে একটু আগে এক

সুন্দরী তরুণী এসে আসন গ্রহণ করেছে। তরুণীটিকে দেখে চোখ দুটো হঠাৎ আনন্দে নেচে উঠলো ইকরামুল্লা খানের। আজকের শয্যা সঙ্গিনী হিসেবে তরুণীটিকে তার বেশ পছন্দ হলো।

'ঠিক আছে, তুমি ওকে সুইটে নিয়ে যাও। আমি আসছি।'

নিচু স্বরে বেয়ারাকে কথাটা বলে ডান হাতটা মি. নাসিরের দিকে বাড়িয়ে দিলো ইকরামুল্লা খান। ঐ একটি হাতই সম্বল তার। বাকি একটি হাত সে যখন পুলিস বিভাগে চাকরি করতো তখন একটা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে খোয়া গেছে। সেই সঙ্গে চাকুরিও যায় তার। কিন্তু ভালোই হয়েছে আখেরে, ইকরামুল্লা খান ধার করে মদের লাইসেন্স বের করে গাঙচিল হোটেল অ্যাণ্ড বার চালু করেছে। বেশ মৌজসে আছে সে এখন। এমন ব্যবসা আর নেই। এছাড়াও আরও লাভজনক ব্যবসা করে সে। কিন্তু সেকথা অনেকেই জানে না। গোপন ব্যবসা কিনা। যাই হোক, মি. নাসির এবং অপর সঙ্গীটির সঙ্গে করমর্দন সেরে বিদায় নিলো ইকরামুল্লা খান। তিনজনই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এক সঙ্গে। প্রকাণ্ড শরীর ইকরামুল্লা খানের, তার পাশের দুজনকে নেহাত ছেলে মানুষ বলে মনে হয় তার সামনে। চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি লোকটার। হাতির উরুর মতোই উরু। লোমশ শরীর। চোখ দুটো সব সময় ঢুলু ঢুলু। কিন্তু সেই চোখ থেকেই যেন আগুনের গরম আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

মি. নাসির এবং অপর লোকটি আগু পিছু করে হলঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর ইকরামুল্লা খান গম্ভীর মুখে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ম্যানেজার খোদ মালিককে দেখে স্প্রিং দেয়া পুতুলের মতো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। লোকটার ভীত ভঙ্গি দেখে মনে হয় এখুনি বুঝি সে ইকরামুল্লা খানের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে অজ্ঞাত অপরাধের জন্য মাফ চাইতে শুরু করবে।

'ডান দিকের কোণের টেবিলটায় রঙিন চশমা পরে যে বসে আছে ও কে?' গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে ইকরামুল্লা খান।

ম্যানেজার ডান দিকের কোণের টেবিল দখল করে লম্বা-চওড়া শরীরের যে লোকটি এদিকেই তাকিয়ে বসে আছে, তার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে, 'ঠিক চিনি না, হুজুর। ক'দিন থেকেই দেখছি এই সময়টা চুপচাপ এসে বসে থাকে। নতুন কোনো খরিদ্দার হবে মনে হয়।'

'খেয়াল রেখো। ভিতরে যেন ঢুকতে না পারে। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'আচ্ছা, হুজুর। খেয়াল রাখবো, ভিতরে ঢুকতে যাতে না পারে...'

কিন্তু ম্যানেজারের কথা শোনার জন্যে ইকরামুল্লা ততক্ষণ দাঁড়িয়ে নেই। হলঘর থেকে বেরিয়ে নির্জন করিডর ধরে এগোচ্ছে সে রাজকীয় ভঙ্গিতে, এক হাত দুলিয়ে দুলিয়ে।

ম্যানেজার হঠাৎ দেখলো ডান দিকের কোণের টেবিলের সামনে রঙিন চশমা

পরা লোকটা বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সে। লোকটা চলে যাচ্ছে। নজর রাখতে হবে না এখন তাকে।

এদিকে ইকরামুল্লা খান কয়েকটা বাঁক ঘুরে লম্বা একটা করিডর ধরে এগিয়ে একটা সুইটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাত তুলেছিল সে কেবিনের দরজায় টোকা দেবার জন্যে। কিন্তু পিছন থেকে গমগম করে উঠলো সতর্কবাণীঃ মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, ইকরামুল্লা!

চমকে উঠলো ইকরামুল্লা খান। কিন্তু বিপদ বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে হাতটা মাথার উপর তুললো সে।

'পিছিয়ে এসো তিন কদম গুণে গুণে।' গুরুগম্ভীর কণ্ঠ আদেশ জারি করলো সঙ্গে সঙ্গে।

যন্ত্রচালিতের মতো তিন পা পিছিয়ে এলো ইকরামুল্লা খান। সেই সঙ্গে সামান্য একটু ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নিলো শত্রুকে। মনে মনে অবাক হলো সে। লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না।

'ডান দিকে ঘুরে হাঁটতে থাকো।' সময় না দিয়ে দ্রুত উচ্চারণ করলো পিছনের লোকটি।

এবারও অতি বাধ্য ছেলের মতো আদেশ পালন করলো ইকরামুল্লা খান। কেননা লোকটার হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো জার্মান পিস্তলটা চোখে পড়েছে তার। ডানদিকে ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে হোটেলের বয়-বেয়ারাদের মা-বাপ তুলে গালাগালি করতে লাগলো ইকরামুল্লা খান। শালার বেটারা একজনও নেই এদিকে। এবং ম্যানেজারটাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ছাড়া পেয়েই—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো সে। এইসব ভয়ঙ্কর লোক হোটেলে স্থান পায় কিভাবে তা সে দেখে নেবে।

'দাঁড়াও! এবার বাম পাশের সুইটের সামনে গিয়ে দরজায় ঠেলা দাও।' পিছন থেকে আবার আদেশ জারি হলো।

এবার হঠাৎ করেই চমকে উঠলো ইকরামুল্লা খান। লোকটা ইংরেজিতে আদেশ করছিল। এতক্ষণে কথার সুরে বার্মীজ টানটা ধরতে পারে সে। গ্রেফতারকারী তাহলে বার্মীজ! কিন্তু হুবহু বাঙালীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে দেখা যাচ্ছে--মনে মনে ভাবে ইকরামুল্লা খান। বাম পাশের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে ঠেলা দেয় সে দরজায়। খুলে যায় কেবিনের দরজা।

'ভিতরে ঢোকো।'

ক্ষীণ একটুকরো নিষ্ঠুর হাসি খেলে যায় ইকরামুল্লা খানের মুখে। সুইটের ভিতর ঢুকতেই তার ঘাড়ের ওপর শীতল একটা স্পর্শ লাগে। বার্মীজটা ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা চেপে ধরেছে ঘাড়ের পিছনে। ঝট্ করে ঘুরে

দাঁড়িয়ে আক্রমণ করে বসবে কিনা ভাবলো ইকরামুল্লা খান। কিন্তু হঠাৎ জ্বলে উঠলো সুইটের বাতি। বার্মীজটা হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিয়েছে। ঘাড়ের কাছ থেকে একবিন্দুও নড়লো না পিস্তলের নল, একটা হাত দিয়েই ইকরামুল্লার সারা শরীরে তল্লাশি চালিয়ে রিভলভারটা বের করে নিল লোকটা।

'ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বসো,' আদেশ জারি হলো।

বাধ্য ছেলের মতো চেয়ারটায় বসে পড়লো ইকরামুল্লা খান। তারপরই রাগে ফেটে পড়লো সে, 'এসব কি হচ্ছে শুনি! ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি! কে তুমি?'

গম্ভীর মুখে খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে বসলো বার্মীজটা। তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো, 'তুমি কে সেটা জানলেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, আমার পরিচয়ে দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বলো এখন, লকেটটা কোথায় রেখেছো?'

'কি বললে! লকেট? কিসের লকেট? কার লকেট?' অবাক হবার ভান করে চিৎকার করে ওঠে ইকরামুল্লা খান। বার্মীজটার হাতের পিস্তল এখনও তার বুক লক্ষ্য করে রয়েছে।

'চেঁচিয়ো না, সিধে বুকে গিয়ে বিঁধবে গুলি।'

বার্মীজটার কথা শেষ হতে বিরক্তিসূচক শব্দ করে ইকরামুল্লা খান বলে, 'গুলি করবে তুমি! কেন?'

'গুলি করবো দুটো কারণে। এক, চিৎকার করে লোক ডাকতে চেষ্টা করলে। দুই, লকেটটা কোথায় রেখেছো তার খোঁজ না দিলে।'

ইকরামুল্লা বলে, 'লকেটের কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমাকে গুলি করলে মনে কোরো না যে তুমিও ছাড়া পাবে। এ হোটেল থেকে বেরোতেই পারবে না।'

ইকরামুল্লার কথা শুনে আকর্ণ বিস্তৃত নিঃশব্দ হাসি ফোটে বার্মীজটার মুখে। বলে, 'সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে পিস্তলে, দেখতেই পাচ্ছো। গুলি করলে কেউ শুনতে পাবে না। সাধারণ বোর্ডারের মতো বুক ফুলিয়ে বের হয়ে যাবো আমি তোমার হোটেল থেকে। যাকগে, আমার কাজ আমিই ভালো বুঝি—বলো এখন কোথায় আছে লকেটটা? পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। পাঁচ মিনিট পর পায়ের ওপর লুটিয়ে গড়াগড়ি করলেও ছাড়বো না—গুলি করবো।'

বিচলিত হয়ে ওঠার ভান করে ইকরামুল্লা খান। যেখানে বসে আছে সে, সেখান থেকে খাটটা বেশ খানিক দূরে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেই গুলি খেতে হবে। দু'জনের মাঝখানে আবার একটা টেবিলও রয়েছে। না, লাফিয়ে পড়ে সুবিধে করা যাবে না।

'কই বলো!' তাড়া দেয় লোকটা ইকরামুল্লা খানকে।

ইকরামুল্লা বলে, 'ভুল করছো তুমি। আমি তোমার কথাই বুঝতে পারছি না!

সম্ভবত আমাকে অন্যলোক ভেবে…'

'বার্মায় যাওনি তুমি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বার্মীজটা, 'চীরণ মন্দিরের পুরোহিতকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করোনি? তার আগে লাম্বাকে খুন করে লকেট সুদ্ধ গুপ্তধনের নকশাটা হাতিয়ে নাওনি তুমি?'

'আমি! আমি বার্মায় গিয়েছিলাম তা মানছি। কিন্তু শুধু বার্মায় যাওয়ার অপরাধে কাউকে মেরে ফেলে না কেউ।'

বার্মীজটা ঘড়ি দেখে নিয়ে বললো, 'লাম্বাকে হত্যা করার কথা অস্বীকার করছো তাহলে তুমি?'

ইকরামুল্লা খান রীতিমত চঞ্চল হয়ে ওঠে মনে মনে। স্পষ্ট বুঝতে পারে সে, যে লোকটা তার সম্পর্কে সব খবরই জানে। সম্ভবত বার্মা থেকেই তার পিছু নিয়েছে। ইকরামুল্লাকে চুপ করে থাকতে দেখে বার্মীজটা, বলে, 'আর তিন মিনিট তোমার আয়ু আছে। এখনও বলো।'

ইকরামুল্লা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলে বাধা দিয়ে বার্মীজটা বলে ওঠে, 'খবরদার! কোনো চালাকি নয়!'

লোকটা নিজেই এবার খাট থেকে নেমে মেঝের উপর দাঁড়ায়। পিস্তলের নলটা মুহূর্তের জন্যেও ইকরামুল্লার বুকের দিক থেকে নড়েনি।

'আর দু'মিনিট তুমি বেঁচে আছো,' স্থির কণ্ঠে বলে লোকটা।

ইকরামুল্লা খানকে এতক্ষণে চিন্তিত বলে মনে হয়। কি যেন ভাবে সে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, বলবো আমি তোমাকে। কিন্তু লকেটটা সত্যিই আমার কাছে এখন নেই। কথাগুলো গুছিয়ে বলা দরকার। তার জন্যে সময় প্রয়োজন।'

'গুড বয়! লাগুক সময়, বলতে শুরু করো তুমি। আমি শুধু জানতে চাই লকেটটা আছে কোথায়। আদায় করে নেবার ভার আমার ওপরই ছেড়ে দাও।'

'সিগারেট খেতে পারি?' জিজ্ঞেস করে ইকরামুল্লা খান।

মাথা নেড়ে অনুমতি দেয় লোকটা। ইকরামুল্লা খান পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঠোঁটে নেয় একটি। তারপর প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় বার্মীজটার দিকে। একহাতে লুফে নিয়ে আবার ছুঁড়ে ফেরত দেয় সে প্যাকেটটা। বলে, 'চলে না।'

প্যাকেটটা ধরে পকেটে ভরে ইকরামুল্লা খান। তারপর সেই পকেট থেকেই বের করে আনে একটা লাইটার। বার্মীজটার দিকে আর একবারও না তাকিয়ে লাইটারে আঙুল বসিয়ে চাপ দেয় সে। প্রথমবার জ্বলে না লাইটার। দ্বিতীয়বার চাপ দিতেও জ্বলে না। বিরক্ত হয়ে লাইটারটা উল্টেপাল্টে দেখে ইকরামুল্লা খান। তারপর আবার চাপ দেয়। কিন্তু পরপর আরও তিনবার চাপ দিতেও জ্বললো না সেটা। জ্বললো পঞ্চম বারের চেষ্টায়।

সিগারেটটা জ্বালিয়েই লাইটারটা আস্তে করে ছুঁড়ে দিলো ইকরামুল্লা খান বার্মীজটার দিকে। তৈরি ছিলো না বার্মীজটা। ফলে ধরতে গিয়েও ফসকে গেল সেটা হাত থেকে। দু'পায়ের মাঝখানে গিয়ে পড়লো সেটা। বিরক্ত কণ্ঠে লোকটা বলে উঠলো, 'একবার বললাম না তোমাকে যে, সিগারেট খাই না?'

'দুঃখিত, আমার ভুল হয়েছে।'

মনে মনে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—দশ পর্যন্ত গুণতে গুণতে বার্মীজটার উদ্দেশ্যে বললো ইকরামুল্লা। ঠিক দশ সেকেণ্ড হতেই অকস্মাৎ কয়েক পা পিছিয়ে এলো ইকরামুল্লা খান। সঙ্গে সঙ্গে বার্মীজটার পায়ের তলায় পড়ে থাকা লাইটারটা বার্স্ট করলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো তিনফুট জায়গা জুড়ে। বিশেষ কোনো শব্দ হল না। আগুনের শিখার হিসহিস শব্দ কেবল শোনা গেল একটানা। অবশ্য বার্স্ট করার মুহূর্তে টিপ করে একবার শব্দ হয়েছে কি ঘটলো কিছুই বোঝবার সাধ্য নেই এখন আর বার্মীজটার। শরীরের ডান দিকটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার মাথার মাঝ বরাবর জায়গা থেকে। ছটফট করে সরে যেতে চেয়েছিল সে আগুনের আওতা থেকে, কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না তার। বিশেষ ধরনের এই আগুনে-বোমার আসল শক্তিই এর তীব্র ঊর্ধ্বমুখী শিখায়। এর মাঝখানে যে পড়বে তার শরীরের অর্ধেকের বেশি ছাই করে দিয়ে ফুঁ মেরে দূরে সরিয়ে দেবে। বার্মীজটা এখন খাটের তলায় পড়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে ও যে একজন মানুষ ছিলো তা বিশ্বাস করা কঠিন। একগাদা ছাই ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…' গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে ইকরামুল্লা খান। হাসি থামিয়ে বার্মীজটার বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপে ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে, 'কি বলেছিলে হে, মাত্র দু'মিনিট আমার আয়ু! কুয়াশার কাছ থেকে চুরি করা জিনিস, বাওয়া! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…'

হাসতে হাসতে কেবিনের কোণের দিকে এগোতে থাকে ইকরামুল্লা খান। বার্মীজটার হাত থেকে রিভলভারটা পড়ে ছিটকে গেছে এককোণে। হঠাৎ চমকে ওঠে ইকরামুল্লা খান। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ার শব্দ ওঠে কেবিনের একটা জানালার কাঁচ। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখলো রঙিন চশমা পরা যে লোকটাকে হলঘরে বসে থাকতে দেখে ম্যানেজারকে সাবধান করে এসেছিল, যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে, সেই লোকটা রিভলভার হাতে কেবিনের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে। বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে আগন্তুক, 'যা মনে করেছি তাই, শেষ করে ফেলেছো লোকটাকে, কেমন?'

'কে তুমি?' একটু ভয়ে ভয়েই শক্ত সমর্থ আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ইকরামুল্লা খান। 'জানালা ভেঙে এখানে ঢোকার কারণটা কি তোমার?'

আগন্তুক তীব্রদৃষ্টিতে ইকরামুল্লা খানের আপাদমস্তক দেখে একবার। তারপর

বলে, 'আমাকে ঐ বার্মীজটার মতো আনাড়ী মনে কোরো না। যা জিজ্ঞেস করবো তার উত্তর দেবে সোজা ভাষায়। বার্মা থেকে যে লকেটসুদ্ধ নকশাটা নিয়ে এসেছো, সেটা কার কাছে? তোমার কাছে না নাসিরুল্লার কাছে?'

'লকেট! আমি তো…'

ইকরামুল্লাকে ধমক মেরে আগন্তুক মোটা গলায় বলে ওঠে, 'বাজে অজুহাত শুনতে আসিনি আমি। যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর চাই।'

'আমি জানি না।' গোঁয়ারের মতো জেদের সুরে বলে ইকরামুল্লা খান।

আগন্তুক বলে, 'পৃথিবীতে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ঐ লকেটের ভিতর রাখা নকশা নিয়ে চীরণ মন্দিরের কোটি কোটি টাকার হীরে-জহরত উদ্ধার করতে পারবো। এবং আমিই তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবো লকেটটা। বলো, কার কাছে আছে সেটা?'

'আমি জানি না।' যন্ত্রচালিতের মতো বলে ইকরামুল্লা খান। ভিতরে ভিতরে দারুণ উৎকণ্ঠায় ঘেমে উঠতে থাকে সে। এ শত্রু ভয়ঙ্কর শক্তিধর তা সে অনুমানেই টের পেয়ে গেছে।

'আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা কোরো না। তুমি যদি সৎ উপায়ে লকেটটা সংগ্রহ করতে তবে আমি এভাবে তোমার কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে আসতাম না কখনও। অভিশপ্ত লকেট ওটা। শত শত উচ্চাভিলাষী প্রাণ হারিয়েছে ওর প্রতি লোভ করে। তুমিও লাম্বাকে খুন করে ওটা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছো বার্মা থেকে। সুতরাং ওটার জন্যে আমি তোমাকে কোনো দাম দেবো না।'

'কিন্তু…' কি যেন বলতে চায় ইকরামুল্লা খান।

আগন্তুক বাধা দিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আমাকে তুমি আজ দেখলে, পরে আর একবার দেখবে তৃতীয়বার আমাকে দেখতে পাবে না। তার আগেই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে তোমাকে। আজ আমি চলি। আর একবার লকেটটার জন্যে আসবো আমি, সেই শেষ।'

রিভলভারটা ইকরামুল্লা খানের দিকে ধরে রেখে পিছু হটতে থাকে আগন্তুক। জানালার সামনে গিয়ে পিছন ফিরেই জানালার উপর উঠে বসে চলে যেতে থাকে অপর দিকে।

'কিন্তু কে তুমি? নাম কি তোমার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ইকরামুল্লা খান।

আগন্তুক তখন জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাতাসে ভর করে ভেসে আসে গুরু গুরু মেঘের ডাকের মতো একটি মোটা স্বর, 'কু-য়া-শা'।

'কুয়াশা!'

নামটা শুনে ইকরামুল্লার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে আতঙ্কে। আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বারবার উচ্চারণ করতে থাকে সে, 'কুয়াশা! কুয়াশা!! কুয়াশা!!!'

চার

আজ পূর্ণিমা। শান্তিনীড়ের আনাচে কানাচে আজ রহস্যময় একটি ছায়াকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতে পারে। প্রতি পূর্ণিমার রাতেই ছায়াটাকে দেখা যায়।

শহীদ নিজের বাড়িতে সারওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছে। শহীদ আর মহুয়া মিলে চেষ্টা করে চলেছে সারওয়ারকে সাহস যোগাবার জন্যে। বোবা হয়ে গেছে যেন ছেলেটা। ভয়, অবিশ্বাস, অপরাধবোধ, চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরেছে বেচারাকে। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করেনি ওকে মহুয়া। শান্তিনীড় হত্যারহস্যের অনেক রহস্য উন্মুক্ত হবে সারওয়ারের কথা শোনার পর—শহীদের বিশ্বাস। যে কোনো মুহূর্তে সে কথা বলে উঠতে পারে। সুতরাং নিজে না গিয়ে কামালকে পাঠালো শহীদ শান্তিনীড়ে। কামাল রাতের অন্ধকারে ঢুকবে শান্তিনীড়ে। তাকে ভেদ করে আসতে হবে পূর্ণিমা-রাতের ছায়া-রহস্য। রাত সাড়ে বারোটার মধ্যে খবর দেবে কামাল শহীদকে।

কামাল শহীদের ফোক্সওয়াগেনটা নিয়ে শান্তিনীড়ের মেন গেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে থামলো। রাত এখন এগারোটা।

আমিন বাজারে রাত এগারোটা। চাঁদের অদ্ভুত আলোর আভা চারদিকে। আলো এবং ছায়ায় জায়গাটা রহস্যময়। কংক্রিটের সুদূর প্রসারিত রাস্তাটা চলে গেছে সাভারের দিকে। দু'পাশে নিচু ধান খেত। মাঝখানে বিরাট উঁচু পাঁচিল ঘেরা শান্তিনীড়। জনমনিষ্যিহীন—রাত এগারোটার প্রাসাদতুল্য বাড়িটাকে মনে হচ্ছে পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ি।

কামাল গাড়ি লক করে নিঃশ্বাস বন্ধ করলো। না, কোথাও কোনো টুঁ-শব্দ নেই। আর কয়েক সেকেণ্ড নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। না, কোনো দিকে কোনো মানুষের ছায়ামাত্র নেই।

গাড়িটা রাস্তার পাশে রেখে শান্তিনীড়ের পাঁচিল ঘেঁষে সতর্ক পায়ে হাঁটতে লাগলো কামাল। শান্তিনীড়ে যে অশান্তির কালো ছায়া ছেয়ে গেছে হঠাৎ করে, তার কারণ এবং রহস্য খুঁজে বের করতে হবে। প্রতি পূর্ণিমার রাতে যে ছায়াটাকে শান্তিনীড়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, তার সঙ্গে কি এই মর্মান্তিক অশান্তির কোনো যোগাযোগ আছে?

মিনিটখানেক পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটার পর দু'টি বকুল গাছ পেরিয়ে শান্তিনীড়ের লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো কামাল। বাড়ির ভিতরটা এখান থেকে দেখা যায় না ভালো করে। অনেকগুলো গাছ বাধার সৃষ্টি করে। চারপাশটা একবার দেখে

নিয়ে বন্ধ লোহার গেটের শিক ধরে উপরে উঠতে থাকে কামাল। হঠাৎ কেমন যেন ছমছম করে ওঠে তার সর্বশরীর। ঘাড় বাঁকিয়ে অদূরে দাঁড়ানো বকুল গাছ দুটোর দিকে তাকায় সে। চাঁদের আলো আজকে কেমন যেন লালচে, পূর্ণিমা বলেই সম্ভবত। কামাল বকুল গাছের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠাহর করতে পারে না। মনে মনে হাসে সে। মনের ভুল ভেবে নিয়ে আবার সে নিঃশব্দে এবং অতি সতর্কভাবে উঠতে থাকে লোহার শিকগুলোর উপর পা ফেলে ফেলে।

লোকটা শিকারী বিড়ালের মতো বিন্দুমাত্র শব্দ না করে ঝুপ্ করে নামলো একটি বকুল গাছের উপর থেকে। খাকী রঙের টি-শার্ট আর মোটা জিনের নীল রঙের প্যান্ট পরনে। গলায় একটা নকশা করা রঙিন রুমাল বাঁধা। নুয়ে নুয়ে, নিঃশব্দ পায়ে, তীক্ষ্ণ চোখ দুটো কামালের দিকে স্থির রেখে লোকটা দ্রুত এগোলো। হাতে একটা মোটা রড।

বিন্দুমাত্র টের পেলো না কামাল। শেষ মুহূর্তে লোকটা বুঝি ইচ্ছে করেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। থমকে দাঁড়ালো কামাল লোহার গেটের উপর। অর্ধেকটা মাত্র উঠেছে সে। প্রায় সাথে সাথে লাফ দিলো লোকটা। কামাল লোকটাকে দেখলো লাফ দেয়া অবস্থায়। কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হলো না তখন তার পক্ষে। লোহার মোটা রডটা কামালের মাথার ঠিক বাম পাশে বসিয়ে দিলো লোকটা সজোরে। দু'হাত খসে গেল শিক থেকে। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে প্রচণ্ড আঘাতে।

লোকটা হাতের রড ফেলে দিয়ে ধরে ফেললো কামালের অচেতন দেহটা। সামান্য একটু শব্দ হলো মাত্র। লোকটা ঝটপট কাঁধে তুলে নিলো কামালকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বকুল গাছ দুটোর নিচে গিয়ে দাঁড়ালো।

'চললাম বে! আর এক হালা আইবার পারে, সামাল দিস—কিমুন?'

লোকটার কথার উত্তর এলো একটা বকুল গাছের উপর থেকে, 'ঠিক হ্যায়, শাগরেদ!'

কামালকে নিয়ে হাঁটা শুরু করে লোকটি বললো, 'অই ঠেপির পো, ওস্তাদ ক!'

খিল খিল করে হেসে একদলা থুথু ফেললো গাছের উপর থেকে অপর লোকটা। আর কোনো কথা হলো না ওদের মধ্যে। কামালকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা একটা ঝোপের ভেতর ঢুকলো। সেখানে একটা ওল্ড মডেলের পুরানো ফোরডোর বেবী অস্টিন রাখা আছে দেখা গেল। কামালকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসলো লোকটি। স্টার্ট নিলো গাড়ি। রাস্তায় উঠে এসে পুরানো গাড়িটা যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হলো। তীব্র বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা দেখতে দেখতে।

*

এদিকে আর এক রহস্যের সূচনা শুরু হলো শান্তিনীড়ের ভিতর।

আজ পূর্ণিমা।

প্রৌঢ় মাস্টার সাহেব জানালার সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে উদাস নয়নে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। গতকালের ঘটনা থেকে আজ সকালের ঘটনাগুলো বারবার গুছিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবারই জট পাকিয়ে যাচ্ছিলো তাঁর চিন্তা-জাল। আশ্চর্য, অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বাড়ির ছোট ছেলেটা নিখোঁজ, তারপরই মেজটা খুন! কিভাবে ঘটলো এসব? কেন ঘটলো? কে ঘটালো? এবং আরও কি কি ঘটবে?

হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগলো মাস্টার সাহেবের মনে। আচ্ছা, প্রতি পূর্ণিমার রাতে এ বাড়িতে যে রহস্যময় ছায়াটাকে দেখা যায় তার সঙ্গে এসব ঘটনার কোনো যোগাযোগ আছে না কি? কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি, ঠিক এমন সময়ই দেখলেন ছায়াটা।

মাস্টার সাহেবের জানালা থেকে হাত পনেরো-বিশ দূরে একটা শিমুল গাছ। সেই গাছের পাশ ঘেঁষে ধীরে ধীরে একটা মানুষের কালো ছায়া সরে গেল পুব দিকে।

আজই তো পূর্ণিমা। কথাটা মনে পড়তেই সারা শরীর শিরশির করে উঠলো মাস্টার সাহেবের । অশরীরী একটা ভয় এসে ছুঁয়ে দিলো আলতো ভাবে মাস্টার সাহেবের বুকের ভিতরটা। চেয়ার থেকে উঠে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন তিনি জানালাটা। কিন্তু পরক্ষণেই পুরানো সন্দেহটা জাগলো তাঁর মনে—এই রহস্যময় ছায়ার সঙ্গে কাওসারের মৃত্যু আর মন্টির নিখোঁজ হবার যোগ নেই তো? সন্দেহটা কেন যেন সত্যি বলে ঠেকলো মাস্টার সাহেবের। কি যেন ভাবলেন তিনি ঘরের মেঝের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ছোটবেলা থেকে পড়িয়ে আসছেন তিনি এ বাড়ির তিনটে ছেলেকে। সেই কত যুগ আগে এসেছিলেন তিনি এ বাড়িতে গৃহশিক্ষক হয়ে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, চাল-চুলো কিছুই নেই। সারওয়ারের আব্বা আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে এনে। সেই থেকে রয়ে গেলেন তিনি এ বাড়ির একজন হয়েই । সারওয়ার কাওসারকে লেখাপড়া শিখিয়ে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। বিয়েসাদী করার কথা তাঁর কোনদিন মনেই পড়েনি। মন্টিকেও মানুষ করে গড়ে তোলার ভার তাঁর উপরই বর্তেছে। তাকেও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে—অথচ এমন কাণ্ড ঘটে গেল! সারওয়ার, কাওসার, মন্টি তাঁরই হাতে বলতে গেলে মানুষ। তিনিই তো এদের গুরু। তাঁরও তো একটা দায়িত্ব আছে এদের ভালো মন্দের ব্যাপারে। ভয় পেয়ে সে দায়িত্ব পালন না করা তো রীতিমত অন্যায়। কাওসারের খুনীকে ধরার ব্যাপারে তিনিও তো কোনো না কোনো তথ্য পেয়ে যেতে পারেন চেষ্টা করলে।

আর কোনো ভয় বা দ্বিধা রইলো না মাস্টার সাহেবের। টেবিলের উপর থেকে ভারি পাওয়ারের চশমা চোখে লাগিয়ে জুতোটা পরে নিলেন তিনি। কি মনে করে চৌকির তলা থেকে একটা মোটা লাঠি বের করে হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে চারপাশটা ভালো করে দেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। যে রহস্যময় ছায়াটাকে দেখেছেন, তাকে তিনি খুঁজে বের করবেন আজ। এই রহস্যের একটা সুরাহা হওয়া উচিত। বলা যায় না, কাওসারের হত্যা রহস্যই হয়তো মীমাংসা হয়ে যাবে ছায়াটাকে ধরতে পারলে।

চাঁদের আলো চারদিকের গাছের পাতার ফাঁক গলে উঠানে নকশা কেটেছে। চশমাটা ঠিক করে উঠানে নেমে এলেন মাস্টার সাহেব। চশমা পরে দিনের বেলাতে তবু যা হোক দেখতে পান তিনি, কিন্তু রাতে খুব অসুবিধে হয়। মাস্টার সাহেব সন্দেহে সন্দেহে চারটে দিক বারবার দেখে নিলেন। উঠানের একধার ঘেঁষে কয়েক কদম এগোবার পরই চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। কাছে-পিঠে কে যেন ভারি নিঃশ্বাস ফেললো। কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করে মনে মনে হেসে ফেললেন মাস্টার সাহেব। ও কিছু না, গাছের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। এবার হঠাৎ খসখস করে শব্দ উঠলো সামনের ছোট একটা ঝোপের আড়াল থেকে। পিটপিট করে তাকিয়ে রইলেন তিনি ঝোপটার দিকে। একটা ছুঁচো ছিটকে বেরিয়ে গেল। আবার একবার হাসলেন তিনি। তারপর পা পা করে পুব দিকে হাঁটতে লাগলেন। ছায়াটাকে তিনি পুবদিক বরাবরই যেতে দেখেছেন।

কিছুদূর যাবার পরই কোথায় যেন একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। মাস্টার সাহেব চমকে উঠলেন। হাঁটতে হাঁটতে বারবার থেমে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজছিলেন তিনি। একটা লম্বা ছায়া দেখে হঠাৎ তিনি কেঁপে ওঠেন। ধ্বক করে ওঠে বুকের ভিতরটা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকেন তিনি সেই দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ভুল ভাঙে তাঁর— ওটা একটা গাছের ছায়া। আবার এগোলেন পা পা করে।

রান্নাঘরটা ঘুরে সামনের দিকে এগোতে থাকেন মাস্টার সাহেব। আর একটু সামনে এগোলেই তিনি মি. নাসিরের ঘরের কাছে এসে পড়বেন। চলার গতি আর একটু মন্থর করেন তিনি। শব্দ হলে ঘুম ভেঙে যাবে কারো। রাতে এভাবে চোরের মতো চুপিচুপি বাড়ির উঠানে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কে কি ভাববে কে জানে। সুতরাং সাবধানে চলা উচিত।

মি. নাসিরের ঘরটা দূর থেকে দেখতে পান মাস্টার সাহেব। দরজা জানালা বন্ধ বলেই মনে হয় তাঁর। কিন্তু জানালার চিকন ফাঁক গলে সরু আলোর ছটা বাইরে এসেছে যেন। নাসির সাহেব জেগে আছেন, ভাবেন মাস্টার সাহেব। আর ঠিক তখুনি তিনি দেখতে পান নাসির সাহেবের দরজার একপাশে একটা কালো মতো ছায়া।

গাছের ছায়া বোধহয়, ভাবেন মাস্টার সাহেব। এমন অনেকবার গাছের ছায়াকে মানুষের ছায়া বলে সন্দেহ করে চমকে উঠেছেন তিনি। আরে! গাছের ছায়া কি নড়েচড়ে ওঠে! এ যে দেখছি···।

হার্টবিট একলাফে চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় মাস্টার সাহেবের। নাসির সাহেবের দরজার পাশ থেকে সরে যাচ্ছে একজন মানুষ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। পা ফেলে ফেলে হাঁটছে ছায়ামূর্তি। না; আর কোনো সন্দেহ নেই। ছায়ামূর্তি নাসির সাহেবের দরজা ছাড়িয়ে মিসেস নাসিরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি উঠনের একটা গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন মাস্টার সাহেব। কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাচ্ছে তাঁর। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। ছায়ামূর্তিকে চিনে উঠতে পারেন না প্রৌঢ় মাস্টার সাহেব। কে এ রহস্যময় লোক? এভাবে প্রত্যেকের দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি করছে ও? কিছু শোনার চেষ্টা করছে নাকি?

মিনিটখানেক মিসেস নাসিরের দরজার সামনে অপেক্ষা করে নিঃশব্দ পায়ে বারান্দা ধরে এগিয়ে চলে ছায়ামূর্তি। শক্ত করে চেপে ধরেন মাস্টার সাহেব তাঁর হাতের লাঠি। ছায়ামূর্তি সোনার মার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবার। সেখানেও বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না সে। বারান্দা থেকে নেমে হাঁটতে থাকে ছায়ামূর্তি দক্ষিণে বাগানের দিকে।

'খুক খুক!' হঠাৎ কেশে ফেলেন মাস্টার সাহেব।

মুখে হাত চাপা দিয়েও শব্দ চাপা দিতে পারেন না তিনি। চমকে উঠে উঠনের মাঝখানে থমকে দাঁড়ায় ছায়ামূর্তি। পরক্ষণেই বারান্দার উপর থেকে ডেকে ওঠে একটি বিড়াল মিউ মিউ করে। ছায়ামূর্তি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় বিড়ালটার দিকে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে দেখে পা টিপে টিপে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দুরুদুরু বুকে হাঁটতে থাকেন মাস্টার সাহেব। ছায়ামূর্তিটাকে চিনতে হবে। কে ও?

ছায়ামূর্তি কোনো দিকে না তাকিয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ করে। পুরো বাগানটা ঘোরে সে ক্লান্ত পদক্ষেপে। পাগল নাকি লোকটা? রাত দুপুরে কেন সে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

মাস্টার সাহেবের মনে হাজারটা কল্পনা যেতে আসতে থাকে। কিন্তু কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। বাগান থেকে বেরিয়ে লোকটা বাড়ির গেটের দিকে এগোয়। দূর থেকে ছায়ামূর্তির নড়াচড়া লক্ষ্য করতে করতে পিছন পিছন হাঁটেন মাস্টার সাহেবের। ছায়ামূর্তি গেটের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে। তারপর আবার পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করে। ঝট্ করে লুকিয়ে পড়েন মাস্টার সাহেব একটা ঝোপের আড়ালে। ছায়ামূর্তি তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। মনের ভিতর ঝড় বইতে শুরু করে মাস্টার সাহেবের। লাঠিটা শক্ত করে

ধরে থাকেন তিনি। এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি। কি করবেন তিনি। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরে চিৎকার করে বাড়ির সকলকে জাগিয়ে তুলবেন? নাকি তার আগে সর্বশক্তি দিয়ে ছায়ামূর্তির মাথায় বসিয়ে দেবেন মোটা লাঠির এক ঘা? কিন্তু, হঠাৎ তাঁর মনে হয়—লোকটা আসলে কে হতে পারে? এ বাড়িরই কেউ নয় তো?

ছায়ামূর্তি সামনের দিকে আসছে এখনও পা পা করে। নাসির সাহেব নয়তো? চশমাটা খুলে কাঁপা হাতে ভালো করে মোছার চেষ্টা করে আবার পরেন মাস্টার সাহেব কিন্তু ছায়ামূর্তিকে এবারও চিনতে পারেন না তিনি। এসে পড়েছে লোকটা। মানুষ? না কি অশরীরী কোনো কিছু…।

ছায়ামূর্তি নিশ্চিন্ত মনে মাস্টার সাহেবের চারহাত দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মাস্টার সাহেব দেখতে পান ছায়ামূর্তির গায়ে একটা কালো চাদর জড়ানো। মাথার উপরও ঘোমটার মতো জড়ানো রয়েছে চাদরের একটা অংশ। মেয়েছেলে নয় তো? ভাবেন মাস্টার সাহেব।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করার সুযোগ পান না তিনি। এগিয়ে যাচ্ছে ছায়ামূর্তি। অদৃশ্য হয়ে যাবে চোখের আড়ালে। এমনিতেই তিনি চোখে দেখতে পান না, হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার সতর্ক পদক্ষেপে অনুসরণ করতে থাকেন মাস্টার সাহেব রহস্যময় ছায়ামূর্তিকে।

আধঘন্টা পর রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠেন মাস্টার সাহেব। ছায়ামূর্তির উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারেন না তিনি। কেন এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু শুধু? ইতিমধ্যে গোটা বাড়িটা কয়েকবার চক্কর মেরেছে সে। এবার নিয়ে চারবার হবে। বাড়ির কোথাও যেতে বাকি রাখেননি মাস্টার সাহেব ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে। অথচ কিছুই পরিষ্কার হয়নি তাঁর কাছে। তিনি যদি চিনতে পারতেন, তবে যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেন। মাথায় বাড়ি মেরে ব্যাটাকে কাবু করে ফেলা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কিন্তু…

হঠাৎ চমকে ওঠেন মাস্টার সাহেব হাঁটতে হাঁটতে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি একটি গাছের নিচে। অদূরে থমকে দাঁড়িয়েছে ছায়ামূর্তিও। বাগানের ভিতর রয়েছে ওরা এখন। মাস্টার সাহেব বিস্ফারিত চোখে দেখেন, ডান পাশের সরু রাস্তা ধরে লম্বা-চওড়া আর একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে হন হন করে। তার হাতে লম্বা মতো কি যেন রয়েছে একটা। ইনি আবার কে হলেন? কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন হঠাৎ? বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না মাস্টার সাহেবের। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি তাঁর এবং প্রথম ছায়ামূর্তির মধ্যবর্তী সরু রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যায় দ্রুত তালে পা ফেলে। চলার ভঙ্গি দেখেই চিনে ফেলেন মাস্টার সাহেব দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিকে। নাসির সাহেব! নাসির সাহেব এতো রাতে বাগানে কেন?

কিছু চিন্তা ভাবনা করার সময় পান না তিনি। প্রথম ছায়ামূর্তি গাছের আড়াল

থেকে বেরিয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু করে যেদিকে নাসির সাহেব গেছেন সেদিকে। মাস্টার সাহেবও চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে প্রথম ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে চলেন।

বেশিদূর যেতে হলো না। বাগানের দক্ষিণ দিকের একটা লিচু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়লেন মাস্টার সাহেব। কুড়ি হাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাসির সাহেব। ঝুকে পড়ে কি যেন দেখছেন তিনি মাটির উপর। প্রথম ছায়ামূর্তিটিও মাস্টার সাহেবের ডান দিকে একটি ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নাসির সাহেবের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। নাসির সাহেবের হাতে ধরা জিনিসটা হঠাৎ চিনে ফেলেন মাস্টার সাহেব। হতভম্ব হয়ে পড়েন তিনি। কোদাল! নাসির সাহেবের হাতে কোদাল কেন?

অকস্মাৎ নাসির সাহেব মাথার উপর উঁচিয়ে ধরেন কোদালখানা। তারপরই মাটির উপর একটা কোপ মারেন সজোরে। এক চাঙ মাটি সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার কোপ মারার জন্য মাথার উপর তুলে ধরেন তিনি কোদালটা। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে আস্তে আস্তে নামিয়ে নেন সেটা। কি যেন ভাবেন মাটির দিকে মাথা নিচু করে। তারপর নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'থাক, আজ থাক।'

কথাটা আপন মনেই বলে চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাকান নাসির সাহেব। তারপর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার ফিরতি পথে চলতে শুরু করেন হন হন করে। মাস্টার সাহেব অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নাসির সাহেবের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন। থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছেন তিনি কুৎসিত একটা সন্দেহ মনে চেপে বসায়। সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে চেপে বসতে থাকে মাস্টার সাহেবের মনে।—তাহলে মন্টিকে খুন করে নাসির সাহেব মাটিতে পুঁতে রেখেছেন!

সর্বশরীর রী রী করে ওঠে মাস্টার সাহেবের। নাসির সাহেব তেমন চরিত্রবান লোক নন তা তিনি অনুমানে জানতেন। মদ তিনি বাড়িতে বসেও খান। তাছাড়া প্রত্যেক দিন গভীর রাতে কোথায় যেন বের হয়ে যান তিনি। নিশ্চিত অতো রাতে কোনো ভালো জায়গায় যান না তিনি। কিন্তু নাসির সাহেব যে ভয়ানক একটা শয়তান তা তিনি কোনদিন ভাবেননি। কিছুক্ষণ আগের কার্যকলাপ দেখে তাঁর আর কোনো সন্দেহই নেই যে, কাওসারকে নাসির সাহেবই খুন করেছেন। আর মন্টিকে নিশ্চয়ই খুন করে পুঁতে রেখেছেন মাটির তলায়। পুলিসের ভয়েই মাটি থেকে লাশটা তুলে বাড়ির বাইরে কোথাও ফেলে আসতে চান এখন!

কিন্তু এ আবার কি?

মাস্টার সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকান যেখানে নাসির সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন কোদাল হাতে করে সেইদিকে। প্রথম ছায়ামূর্তিটি ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। আর ঠিক তার হাত দশেক পিছনে এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। চশমাটা খুলে তাড়াতাড়ি মুছে আবার পরে নেন মাস্টার

সাহেব। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে মহিলা প্রথম ছায়ামূর্তির দিকে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে পিছনে ফিরে তাকায় প্রথম ছায়ামূর্তি। মহিলা ছায়ামূর্তি কথা বলে ওঠে নিচু স্বরে, 'ভয় নেই! তোমার কাছেই এসেছি আমি!'

স্বপ্ন নাকি! এ যে মিসেস নাসিরের কণ্ঠস্বর! নিজেকে পাগল মনে করবেন কিনা ভাবেন মাস্টার সাহেব। এসব কি ঘটছে রাত দুপুরে!

'প্রতিশোধ নিতে চাও?' হিসহিস করে ওঠে মিসেস নাসিরের কণ্ঠস্বর। দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রথম ছায়ামূর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। বলেন, 'কি, কথা বলছো না যে!'

'চাই! এখুনি চাই!' ড্রাইভার শামসু মিয়ার কণ্ঠস্বর! আবার একবার চমকে ওঠেন মাস্টার সাহেব। ড্রাইভার শামসু হিংস্রভাবে কথা বলে ওঠে।

'না, আজ নয়! আমি সুযোগ করে দেবো তোমাকে, আমিও তৈরি হয়ে নিই আগে...' মিসেস নাসির ড্রাইভার শামসুর উদ্দেশ্যে বলেন।

কান পেতে ওদের বাকি কথা শোনার চেষ্টা করেন মাস্টার সাহেব। কিন্তু ওরা দুজন অতি কাছাকাছি সরে গিয়ে অত্যন্ত নিচু স্বরে শলা-পরামর্শ করছে। আর কোনো কথাই কানে ঢোকে না মাস্টার সাহেবের। কি করবেন তিনি এখন ভাবছেন। এরমধ্যে হঠাৎ তিনি দেখলেন মিসেস নাসির এবং ড্রাইভার শামসু হাঁটতে শুরু করেছে। তিনিও নিঃশব্দ পায়ে অনুসরণ করলেন ওদের দুজনকে।

কিন্তু আজকের পূর্ণিমা রাতের নাটকের এখানেই সমাপ্তি ঘটে। ড্রাইভার শামসু ধীরে ধীরে ফিরে যায় তার কোয়ার্টারে। মিসেস নাসিরও তাঁর ঘরে ঢোকেন পা টিপে টিপে। একা মাস্টার সাহেব উঠানে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন এখন তাঁর কর্তব্য কি। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাগুলো একে একে কল্পনা করেন তিনি। অনেক কথাই জানতে পেরেছেন তিনি। সবগুলোর রহস্য যদিও বুঝতে পারেননি। কিন্তু এসব কাজ কারবার নিয়ে রাতদিন যারা মাথা ঘামায় তারা হয়তো এর মধ্যে থেকেই নতুন কোনো তথ্য পেয়ে যাবে। সুতরাং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মাস্টার সাহেব, ডিটেকটিভ শহীদ খানকে সব ব্যাপার জানাবেন। তিনি হয়তো একটা সুরাহা করে ফেলবেন এ থেকেই। পুলিসের উপর তেমন আস্থা নেই তাঁর। তাছাড়া শহীদ খানের বাড়িতে গেলে সারওয়ারকেও দেখে আসতে পারবেন।

নিজের ঘরে ফিরে না গিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন মাস্টার সাহেব। টেলিফোন গাইড ঘেঁটে শহীদ খানের বাড়ির ঠিকানা লিখে নিলেন একটি কাগজে। তারপর হাতের লাঠিটা রেখে ড্রয়িংরুম থেকে বের হয়ে এসে বাড়ির গেটের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শহীদ খানকে জানানো দরকার সব কথা।

পাঁচ

রাত বারোটা।

উত্তেজিত পদক্ষেপে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে শহীদ।

দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরের সবকটা জানালা খোলা। ঘরের ভিতর দুজন মাত্র প্রাণী। সারওয়ার এবং শহীদ।

এইমাত্র সবকথা বলা শেষ করেছে সারওয়ার। শুনতে শুনতেই সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করেছিল শহীদ। এখন সে আরও অস্থির হয়ে উঠেছে। সারওয়ার যা বলেছে তা মিথ্যে নয়, একথা বুঝতে পারলো শহীদ। কিন্তু প্রশ্ন তাহলে—মন্টিকে গুদাম ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে গেল কে? কাওসার মন্টিকেই খাবার দেবার জন্যে ওখানে উপস্থিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারওয়ারের অনেক আগেই গিয়েছিল সে। তখন বৃষ্টিও শুরু হয়নি। কাওসার নিহত হলো তাহলে কার হাতে? নিশ্চয়ই মন্টিকে যে চুরি করেছে গুদাম ঘর থেকে সে-ই খুনী।

সারওয়ার এবং কাওসার যখন মন্টিকে চুরি করার প্ল্যান করছিল তখন ওদের কথা কেউ না কেউ আড়ি পেতে শুনেছে। তারই কাজ এগুলো। তার মানে অপরাধী বাইরের লোক নয়, বাড়িরই কেউ! কিন্তু কে হতে পারে সেই লোক? মি. নাসির? উনি টাকার লোভে এমন নিষ্ঠুর কাজ করবেন? মিসেস নাসির? কিন্তু উনি কোন্ স্বার্থে এমন কাজ করতে যাবেন? ড্রাইভার? এমন নির্মম কাজ করার দুঃসাহস কি তার হতে পারে? সোনার মা? কিন্তু সোনার মা ওঁদের তিন ভাইকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, তার দ্বারা এমন কাজ অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। মাস্টার সাহেব? সোনার মার মতো তিনিও তো বহুদিনের পুরানো লোক শান্তিনীড়ের। যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায়, তিনি কি টাকার লোভে এই কাজ করতে পারেন? আর একটা কথা, বাড়ির লোকের সঙ্গে বাইরের লোকেরও যোগাযোগ আছে এই কাজে। চিঠিটা তার প্রমাণ। বাড়ির কোনো লোকের হাতের লেখার সঙ্গে মিল নেই চিঠিটার লেখার। এখন প্রশ্ন হলো—চোরের উপর বাটপারি করলো কে? কে মন্টিকে চুরি করলো। চুরি করে রাখলই বা কোথায়?

এইসব ভাবছিল শহীদ উত্তেজিত পায়ে পায়চারি করতে করতে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো জানালার সামনে। ঝট্ করে সরে গেল একটা ছায়া রাস্তার একপাশে। শহীদকে জানালায় দাঁড়াতে দেখেই অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো লোকটা। শহীদের বাড়ির ঠিক সামনেই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে।

কি যেন ভাবলো শহীদ। এমন সময় সারওয়ার বলে উঠলো, 'ভাইয়া, ধরতে পারবেন আমার ভাইদের…'

'নিশ্চয়ই, সারওয়ার! অপরাধী কোনদিন না ধরা পড়ে যায় না। তুমি একটুও

ভেবো না।'

সারওয়ার আস্থার দৃষ্টিতে তাকালো শহীদের দিকে। শহীদ জানালার সামনে থেকে সরে এসে আবার বললো, 'এখন তুমি তোমার ঘরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়গে, সারওয়ার! তোমার ঘুম দরকার এখন।'

ধীরে ধীরে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেল সারওয়ার। শহীদ দরজা বন্ধ করতে গিয়েও করলো না। পাশের ঘরে মহুয়া আছে। ওকে সাবধান করে দিয়ে আসতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে মহুয়ার ঘরে ঢুকলো শহীদ। মহুয়া শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। শহীদ বিছানার উপর গিয়ে বসে নিচু স্বরে বললো, 'ফেরেশতা এসেছেন বাইরে। তাকে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করছি আমার ঘরে। কিন্তু তুমিও সাবধানে থেকো, বলা যায় না, ফেরেশতা তো, তোমার ওপরও···।'

শহীদের সঙ্কেতধর্মী বক্তব্য শুনে আঁতকে উঠলো মহুয়া। বিছানা থেকে এক ঝটকায় নেমে জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিলো। তারপর শহীদের কাছে সরে এসে বললো, 'বাইরে থেকে ভাগিয়ে দাও। খামোকা···'

'না! কাজ আছে।'

শহীদের এই কথাতেই মহুয়া বুঝলো হাজার মাথা কুটলেও শহীদ যা ভেবেছে তা থেকে পিছিয়ে আসবে না। অগত্যা সে বলে উঠলো, 'এ ঘর থেকে বেরোও জলদি, আমি দরজা বন্ধ করে দিই।'

মৃদু হেসে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলো শহীদ। মহুয়াও বের হয়ে এসে দাঁড়ালো শহীদের সামনে। শহীদের একটা হাত ধরে ফেলে সে মৃদুকণ্ঠে বললো, 'সাবধানে, কেমন!'

মাথা নেড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো শহীদ। মহুয়া দরজা বন্ধ করে দুরুদুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইলো মেঝের উপর। শহীদ ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছাড়লো জানালার দিকে পিছন ফিরে। দরজা বন্ধ করে বিছানার উপর বালিশ সাজিয়ে একজন শায়িত মানুষের আকার দিলো। তারপর রিভলভারটা পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে বাতি নেভাবার জন্যে হাত বাড়ালো সুইচ বোর্ডের দিকে। ঠিক এমনি সময়ই দরজায় শব্দ হলো, 'ঠক! ঠক! ঠক!'

ভুরু কুঁচকে তাকালো শহীদ দরজার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো সে আস্তে করে, 'কে?'

'আমি! আমি মাস্টার সাহেব, শান্তিনীড় থেকে···'

'খুলছি, খুলছি!'

ব্যস্তভাবে এগিয়ে যায় শহীদ দরজার দিকে। দরজা খুলে মাস্টার সাহেবকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি খবর? এতো রাতে আপনি··?'

'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, মি. শহীদ। কিন্তু এতো রাতে চলে

এলাম, সত্যি, কথাটা একবারও মনে পড়েনি আমার। এখন না এসে কাল সকালে এলেও চলতো। তা এক কাজ…'

শহীদ বলে, 'আপনি বিচলিত হবেন না, মাস্টার সাহেব। আমি এখনই আপনার কথা শুনতে আগ্রহী। কিন্তু আধঘন্টাটাক আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আসুন, সারওয়ারের ঘরে এখনও বাতি জ্বলছে, ঘুমায়নি ও। আপনাকে ওর ঘরে রেখে আসি। আমার সামান্য একটু কাজ আছে।'

মাস্টার সাহেবকে সারওয়ারের ঘরে রেখে ফিরে আসে শহীদ। দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের বাল্‌বটা জ্বেলে দেয় সে। তারপর ঘরের বুক শেলফের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

পাঁচ মিনিট! দশ মিনিট! পনেরো মিনিট। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ি দেখে শহীদ। আরও পাঁচ মিনিট কাটে অপেক্ষায়। তারপরই দেখা যায় একজন লোককে জানালার কাঁচ দিয়ে। নিঃশব্দে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকে শহীদ। এদিকে জানালার গ্রিলটা ওঠাবার চেষ্টা করছে লোকটা। শহীদ লোকটার শরীরের কাঠামো আন্দাজ করে বুঝতে পারে লোকটা দারুণ শক্তির অধিকারী। দেখতে দেখতে জানালার গ্রিলটা সরিয়ে ফেলে লোকটা। বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না তার কাজে। পাকা লোক। পা ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে পড়ে ঘরের মেঝেতে। জিরো পাওয়ারের বাল্‌বের আলোয় চকচক করে ওঠে লোকটার হাতে ধরা ছোরাটা। এক পা এক পা করে খাটের দিকে এগোয় লোকটা। খাটে মশারী খাটানো রয়েছে। মশারীর ভিতর সাজানো বালিশের উপর চাদর ঢাকা দেয়া। লোকটা দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। এগোচ্ছে সে অদ্ভুত ভাবে শরীরটাকে বাঁকিয়ে নিয়ে। হাসি পেয়ে যায় শহীদের লোকটার শিকার ঘায়েল করার একাগ্রতা দেখে। মজাটা উপভোগ করতে চায় সে আর একটু।

মশারীর কাছে গিয়ে আলতোভাবে সেটা তুলে ধরে লোকটা। তারপরই হাতের ছোরাটা উঁচিয়ে ধরে বসিয়ে দেয় বালিশের উপর। কিন্তু চালু লোক ব্যাটা, ছোরাটা বসিয়েই বুঝতে পারে ধরা পড়ে গেছে সে। ঠিক সেই সময়ই শহীদ মাথার উপর সুইচ বোর্ডের সুইচ টিপে ঘর আলোকিত করে দিয়ে বলে ওঠে, 'সাবধান! নড়াচড়া নয় একচুলও!'

কিন্তু ঘুঘু লোক অনাহূত ব্যক্তি। তাছাড়া আগেই সে টের পেয়ে গিয়েছিল শহীদের চাতুরী। শহীদের কথা শেষ হবার সাথে সাথে পিছন ফিরেই শব্দ লক্ষ্য করে লাফ দেয় সে। এতোটা কল্পনা করেনি শহীদ। পলকের মধ্যে লোকটা শহীদের শরীরের উপরে এসে সজোরে ধাক্কা মারলো। প্রথম ধাক্কাতেই হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলভারটা। দুজনেই পড়লো মেঝের উপর সশব্দে। শহীদ রিভলভারটা দেখতে পেলো হাতখানেক দূরে। শুয়ে শুয়েই হাত বাড়ালো সে। কিন্তু পলকের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক শহীদের তলপেট বরাবর প্রচণ্ড একটা

লাথি চালিয়ে দিলো লোকটা। রিভলভারটা আর তোলা হলো না। সর্বশরীর কুঁচকে দু'হাত দিয়ে ঠেকালো শহীদ লাথিটা। ঠেকালো তো বটেই, ধরেও ফেললো লোকটার ডান পা-টা। ধরে মোচড় দিতেই ককিয়ে উঠে পড়ে গেল লোকটা মেঝেতে। চট করে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। কিন্তু রিভলভারটা এখন দুজনেরই আওতার বাইরে। লোকটাও উঠে দাঁড়ালো একই সঙ্গে। দুই শক্তিশালী যোদ্ধা হাঁপাতে হাঁপাতে তাকালো পরস্পরের দিকে। লোকটার চোখ দুটো যেন আগুনের দুটো টুকরো। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না শহীদ সেদিকে। একপা এগোলো। সতর্ক হয়ে গেছে সে। শত্রু বিদ্যুতের মতোই দ্রুতগতি। একটু সুযোগ দিলেই বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

একপা পিছিয়ে গেল লোকটা। আরও একপা এগোলো শহীদ। এবারও এক পা পিছিয়ে যাবার জন্যে বাম পা-টা পিছন দিকে নিয়ে গেল লোকটা। কিন্তু শহীদকে ধোঁকা দিয়ে ডান পায়ের উপর ভর দিয়েই ঝাঁপ দিলো লোকটা। অত্যন্ত অল্প সময় পেলো শহীদ। কিন্তু তবু তৈরি হয়েই ছিলো সে। লোকটার ঘুসি শহীদের নাকে এসে লাগার আগেই মাথা সরিয়ে নিলো শহীদ। সেই সাথে কানের ঠিক নিচেই কষলো সে একটা কারাতের কোপ। এর ফলে লোকটি মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো, শুধু তাই নয় ছিটকে গিয়ে জোরে ধাক্কা খেলো দেয়ালের সাথে। রিভলভারটার জন্যে মেঝের দিকে তাকালো শহীদ। কিন্তু দেখতে পেলো না সেটা। শহীদের অজ্ঞাতে রিভলভারটা ধাক্কা খেয়ে খাটের নিচে গিয়ে ঢুকেছে। মেঝেতে রিভলভার না পেয়ে লোকটার দিকে এগোলো শহীদ। কিন্তু লোকটাও বুঝতে পেরেছে শহীদের ক্ষমতা। খোলা জানালার সামনে গিয়েই পড়েছিল সে। হাঁটু ভাজ করে জানালা গলে পালাবার জন্যে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু একটা হাতি এসে দাঁড়িয়ে আছে ইতিমধ্যে জানালার অপর দিকে—গফুর!

গফুরকে দেখেও কিন্তু লোকটা শহীদের দিকে ফিরলো না। এদিকে শহীদ লোকটার পিছনে গিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে গিয়েই মার খেলো। লোকটা শহীদকে ধোঁকা দেবার জন্যেই পিছন ফিরে অপেক্ষা করছিল। সময় আন্দাজ করে সজোরে পিছন দিকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো সে। পেটে লাগলো শহীদের গুঁতোটা। ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখের রঙ। শরীরের সব রক্ত যেন উপর দিকে উঠে এসেছে হঠাৎ। চোখমুখ কুঁচকে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। কিন্তু পরমুহূর্তেই লোকটা শহীদকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মেঝের উপর। তারপর সাঁড়াশির মতো দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরলো শহীদের গলা।

সর্বশক্তি দিয়ে চেপে বসছে লোকটার হাত দুটো শহীদের গলার উপর। নড়াচড়া করার উপায় নেই তার। শরীরের উপরে ছিনে জোঁকের মতো লেপটে আছে লোকটা। অতি কষ্টে হাত দুটো মুক্ত করলো শহীদ। হাত দুটো ব্যবহারের উপরই নির্ভর করছে জয়-পরাজয়। না, ঘুসি চালালো না শহীদ। হাত দুটো নিলো

সে নিজের গলার কাছেই। লোকটার হাতের উপর হাত রেখে টের পেতে চাইলো সে দু'হাতের কড়ে আঙুল দুটোর অবস্থান। কিন্তু এদিকে শ্বাস বন্ধ হতে চলেছে তার। দুর্বল হয়ে পড়েছে ভয়ানক ভাবে।

অতি কষ্টে লোকটার কড়ে আঙুল দুটোর তলায় নিজের বুড়ো আঙুল ঢোকালো শহীদ। তারপরই চোখ বন্ধ করে, শক্তি সঞ্চয় করলো। শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে লোকটার কড়ে আঙুল দুটোয় ইলেকট্রিক শক মারলো সে। আসলে আঙুল দুটো ভেঙে ফেলার জন্যে আচমকা ধাক্কা মারলো। ফলটা কি হবে জানতো শহীদ। হলোও তাই। 'বাবারে' বলে চিৎকার করে উঠে শহীদকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে পড়লো লোকটা। দুটো হাতের কড়ে আঙুল একই সঙ্গে মট্ করে ভেঙে গেছে বেচারার।

এক লাফে উঠে দাঁড়ালো শহীদ ছাড়া পেয়েই। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শ্বাস ফেলার সময়টুকুও তর সইলো না তার। প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালালো সে লোকটার নাক বরাবর। অবশ্য এর জন্যে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার উপর ডাইভ দিয়ে পড়তে হলো তাকে।

লোকটাকে এই ঘুসি না মারলেও চলতো শহীদের। এমনিতেই ভাঙা আঙুল দুটোর ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু ঘুসিটা মারলো সে এতো যোগাড় যন্ত্র করে শুধুই রাগের বশবর্তী হয়ে। উপরি পাওনা!

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালো শহীদ। জানালার দিকে হাত উঁচিয়ে ধরে গফুরের উদ্দেশ্যে বললো সে, 'দড়ি!'

মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরালো না শহীদ ধরাশায়ী লোকটির দিক থেকে। পাশ ফিরে পড়ে আছে প্রকাণ্ড শরীরটা। কাতরাচ্ছে। তা হলেও এ শত্রুকে বিশ্বাস নেই। গফুর মোটা একগাছি দড়ি ছুঁড়ে দিলো জানালা দিয়ে। দড়িটা তুলে নিয়ে লোকটাকে বেঁধে ফেললো শহীদ। বাঁধা শেষ হতে শহীদ দেখলো গালে একরাশ হাসি মেখে গফুর ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে জানালা দিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো শহীদ, 'চেয়ারের ওপর উঠিয়ে বসা ব্যাটাকে।'

দশাসই এবং ব্যায়ামবীর গফুরও অনেক চেষ্টা করার পর লোকটাকে চেয়ারে বসাতে পারলো পাঁজাকোলা করে ধরে। পিটপিট করে তাকালো লোকটা এবার শহীদের দিকে। লোকটার সহ্যক্ষমতা দেখে অবাকই হলো শহীদ। আঙুলের ব্যথার কথা ভুলে দিব্যি তাকিয়ে রয়েছে।

'কে তুমি? কেন মারতে চেয়েছিলে আমাকে? কার হুকুমে?' কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে শহীদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। চোখ বন্ধ করে ফেলে লোকটা। কথা বলে না।

'উত্তর দিচ্ছো না যে!' ধমক মেরে ওঠে শহীদ।

লোকটা চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলে। ব্যঙ্গ করে শহীদ বলে ওঠে,

'দোয়াদরুদ পড়ছো বুঝি? কিন্তু সেজন্যে সময় দেয়া হবে তোমাকে। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'জানি না। উত্তর জানা নেই!'

'তাই নাকি। উত্তর জানা নেই?' রেগে ওঠে শহীদ লোকটার সাহস দেখে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। আলমারির একটা কৌটা থেকে সুঁই বের করে নিয়ে আসে সে। তারপর লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমাকে ইচ্ছে করেই ঘরে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছিলাম সে কথা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো, কেমন? কেন বলো তো? তোমাকে কথা বলাবার জন্যে। আমি জানতে চাই কে তোমাকে পাঠিয়েছে এখানে। সুতরাং যেভাবেই হোক, কথা তোমাকে আমি বলাবই।

'কথা তোমাকে বলাবই!' মুখ ভেংচে ওঠে লোকটা কুৎসিত মুখভঙ্গি করে।

গরম হয়ে ওঠে শহীদের মেজাজ। লোকটার বাঁধা একটা হাত ধরে মধ্যমা আঙুলটা বেছে নেয় সে। তারপর বলে, 'কথা তাহলে বলবে না, কেমন?'

উত্তর দেয় না লোকটা। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকে শহীদের দিকে। ছাড়া থাকলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করতো সে শহীদকে। ধীরে ধীরে সুঁইটা মধ্যমা আঙুলের নখের মধ্যে দিয়ে ঢোকাতে থাকে শহীদ। ঢোকাতে ঢোকাতেই বলে, 'খুব বেশি লাগলে বলবে, মিয়া, একটু আস্তে আস্তে করবো কাজটা। আর কথা বলার ইচ্ছে হলেও বলবে—বুঝলে?'

কিন্তু শহীদ ভুল বুঝেছিল লোকটাকে! সে ভুল তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙলো। একটি একটি করে তিনটে আঙুলে সুঁই ফোটাবার পরও টুঁ-শব্দটি করলো না লোকটা। শুধু অসহনীয় যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো দেহটা। শহীদ বুঝলো এতে কাজ হবে না। কিন্তু এতো সহজে হাল ছেড়ে দিতেও রাজি নয় সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস শান্তিনীড়ের হত্যা এবং নিখোঁজ রহস্যের সঙ্গে এ লোকটার কোনো না কোনো যোগ আছে। এখন যোগটা কি তা তাকে জানতেই হবে যেমন করে হাক। মারের চোটে ভূতও কাবু হয়। আর এ তো মানুষ। তবে এর বেলায় একটু কড়া ডোজ দরকার।

নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসলো শহীদ। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে কয়েক টান দিলো চিন্তিতভাবে। লোকটা মুখ বাঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে, মাথা নুইয়ে বসে আছে মরার মতো। তার দিকে তাকিয়ে আবার চেয়ার থেকে উঠে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো শহীদ। বললো, 'এবার আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তোমার একটি চোখে এই জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরবো। এখন বলো কোনটা পছন্দ তোমার?'

'বলো কি জানতে চাও।' অতি কষ্টে উচ্চারণ করলো লোকটা মাথা তুলে।

শহীদ আশ্বস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'কে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে?'

'শয়তান!' লোকটা গোঁয়ারের মতো উত্তর দিলো।

তা সত্ত্বেও আবার জিজ্ঞেস করলো শহীদ, 'তুমি কে?'

'শয়তানের চেলা!'

লোকটার দুঃসাহস দেখে রীতিমত দমে গেল শহীদ। কিন্তু সেই সঙ্গে রাগও হলো তার প্রচণ্ড। জ্বলন্ত সিগারেটটা দু'আঙুলে ধরে লোকটার ডান চোখের দিকে হাত বাড়ালো সে।

'পানি!'

হাতটা ফিরিয়ে নিলো শহীদ। গফুর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এককোণে। শহীদ তাকে পানি আনতে বলে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো। আধমিনিটের মধ্যে একগ্লাস পানি এনে গফুর লোকটার মুখে ঢেলে দিতে তৈরি হলো। লোকটা পানি খাবার আগের মুহূর্তে শহীদের দিকে তাকিয়ে একটু করুণ হাসি হাসলো। লক্ষ্য করলো শহীদ, লোকটার এই অদ্ভুত ব্যবহার। পরক্ষণেই একটা শব্দ হলো কট্ করে। শব্দটা লোকটার মুখের ভিতর থেকেই উঠলো। একলাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গফুরের হাত থেকে পানির গ্লাসটা কেড়ে নিলো শহীদ। কিন্তু ততক্ষণ যা ঘটার ঘটে গেছে। গফুর ইতিমধ্যেই খানিকটা পানি ঢেলে দিয়েছে লোকটার মুখের ভিতর। লোকটাকে দু'বার ঢোক গিলতে দেখেই তাড়াতাড়ি তার মুখটা এক হাতে কষে ধরে অপর হাতের দুটি আঙুল মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো শহীদ। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। আগেই গিলে ফেলেছে দুঃসাহসী লোকটা বিষভর্তি কৃত্রিম দাঁতটা মাড়ি থেকে জিভের সাহায্যে খসিয়ে!

'কথা তোমাকে আমি বলাবই!' বাঁকা হাসি ফুটিয়ে আবার ব্যঙ্গ করলো লোকটি শহীদকে। তারপর বললো, 'দু'মিনিটের মধ্যে আমি চলে যাচ্ছি, আমার মুখ থেকে কথা শুনতে হলে তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

এবার আর রাগ হলো না শহীদের। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সাথে রাগ করা যায় না। ইতিমধ্যেই নুয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকটা। বিষক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। শহীদ বুঝতে পারলো ডাক্তার ডেকে লাভ নেই কোনো। বাঁচানো যাবে না একে। এবং দু'মিনিট নয়, মাত্র আধমিনিটের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো লোকটা। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ। একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলো সে। লোকটাকে যে বা যারা পাঠিয়েছিল তারা ভয়ানক জবরদস্ত গ্যাং। তথ্য না প্রকাশ করার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়া বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু আসলে কে এই লোকটা? কে বা কারা একে পাঠিয়েছিল?

সাময়িকভাবে ভাবনা-চিন্তা স্থগিত রেখে টেলিফোন তুলে মি. সিম্পসনকে এখুনি চলে আসতে অনুরোধ করলো শহীদ। তারপর ঘরে গফুরকে রেখে বের হয়ে এলো সে বাইরে। বারান্দায় অপেক্ষা করছিল মহুয়া। শহীদকে দেখে এগিয়ে এলো সে উৎকণ্ঠিতভাবে। বললো, 'খবর কি?'

'ভালো নয়, লোকটা আত্মহত্যা করেছে। তুমি ঘরে যাও। সারওয়ারের ঘরে তার মাস্টার সাহেব বসে আছেন। কয়েকটা কথা সেরে নিই আমি।'

মহুয়ার উদ্দেশ্যে কথাকটি বলে সারওয়ারের ঘরের দিকে এগোলো শহীদ। সারওয়ারের ঘরের দরজা খুলে একটু অবাক হলো সে। যাই হোক, ঘরে ঢুকেই শহীদ দেখলো চিন্তিত মুখে খাটের উপর বসে আছে সারওয়ার। মাস্টার সাহেবকে দেখা যাচ্ছে না ঘরের কোথাও।

'তোমার মাস্টার সাহেব কোথায় গেলেন সারওয়ার?'

সারওয়ার বললো, 'কি জানি, ভাইয়া! আপনার ঘরে মারামারির শব্দ শুনে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। একটু পর পিছন ফিরে দেখি দরজা খোলা, ঘরে মাস্টার সাহেব নেই।'

কুয়াশা ১৭

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

এক

কি যেন ভেবে ঘড়ি দেখল শহীদ। রাত একটা। মনে মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিল শহীদের—কামালের কোনও বিপদ ঘটল নাকি? সাড়ে বারোটার সময় খবর নিয়ে আসার কথা ছিল কামালের। কোনও বিপদে পড়ে নিরুপায় না হলে সে এতক্ষণ দেরি করবে না।

সারওয়ারকে শুয়ে পড়তে বলে নিজের ঘরে ফিরে এল শহীদ। কাপড়চোপড় বদলে নিল তাড়াতাড়ি। গফুরকে ডেকে বলল, 'এখুনি মি. সিম্পসন আসবেন। তুই তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে লাশটা দেখাবি। বলবি, আমি জরুরী একটা কাজে বাইরে গেছি।'

গফুর সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। শহীদ আর সময় নষ্ট না করে বের হয়ে এল বাড়ি থেকে। কামাল তার গাড়িটা নিয়ে গেছে। ফলে ট্যাক্সি করেই পৌঁছুতে হবে তাকে শান্তিনীড়ে।

শান্তিনীড়ের কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল শহীদ। ভাড়া মিটিয়ে দিতে ড্রাইভার চলে গেল গাড়ি নিয়ে। তারপর হাঁটা শুরু করল শান্তিনীড়ের গেটের দিকে। কামালের কোনও না কোনও বিপদ ঘটেছে, এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ধারণা হয়েছে শহীদের। তা না হলে ওর দেরি হবার কথা নয়। ঠিক সাড়ে বারোটায় খবর দিয়ে আসত সে শহীদের বাড়িতে। অন্তত কোথাও থেকে একটা টেলিফোনও করত সে। শান্তিনীড়ের ভিতর কামাল ঢুকতে পেরেছিল কিনা জানা নেই শহীদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ির ভিতরটা চুপিচুপি একবার জরিপ করে নেবে সে, ঠিক করল।

গেটের দিকে এগোতে এগোতে কি যেন ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। গেট টপকে ভিতরে ঢোকার চেয়ে পাঁচিল টপকে ঢোকাই ভাল বলে মনে হল তার। শান্তিনীড়ের দেয়াল খুব বেশি উঁচু নয়। দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখে নিল শহীদ। চাঁদের আলো ফুটে রয়েছে যতদূর দৃষ্টি যায়। একটু দূরেই নির্জন রাস্তা পড়ে আছে। রাস্তার ওপাশে নিচু ধান খেত। না, আশপাশে কেউ নেই।

এক লাফে পাঁচিলের মাথা আঁকড়ে ধরল শহীদ। তারপর দেয়ালে পায়ের ভর দিয়ে উঠে পড়ল উপরে। বাগানের দিকে উঠেছে সে। চাঁদের আলোয় একটার পর

একটা অসংখ্য গাছ ছাড়া শহীদ আর কিছুই দেখতে পেল না। পাঁচিলের মাথা ধরে ঝুলে পড়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল বাগানের ভিতর। তারপর কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। কোথাও কোনও শব্দ হল না। বাঁ দিকে গেলেই সম্ভবত বাড়ির ঘরগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। সেদিকেই সতর্ক ভাবে পা পা করে হাঁটতে লাগল শহীদ।

কিন্তু দিক নির্ণয় করতে সামান্য একটু ভুল করেছিল শহীদ। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল সে। ফলে বাড়ির ঘরগুলোকে গাছের আড়ালে ফেলে রেখে গেটের দিকে এগোতে লাগল সে। অবশ্য একটু পরই ভুলটা বুঝতে পারল। সামনেই দুটো গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না শহীদ। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে যে, ফ্যামিলি সলিসিটর আহমেদ হোসেন বলেছিলেন, মি. নাসির প্রতিরাতে কোথায় যেন বের হয়ে যান। শহীদ ভাবল, গ্যারেজের সামনে যখন এসেই পড়েছি তখন দেখাই যাক, মি. নাসিরের গাড়ি আছে কি না? তাহলেই বোঝা যাবে মি. নাসির এখন বাড়িতে আছেন, না নেই।

বাড়িটাকে বাগানবাড়ি বললে ভুল হবে না। সামান্য খানিক দূরে নানা জাতের গাছ দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলো পড়ে কিম্ভূতকিমাকার সব ছায়া পড়েছে মাটিতে; কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে শহীদের। গাছের আড়ালে ওঁৎ পেতে নেই তো কেউ?

একটু সতর্ক হয়ে ওঠে শহীদ। ধীরে ধীরে এগোয় সে গ্যারেজের দিকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। কোথায় যেন একটা কুকুর কয়েকবার ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। তার মনে হল দূরে কোথাও কেউ যেন গম্ভীর গলায় কাউকে ধমক মারছে। গলাটা অতি পরিচিত বলে মনে হয় ওর। কিন্তু ভাল করে শুনতেই পায় না সে শব্দটা। মনে মনে ভাবে, মনের ভুল হবে। তারপর আবার পা বাড়ায় গ্যারেজের দিকে। এবার সে বেশ একটু নিশ্চিন্ত মনে দ্রুত তালে পা ফেলে। কিন্তু…!

কিন্তু গ্যারেজের সামনে আর পৌঁছুতে পারে না শহীদ। একটা আতা গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল সে, অকস্মাৎ খসখস করে শব্দ উঠল গাছটার উপর থেকে। পলকের মধ্যে ডান হাতটা পকেটে ঢুকে গেল তার রিভলভার বের করার জন্যে। কিন্তু হাতটা বের করার আগেই ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল একজন লোক।

ডান হাতটা পকেটে থাকায় বাঁ হাতেই প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল সে। দু'জনেই মাটিতে ছিটকে পড়ল। ঘুসিটা শহীদ মারল মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই। কিন্তু ঠিকমত লাগল না। ততক্ষণে আক্রমণকারী লোকটিও সামলে নিয়েছে নিজেকে। মাটিতে কোমরের ভর দিয়ে হাতে ধরা মোটা লোহার শিকটা সজোরে শহীদের মাথা লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল সে। কিন্তু মাটিতে গড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে

নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল শহীদ। তারপরই একটা লাথি ঝাড়ল সে ডান পা দিয়ে। কোঁক করে একটা আর্তধ্বনি বের হল লোকটার গলা থেকে। হাত-পা মেলে দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লাথিটা লেগেছে লোকটার ঠিক পিঠের ওপর।

এক মুহূর্তে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রিভলভার বের করে লোকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল শহীদ।

'উঠে দাঁড়া, শয়তান!' গর্জে উঠল শহীদ।

লোকটা ব্যথায় মুখ কুঁচকে শহীদের দিকে তাকাল পাশ ফিরে। চমকে উঠল শহীদ অপ্রত্যাশিত ভাবে । এমনটি সে আশা করেনি। লোকটাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে কি একটা সন্দেহ বিদ্যুতের মত খেলে গেল তার মনে। শান্তিনীড়ের অশান্তির কারণ কি তবে এই ড্রাইভার শামসু মিয়া?

হ্যাঁ। আক্রমণকারীর মুখ দেখেই শহীদ চিনতে পারল লোকটাকে—ড্রাইভার শামসু মিয়া!

'তাহলে তুমি?' কঠিন কণ্ঠে বলল শহীদ।

কাঁপতে কাঁপতে ড্রাইভার শামসু মিয়া উঠে বসার চেষ্টা করল। হাতের মোটা লোহার শিকটা মাটিতে ফেলে দিয়েছে সে। কোনরকমে মাটির উপর বসে সে বলে উঠল করুণ মিনতি ভরে, 'স্যার, আপনাকে চিনতে পারিনি আমি!'

তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ভেসে এল এমন সময় বাড়ির ভিতর দিক থেকে। 'বাঁচাও! বাঁচাও! সাহেবকে···!'

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল শহীদ। মেয়েলী কণ্ঠস্বর! কে অমন করে চিৎকার করছে ওদিকে এত রাতে? কি বিপদ ঘটল আবার?

'এখানেই থাকবে তুমি! পালিয়ে গেলে রক্ষা নেই!'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটল শহীদ ভিতরের দিকে। ওদিকে ভয়ানক কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে নিশ্চয়। দেরি করলে হয়ত যা ঘটবার ঘটে যাবে। সুতরাং আপাতত ড্রাইভার শামসু মিয়াকে ছেড়ে দিয়ে শহীদ ছুটল সেদিকে। কাছাকাছি পৌঁছুতে মি. নাসিরের কণ্ঠ শুনতে পেল সে। আর ক'সেকেণ্ড পরই সে দেখতে পেল ওদেরকে। মি. নাসির কাকে যেন কড়া গলায় ধমক মেরে চুপ করাতে চাইছেন। মিসেস নাসিরও দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওদের মধ্যে। শহীদ রিভলভারটা পকেটে ভরে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'কে!' চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন মি. নাসির।

'শহীদ খান। কি ব্যাপার, মি. নাসির? কে অমন চিৎকার করছিল?'

মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে যায় মি. নাসিরের মুখাবয়ব। উত্তর দিতে পারেন না তিনি কয়েক সেকেণ্ড। সোনার মা সেখানেই দাঁড়িয়েছিল উত্তেজিত ভাবে। শহীদ তার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে। 'বাঁচাও বাঁচাও!' করে সে-ই চিৎকার

করে উঠেছিল।

'ও কিছু না, মি. শহীদ! সোনার মা খামোকা ভয় পেয়ে…'

'না!' সোনার মা ভীত কণ্ঠে আপত্তি জানায়।

মি. নাসির বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে ধমক মারেন তাকে, 'তুমি চুপ কর দেখি!'

'ব্যাপারটা শুনতে চাই আমি, মি. নাসির। ওকে বলতে দিন।'

'কিন্তু…'

শহীদের কথা শুনে অপ্রতিভ কণ্ঠে আপত্তি জানাতে যান মি. নাসির। কিন্তু সোনার মা বলতে শুরু করে বড় বড় চোখ করে, 'আমি আমার ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম সাহেব, হঠাৎ একজন লোকের গরম গরম কথা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে মনে হল বড় সাহেবের ঘরে কে যেন জোরে জোরে কথা বলছে। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি—এই লম্বা চওড়া একজন মানুষ, তার মুখ থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা, হাতে আবার দেখি একটা ছোট বন্দুক, বড় সাহেবকে খুন করবে বলছে! আমি…আমি…তাই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠি!'

'মিথ্যে কথা! বুড়ি ভয় পেয়ে মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলছে! ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, মি. শহীদ।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল শহীদ মি. নাসিরের দিকে। হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন তিনি। শহীদও হঠাৎ চমকে উঠল। বাড়ির পিছন দিকে নদী। ওদিক থেকেই একটা স্পীড বোট স্টার্ট নেবার শব্দ আসছে।

রীতিমত তিরস্কারের দৃষ্টিতে মি. নাসিরের দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করেই ছুটল শহীদ কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে।

নদীতে পৌঁছুবার পথটা আগেই দেখে নিয়েছিল শহীদ প্রথমবার এ বাড়িতে এসে। চাঁদের আলোয় পথ চিনে নদীর কিনারায় পৌঁছতে দেরি হল তার। স্পীড বোটটা তখন বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েও কোনও আরোহীর স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু কালো আলখেল্লা পরিহিত একটা দীর্ঘকায় মূর্তিকে স্পীড বোটের উপর নড়াচড়া করতে দেখল সে। কে ও? ভাবল শহীদ। কুয়াশা নয় তো? কিন্তু কুয়াশা কেন আসবে মি. নাসিরের কাছে?

শহীদ তখনও তাকিয়েছিল নদীর দিকে। স্পীড বোটটা তখন নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শুধু একটুকরো আলো দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। দেখতে দেখতে ক্ষুদ্র আলোর টুকরোটাও নদীর বাঁকে হারিয়ে গেল।

নদীর ধার থেকে ফিরতে ফিরতে শহীদের মনে প্রশ্ন জাগল, 'মি. নাসির অস্বীকার করলেন কেন সোনার মার কথা? সোনার মা তো ঠিকই দেখেছিল।'

শহীদ ফিরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার মি. নাসির বললেন, 'ও কিছু না, মি. শহীদ! সোনার মা ভুল দেখেছে, বুঝলেন?'

শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি কথাটা স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছেন। এরমধ্যে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। যাকগে, মাস্টারসাহেবকে দেখছি না যে? এত চেঁচামেচিতেও ঘুম ভাঙেনি ওনার?'

মিসেস নাসির বললেন, 'সত্যিই তো! এত হৈ হট্টগোলে ঘুম না ভাঙবার কথা নয়!'

'চলুন ওঁর ঘরে গিয়ে দেখা যাক,' শহীদ বলল।

মিসেস নাসির পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল শহীদকে। মি. নাসিরও কোনও কথা না বলে অনুসরণ করলেন ওদেরকে। শহীদের কথা শুনে একেবারে চুপসে গেছেন তিনি। সোনার মা মি. নাসিরের ধমক খেয়ে ফিরে গেছে নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। আবার উথলে উঠেছে বোধহয় কাওসার ও মন্টির দুঃখ।

মাস্টারসাহেবের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল, বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি আটকানো। ঘরে কেউ নেই। রীতিমত আশ্চর্য হলেন মি. এবং মিসেস নাসির। শহীদ মনে মনে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। গেল কোথায় মানুষটা? শহীদের বাড়ি থেকে ইতিমধ্যে ফিরে আসার কথা তাঁর। কিন্তু বাড়ি না ফিরে গেলেন কোথায়?

ওদেরকে মাস্টারসাহেব সম্পর্কে কোনও কথা জানতে না দিয়ে বিদায় নিল শহীদ। ফেরার সময় ড্রাইভার শামসু মিয়ার খোঁজে তার কোয়ার্টারে গেল সে। কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তাই ঘটেছে। ড্রাইভার শামসু মিয়া পালিয়েছে বাড়ি থেকে নিজের কাপড়চোপড় সঙ্গে নিয়ে।

দুই

পরদিন সকালে শহীদ মি. সিম্পসনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। কামালের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। এদিকে মাস্টারসাহেবও নিখোঁজ। গত রাতে মি. নাসিরের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা শুনে মি. সিম্পসন বললেন, 'কোনও রহস্য আছে এর মধ্যে। স্পীড বোটে করে যে এসেছিল সে যদি কুয়াশা হয় তবে কুয়াশার নিশ্চয় কোনও স্বার্থ আছে মি. নাসিরের কাছে।'

শহীদ বলল, 'আমারও তাই ধারণা। তবে লোকটা কুয়াশা কিনা বোঝা যাচ্ছে না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ইকরামুল্লা খানের সাথে মি. নাসিরের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। আর কুয়াশা ইকরামুল্লা খানের সন্ধান করে গেছে আমার কাছে। না, কেমন যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আমার কাছে। এদিকে মন্টির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কাওসারের হত্যাকারীকেও ধরা যাচ্ছে না। আবার মাস্টারসাহেব

নিখোঁজ।'

শহীদ বলল, 'ওসব কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। কাজ করতে হবে। আপনি এখুনি একজন ইনফর্মারকে পাঠিয়ে দিন শান্তিনীড়ের ওপর খেয়াল রাখার জন্যে। কিছুক্ষণ পরপরই খবর পাঠাবে সে। আর আজ রাতে আমরা বের হব। মি. নাসিরকে অনুসরণ করতে হবে।'

'কিন্তু তাতে কি কোনও ফল হবে?'

'সে কথা ভেবে বসে থাকলে চলবে না। আমার বিশ্বাস মি. নাসিরকে অনুসরণ করে অনেক তথ্য জোগাড় করতে পারব আমরা। রোজ রাত এগারোটার পর বের হন উনি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক বলেছ তুমি, শহীদ! লোকটা অত রাতে যায় কোথায়? জানা দরকার।'

এরপর আরও খানিকক্ষণ আলোচনা করে মি. সিম্পসনের অফিস-রুম থেকে বের হয়ে এল শহীদ। বাড়ি ফিরেই অনেক সমস্যা নেমে গেল তার মাথা থেকে। যেসব রহস্যের কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না, সেসব অনেকাংশে পরিষ্কার হয়ে গেল। কুয়াশা একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে শহীদের বাড়িতে। কুয়াশা লিখেছেঃ

প্রিয় শহীদ,

কয়েকটি জরুরী খবর দেবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখছি আমি। গতরাতে মাস্টারসাহেব শান্তিনীড় থেকে বের হবার পর তাকে শত্রুরা অনুসরণ করে। আর শত্রুকে অনুসরণ করি আমি। মাস্টারসাহেব নিরাপদেই তোমার বাড়িতে প্রবেশ করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই তিনি বের হয়ে আসেন। এবং তখন তাঁকে আক্রমণ করা হয়। আমি আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র করে শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু একটু দেরি হয়ে যাওয়াতে মাস্টারসাহেব গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। গতরাত থেকেই তাঁর জ্ঞান ফেরাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু এখনও সফল হইনি। তবে আশা আছে, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হব। আঘাত খুব গুরুতর, মাথার একটা অংশ মারাত্মক ভাবে লোহার রড দিয়ে জখম করা হয়েছে। মাস্টারসাহেবকে নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত আছি বলে আমি নিজে তোমার সাথে দেখা করতে পারলাম না।

এদিকে কামালকে কারা আহত করে বন্দী করে নিয়ে গেছে তা আমি জেনেছি। আঘাত গুরুতর নয় তার। এখন ভালই আছে। তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা আপাতত করছি না। আসলে তার সঙ্গে দেখা করে একটা কাজের ভার দিয়ে এসেছি। বন্দীদশা থেকেই সে যাতে কাজটা করতে পারে শত্রুদের মনে কোনও সন্দেহ সৃষ্টি না করে, তার ব্যবস্থা

করে এসেছি। তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না ওর জন্যে।

এবার আমার সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি, শহীদ। তোমরা সম্ভবত আমার রহস্যময় উপস্থিতিতে অবাক হয়ে পড়েছ। ঢাকায় এত তাড়াতাড়ি ফিরলাম কেন পেরু থেকে, কবে ফিরলাম সে কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছ না তোমরা। তাছাড়া কামাল ও গফুরকে হঠাৎ অমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে পেরু থেকে ঢাকায় ফেরত পাঠালাম কেন তাও অজানা রয়েছে তোমাদের।

আসলে সৈনিকে উঠে যখন আমরা টারাটাকা শহরের কাছে নোঙর করতে যাচ্ছি ঠিক তখনই একটা অশুভ সংবাদ পেলাম আমি মহাশূন্য থেকে। Dr. Kotze ···ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। তাঁর মহাশূন্যযানের কলকব্জা বিগড়ে গেছে বলে বার্তা পেলাম আমি। Dr. Kotze-এর রকেট চাঁদের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে। যন্ত্রপাতি কোনও কাজই করছে না, ফলে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পাল্লায় পড়ে একই ভাবে ঘুরছে যানটা। মাত্র মাস ছয়েকের খাদ্য আছে Dr. Kotze-এর রকেটে। মাস ছয়েকের মধ্যে রকেটটা ক্রমশ গতি হারাতে হারাতে একেবারে স্থির হয়ে যাবে শূন্যে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় আছে বলে ওটা পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে না, অন্য কোনও দিকেও এগোবে না। ওখানেই অনাদিকাল পর্যন্ত ঝুলে থাকবে। Dr. Kotze দুঃসংবাদটা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন, আমি যেন তাঁকে মাস ছয়েকের মধ্যে উদ্ধার করার চেষ্টা করি।

Dr. Kotze-এর অনুরোধ রক্ষা করব আমি। কিন্তু Dr. Kotze-কে উদ্ধার করতে হলে আমাকেও যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে মহাশূন্যে। তাছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

বুঝতে পারছ তো শহীদ মহাশূন্যে যাওয়ার মানেটা কি? কোটি কোটি টাকার দরকার মহাশূন্যে যেতে হলে। অথচ টাকা আমার কাছে যা আছে তাতে কুলোবে না। ফলে কামাল ও গফুরকে পেরু থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে আমি সোনার বস্তাগুলো সাজামোর নদী থেকে উদ্ধার করি। তারপর সোজা চলে আসি বার্মায়। চীরণ মন্দিরের গুপ্তধনের কথা জানা ছিল আমার। কিন্তু নকশাটা কোথায় আছে জানতাম না। বার্মায় এসে খবর পেলাম ঢাকা থেকে দুজন লোক এসে নকশাটা নিয়ে ঢাকাতেই ফিরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় চলে এসেছি আমি।

মোট কথা, চীরণ মন্দিরের সব গুপ্তধন আমার চাই। শুধু চীরণ মন্দিরের সম্পদেই হয়ত চাহিদা মিটবে না আমার। মহাশূন্যে যেতে হবে আমাকে, Dr. Kotze-কে উদ্ধার করতে হবে। তার জন্যে কোটি কোটি টাকার দরকার। আমি এখন টাকার সন্ধানে ফিরব পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে

ও-প্রান্ত অবদি।

এখন আর সময় নেই, শহীদ। মাস্টারসাহেবকে অক্সিজেন দিতে যেতে হচ্ছে আমাকে এখুনি। দরকার হলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। আর মাস্টারসাহেবের জ্ঞান ফিরে এলে খবর নিশ্চয়ই পাঠাব তোমার কাছে।

মহুয়াকে আমার প্রীতি দিও। আমার ভালবাসা নিও।

ইতি—কুয়াশা।

চিঠিটা পড়ে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে শহীদ কামাল এবং মাস্টারসাহেবের ব্যাপারে। এরপর আর বাইরে কোথাও বের হল না। রাত দশটায় এলেন মূর্তিমান বিষাদ মি. সিম্পসন। প্রথম খবরটাই তাঁর দুঃখজনক, 'শহীদ, শান্তিনীড়ে যে ইনফর্মারটিকে পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়েছিলাম তার কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না সন্ধে থেকে। খবর পেয়ে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও হদিশই নেই তার।'

চুপচাপ শুনল শহীদ মি. সিম্পসনের কথা। তারপর বলল, 'আশ্চর্য!'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আরও দুজনকে রেখে এসেছি, কিন্তু আমার সন্দেহ...'

শহীদ বলল, 'ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে কিছুই করে উঠতে পারছি না আমরা। তবে আজ রাতে একটা হদিস করা যাবে হয়ত। আর একটি কথা, আমি আমার বার্মীজ বন্ধুকে জরুরী তার পাঠিয়েছি। কাল সকাল নাগাদ উত্তর পেয়ে যাব বলে আশা করছি। আমার বিশ্বাস অন্তত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য বার্মা থেকে পাব আমরা।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কি রকম তথ্যের আশা করছ তুমি, শহীদ?'

শহীদ সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, মি. সিম্পসন, প্রাক্তন পুলিস অফিসার ইকরামুল্লা খান সম্পর্কে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের রেকর্ড আছে কোথাও?'

একটু ভেবে নিয়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'না, তেমন কিছু না। তবে গত বছর খানেকের মধ্যে যে-ক'টি সোনা চোরাচালানকারীকে ধরা হয়েছে, ধরার সময় কাছে পিঠে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেছে ইকরামুল্লা খানকে। কোইন্সিডেন্স বলেই মনে করা হয়েছে ব্যাপারটাকে। আমরা তেমন গুরুত্ব দেবার মত কিছু খুঁজে পাইনি।'

'ভুল করেছেন সম্ভবত,' চিন্তিত ভাবে বলল শহীদ।

মি. সিম্পসন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে?'

শহীদ বলল, 'আমার অনুমান বলছে, ইকরামুল্লা খান কোনও আন্তর্জাতিক দুষ্কার্যে জড়িত। যাকগে, আজ রাতে মি. নাসির যদি ইকরামুল্লার সঙ্গে দেখা করতে যায় তবে হয়ত তার সঙ্গে ইকরামুল্লার সম্পর্কটা ধারণার মধ্যে আসবে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মূল রহস্য কিন্তু এখনও অন্ধকারে রয়ে যাচ্ছে।'

শহীদ বলল, 'প্রচলিত একটি কথা আছে—অতি বাড় বেড় না ঝড়ে উড়ে

যাবে, অতি ছোট থেকো না ছাগলে মুড়ে খাবে। আমাদের শত্রুদের হয়েছে কি জানেন? তারা অতি বাড় বেড়ে গেছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সেটা কিরকম?'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'শত্রুরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এমন সব দুষ্কর্ম করে চলেছে একটার পর একটা যে, আমাদেরকে আর কষ্ট স্বীকার করে ওদেরকে ধরতে হবে না। ওরাই ধরা দেবে।'

শহীদের কথা বুঝতে পারেন না মি. সিম্পসন। কি যেন বলতে চান তিনি। কিন্তু শহীদ ঘড়ি দেখে বলে, 'আর তো সময় নেই, মি. সিম্পসন। মি. নাসিরের রোজকার নিশি ভ্রমণের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

রাত এগারোটা।

মি. নাসির খয়েরী রঙের ট্রপিক্যালের স্যুট পরে জুতোর মচ মচ শব্দ করে বের হলেন নিজের ঘর থেকে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গ্যারেজের দিকে পা চালালেন তিনি। মনে হয় এত রাতে বাড়ির কেউ জেগে নেই। কিন্তু মিসেস নাসির তাঁর ঘরে জেগে ছিলেন একা। তিনি খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর আবছা এবং অদৃশ্যমান মূর্তির দিকে। বাঁকা একটা ব্যঙ্গের হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মি. নাসির গাড়ি বের করে যতক্ষণ না স্টার্ট দিলেন ততক্ষণ কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খোলা জানালার সামনে।

মি. নাসির গাড়ি বের করে গেট পর্যন্ত চালিয়ে এলেন। গাড়ি থেকে নেমে লোহার গেটটা খুলে আবার গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন।

রাস্তায় পৌঁছে গাড়ির গতি চল্লিশে ওঠালেন তিনি। একমনে গাড়ি চালাতে চালাতে কি একটা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন মি. নাসির। হঠাৎ বাধা পড়ল তাঁর একাগ্র চিন্তায়, খুট করে একটা শব্দ হল যেন। চমকে উঠেই আবার শান্ত হলেন তিনি। ও কিছু না, গাড়িটা পুরানো হয়ে গেছে বলে খুট-খাট শব্দ প্রায়ই শোনা যায় আজকাল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর লুকিং গ্লাসে চোখ পড়তে একটু বিচলিত হলেন মি. নাসির। তাঁর পিছন পিছন একটা গাড়ি আসছে। গাড়িটা কি তাঁকেই অনুসরণ করছে? স্পীড মিটারের কাঁটার দিকে তাকালেন তিনি। চল্লিশ···গতি বাড়ালেন মি. নাসির। পঞ্চাশ। তুফানের মত ছুটল গাড়িটা নির্জন রাস্তা ধরে।

এদিকে সত্যিসত্যি মি. নাসিরের গাড়িকে অনুসরণ করে আসছিল একটি ক্রিমসন রঙের ফোক্সওয়াগেন। বলা বাহুল্য, শহীদের গাড়ি ওটা। মি. সিম্পসন এবং শহীদ বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছিল মি. নাসিরের গাড়িটাকে।

'গতি বাড়ালেন উনি। বুঝতে পেরেছেন আমাদের উদ্দেশ্য।' স্পীড মিটারের

কাঁটা পঞ্চাশে নিয়ে বলল শহীদ।

মি. সিম্পসন বসে আছেন শহীদের পাশে। ড্রাইভিং সিটে বসেছে শহীদ।

'কিন্তু, যাবেন কোথায়, পিছু ছাড়ব না আমরা।'

মি. সিম্পসনের উদ্দেশে শহীদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় চমকে উঠে চিৎকার করে উঠল সে, 'একি!'

মি. সিম্পসনও লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। মি. নাসিরের গাড়ি অকস্মাৎ মাতালের মত একবার রাস্তার ডান দিকে আর একবার বাম দিকে কাত হয়ে পড়ে যেতে চাইছে।

'ব্যাপার কি শহীদ!'

শহীদ গাড়ির স্পীড বাড়াতে বাড়াতে বলল। 'ঐ গাড়ির ব্যাক সিটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। একটা লোক মি. নাসিরের গলা টিপে ধরেছে।'

ঠিক তাই! গাড়ির পিছনে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল লোকটা। মি. নাসির টের পাননি ব্যাপারটা।

রাস্তার দু'পাশে নিচু ধান খেত। সামনের গাড়িটা সামান্যের জন্যে বেঁচে যাচ্ছে বারবার ঢালু জায়গাটায় গড়িয়ে পড়া থেকে। শহীদের গাড়ি অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে সামনের গাড়িটার। আততায়ী সামনের সিটের উপর ঝুঁকে পড়ে সজোরে টিপে ধরেছে মি. নাসিরের গলা। দু'দিক সামলাতে হচ্ছে মি. নাসিরকে। একহাতে নিজের গলা ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। অপর হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়িটাকে রাস্তার পাশের জলায় পড়া থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন।

শহীদ এবং মি. সিম্পসন আততায়ীর পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয়। মুখটা যদিও দেখা যাচ্ছে না। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছে শহীদ সামনের গাড়িটার পাশে গিয়ে পৌছুবার জন্যে। কিন্তু প্রতিবারই বাধা আসছে। সাইড পাওয়া যাচ্ছে না কোনও মতে। সামনের গাড়িটার মাতলামো বেড়েই চলেছে ক্রমশ। ডান পাশ ফাঁকা দেখে এগোতে চেষ্টা করলেই সামনের গাড়িটা বাম পাশ ছেড়ে ডান পাশে এসে পড়ে। পলকের মধ্যে ব্রেকে চাপ দিয়েই পা সরিয়ে নেয় শহীদ। আবার পূর্ণ বেগে ছোটে গাড়ি। আবার চেষ্টা করে সে পাশাপাশি পৌছুতে।

কিন্তু এরকম বেশিক্ষণ চলল না। মি. সিম্পসন পকেট থেকে রিভলভার বের করে শহীদকে বলল, 'টায়ার ফুটো করে দিলে কোনও ফল হবে?'

শহীদ উত্তর দিল না। দু'সেকেণ্ড পরেই ব্রেক কষল সে হঠাৎ। তীব্র একটা ঝাঁকানি দিয়ে রাস্তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই মি. সিম্পসন লাফিয়ে পড়লেন গাড়ি থেকে। মি. নাসিরের গাড়ি নিচু ধান খেতে গড়িয়ে পড়ে গেছে।

স্টার্ট বন্ধ করেই দরজা খুলে নেমে পড়ল শহীদ। মি. সিম্পসন ততক্ষণে নামতে শুরু করেছেন নিচু ধান খেতে। ছুটল শহীদ।

তীব্র বেগে নামতে নামতেই শহীদ চাঁদের আলোর মধ্যে দেখতে পেল গাড়িটা। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে কাত হয়ে গেছে পানির মধ্যে। কম পানি, ডোবেনি তাই। স্টার্টও বন্ধ হয়নি।

মি. নাসির ছিটকে পড়ে গেছেন ধান খেতে। শহীদ যখন পৌঁছুল তখন মি. সিম্পসন তাঁকে তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন।

'তুমি দেখো এনাকে। লোকটা কোন্‌দিকে ছুটেছে দেখেছি আমি!' মি. সিম্পসন শহীদের উদ্দেশ্যে কথাটা বলেই ধান খেতের ভিতর ঢুকে দৌড়ুতে শুরু করলেন।

'কোথায় লেগেছে আপনার? মি. নাসিরকে ধরে ফেলে প্রশ্ন করল শহীদ। ব্যথায় মুখ কুঁচকে রয়েছে মি. নাসিরের। ধান খেতে এখন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পানি জমে আছে। ভিজে গেছেন মি. নাসির। কাপড়চোপড় কাদায় একাকার। মুখের কাদা সাফ করতে করতে রুমালের আড়াল থেকে বললেন, 'পায়ে ব্যথা হচ্ছে শুধু, মচকে গেছে দারুণভাবে।'

'আর কোথাও?' শহীদ জিজ্ঞেস করল।

মি. নাসির খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা পিছিয়ে এসে শুকনো ঘাসের উপর এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না।'

এমন সময় ফিরে এলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'না, ধরা গেল না লোকটাকে। একটুও ব্যথা পায়নি, দৌড়ে কোন্‌দিকে পালিয়েছে কে জানে।'

'লোকটা কে, মি. নাসির? নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন?'

একমুহূর্ত উত্তর দিলেন না মি. নাসির। তারপর বললেন, 'আমি এর কিছুই বুঝে উঠতেম পারছি না, মি. শহীদ। জানি না কে এভাবে আমাকে হত্যা করতে চায়।'

শহীদ বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মি. নাসিরের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি লোকটাকে চিনতে পারেননি বলছেন?'

'কি করে চিনব, লোকটার মুখ তো আর আমি দেখতে পাইনি।'

শহীদ বলল, 'মিথ্যে কথা বলছেন, মি. নাসির। লোকটাকে আপনি ঠিকই চিনতে পেরেছেন। কিন্তু কোনও কারণবশত না চেনার ভান করছেন।'

'কিন্তু···বিশ্বাস করুন, মি. শহীদ···'

শহীদ মি. নাসিরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমরা জানি না, মি. নাসির, আপনি কোন্ স্বার্থে আমাদের সঙ্গে বারবার অসহযোগিতা করে চলেছেন। এর ফল কি হবে জানেন? আপনিই বিপদে পড়বেন এর ফলে। তাছাড়া মন্টিকে খুঁজে বের করতে শুধু শুধু দেরি হয়ে যাবে। কাওসারের নিষ্ঠুর হত্যার মীমাংসা চান না আপনি?'

'চাই।' অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন মি. নাসির।

শহীদ বলল, 'কিন্তু আপনি যদি সব কথা খুলে না বলেন তাহলে কাওসারের হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আমাদের পক্ষে। বলা যায় না, দেরি হয়ে গেলে হত্যাকারী হাতের নাগালের বাইরেও পালিয়ে যেতে পারে।'

মি. নাসির চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। শহীদ প্রশ্ন করে হঠাৎ, 'ড্রাইভার শামসু কেমন লোক বলে মনে করেন, মি. নাসির?'

তাড়াতাড়ি উত্তর দেন মি. নাসির, 'কেন, বেশ ভাল লোক বলেই তো জানি।'

'ভাল লোক হলে গাড়িতে লুকিয়ে বসে থেকে সুযোগ মত আপনার গলা টিপে ধরে হত্যা করতে চায় কেন সে?'

চমকে উঠে বোকার মত তাকিয়ে থাকেন মি. নাসির শহীদের দিকে। শহীদ বলল, 'কি, চুপ করে রইলেন কেন?'

মি. নাসির চোখ নামিয়ে নিয়ে শেষ কথা বললেন, 'আমি জানি না।'

'জানেন! আমি জানি আপনি জানেন কেন লোকটা আপনাকে খুন করতে চায়। কিন্তু কারণটা প্রকাশ করতে চান না আপনি যে কোনও কারণেই হোক! তাই না?'

উত্তর দেন না মি. নাসির। শহীদ বলল, 'ঠিক আছে, কারণটা চেষ্টা করে আমরাই বের করে নেব, মি. নাসির। মনে রাখবেন অপরাধ কখনও চাপা পড়ে থাকে না।'

'অপরাধ! আমি কি অপরাধ করেছি, মি. শহীদ?'

'সেটা আপনি আমার চেয়েও বেশি ভাল করে জানেন।'

শহীদের কথার উত্তরে আর কথা বলতে ভরসা পান না মি. নাসির। শহীদও আর কিছু না বলে হাঁটতে থাকে। মি. সিম্পসন শুধু বললেন, 'কাল সকালে গাড়িটা এখান থেকে ওঠাবার ব্যবস্থা করবেন, মি. নাসির। চলুন, আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিই।'

গাড়িতে উঠে বসে শহীদ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মি. নাসির ওদের গাড়িতে এসে ওঠেন। সবশেষে ওঠেন মি. সিম্পসন। স্টার্ট দিয়ে শহীদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'এত রাতে কোথায় যাচ্ছিলেন, মি. নাসির।'

কোনও উত্তর দেন না মি. নাসির। শহীদ বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি আছে আপনার, না?'

এরপর আর কোনও কথাবার্তা হয় না ওদের তিনজনের মধ্যে। শান্তিনীড়ের গেটের কাছে গাড়ি থামাতে বিদায় নিয়ে নেমে পড়েন মি. নাসির। শহীদ তার উদ্দেশ্যে বলল, 'ভাল মনে করলে মি. সিম্পসনকে কিংবা আমাকে যে কোনও সময় আপনার কথা শোনাবার জন্যে আসতে পারেন আপনি। তাতে রহস্যটার মীমাংসা হতে পারে। যদিও আমি জানি আপনি কোনও কথাই বলবেন না।'

কথাটা বলে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই গাড়ি ছেড়ে দেয় শহীদ। মি. নাসির পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন গাড়িটার অপসৃয়মান লাল দু'টুকরো আলোর দিকে তাকিয়ে। সর্বশরীর তাঁর যেন পাথর হয়ে জমে গেছে। শুধু মাথার ভিতর হাজার হাজার দুশ্চিন্তার সাপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। 'মনে রাখবেন, অপরাধ কখনও চাপা থাকে না।' —শহীদ খানের হুঁশিয়ারি বাণীটা মন থেকে কোনও মতে সরাতে পারেন না তিনি। কি একটা দারুণ আশঙ্কায় সর্বশরীর অবশ হয়ে আসতে চায় যেন তাঁর।

শহীদ এবং মি. সিম্পসন অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের আড়ালে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাবেন মি. নাসির। তারপর বাড়িতে প্রবেশ করে গ্যারেজের দিকে হাঁটতে থাকেন।

মিসেস নাসিরের গাড়িটা বের করে স্টার্ট দেন মি. নাসির। হুশ করে বেরিয়ে যায় গাড়িটা বাড়ি থেকে।

মি. নাসির গাংচিল বারে গিয়ে গাড়ি থামান। রাত তখন সাড়ে বারোটা বাজে। বারের মেন গেটে দারোয়ান মি. নাসিরকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই চটপট সাহেবী কায়দায় স্যালুট মারে।

'খান আছে তো?'

'জ্বি, হুজুর। আছেন।'

গেট পেরিয়ে ভিতর দিকে এগিয়ে যান মি. নাসির। ঠিক তখনি বাইরে একটি ভেসপা এসে দাঁড়ায়। আরোহী গাড়িটাকে রাস্তার পাশে রেখে বারের মেইন গেটের দিকে এগিয়ে যায়। দারোয়ানের চোখজোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ভেসপার আরোহীকে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি একটা স্যালুট ঠুকে দেয় যন্ত্রচালিতের মত। কিন্তু দীর্ঘাকায় আগন্তুক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যায় গাংচিল হোটেল অ্যাণ্ড বারের ভিতর দিকে।

দীর্ঘকায় আগন্তুক হোটেলের ভিতর ঢোকার আধমিনিট পর গেটের দারোয়ান গেট ছেড়ে দ্রুতপায়ে ভিতর দিকে এসে থমকে দাঁড়াল। সুরকি বিছানো চওড়া পথটা পেরিয়ে গার্ডেনের দু'পাশে রাস্তার মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল সে। চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে কি যেন ভাবল। তারপর আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি মনে করে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। তার দুশ্চিন্তার কারণ হল—সে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সেখান থেকে হলঘরে প্রবেশ করার দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায় এবং যে অপরিচিত আগন্তুকটি কিছুক্ষণ আগে হোটেলে প্রবেশ করেছে তাকে সে হলঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখতে পেল না। কিন্তু শেষ অবদি সে ভাবল, লোকটা হল ঘরে ঢুকেছে ঠিকই, সে দেখতে ভুল করেছে।

এদিকে দীর্ঘকায় আগন্তুক হোটেলের বাগানে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছিল মি.

নাসির কোন্ কেবিনটায় ঢুকলেন। তারপর দক্ষিণ দিকের সরু রাস্তা ধরে বিশেষ একটি কেবিনের ব্যালকনিতে কষ্টেসৃষ্টে উঠে পড়ল। সেখান থেকে খোলা দরজা দিয়ে করিডরটা উঁকি মেরে দেখে নিল। ফাঁকা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পানির কলের ওপর উঠে দাঁড়াল সে। চোখের নাগালের মধ্যে এসে গেল বাথরুমের ভেন্টিলেটারটা। আগন্তুক ভেন্টিলেটারের ফোকরে চোখ লাগিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল পাশের ঘরটিতে মি. নাসির ও গার্থচিল হোটেল এবং বারের প্রোপাইটার এক হাত-ওয়ালা ইকরামুল্লা চিন্তিতভাবে কথা বলে চলেছে। আগন্তুক মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা। বেশ স্পষ্টই শুনতে পেল সে কথাবার্তা। মি. নাসির বললেন ইকরামুল্লা খানকে, 'কিন্তু লকেটটা আমাদের কাছেই আছে সে-কথা জানল কি ভাবে লোকটা?'

এক মুহূর্ত ভেবে ইকরামুল্লা খান উত্তর দিল, 'লোকটা মানে কে জান? কুয়াশা!'

'কুয়াশা!' চমকে উঠলেন মি. নাসির।

আগন্তুক মি. নাসিরের চমকে ওঠা দেখে মৃদু একটু হাসল। মি. নাসির চিন্তিত ইকরামুল্লা খানের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তাহলে উপায়? কুয়াশা তো হেলাফেলার লোক নয়, সে করতে পারে না এমন কাজ নেই দুনিয়ায়।'

কুটিল একটুকরো হাসি ফুটল ইকরামুল্লা খানের মুখে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কিন্তু বাছাধন ঘুঘু দেখেছে, ঘুঘুর ফাঁদ দেখেনি। হাজার চেষ্টা করলেও সে লকেট আদায় করতে পারবে না আমাদের হাত থেকে।'

'কি করে?'

ইকরামুল্লা খান বলল, 'খুব সহজ ভাবেই। লকেটটা কোথায় আছে তা শুধু তুমি আর আমি জানি। আমরা যদি প্রাণ গেলেও সেকথা প্রকাশ না করি তাহলেই হবে। প্রতিজ্ঞা কর নাসির যে, প্রাণ গেলেও তুমি কারও কাছে বলবে না লকেটটা বক্সনগরের কোন্ গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখা আছে।'

মি. নাসির গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, প্রাণ গেলেও লকেট কোথায় আছে সে কথা কাউকে বলব না।'

'আমিও প্রতিজ্ঞা করছি!'

ইকরামুল্লা খানের কথা শেষ হতেই মি. নাসির বলে ওঠেন, এদিকে আর এক নতুন বিপদ এসে পড়েছে—ড্রাইভার শামসু জেনে ফেলেছে সেই ব্যাপারটা। সে আজকে মেরেই ফেলত আমাকে। গাড়ির পিছনে কখন কে জানে লুকিয়ে ছিল। কিছুদূর আসার পরই পিছন থেকে গলা টিপে ধরেছিল। ভাগ্য ভাল বলে ধান খেতে পড়ে গিয়ে এ যাত্রা বেঁচে গেছে প্রাণটা।

'শালাকে ধরে ফেলেছ তো?' প্রশ্ন করল ইকরামুল্লা খান।

মি. নাসির বলেন, 'ধরব কি করে, পা'টা মচকে গেছে যে। আবার মরার উপর

খাঁড়ার ঘা—পুলিস আর শখের গোয়েন্দা শহীদ খান ঠিক সময় মত এসে হাজির। আগেই টের পেয়েছিলাম পিছন পিছন আসছে···।'

'টিকটিকিটাকে সুযোগ পেলেই জাহান্নামের দরজা চিনিয়ে দেব আমি! বড় বাড় বেড়ে গেছে ব্যাটা! আমার দু'জন লোককে সে গাপ্ করে দিয়েছে!'

মি. নাসির বলেন, 'কিন্তু তার ওপর তুমি এত চটা কেন, ইকরামুল্লা?'

চমকে উঠে তাকায় ইকরামুল্লা মি. নাসিরের দিকে। ধূর্ত একটুকরো হাসি খেলে যায় তার ঠোঁটে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মি. নাসির তার বন্ধুর দিকে। ইকরামুল্লা বলল, 'বিজনেসের পার্টনার তো তুমি শুধু নামেই, যত ঝক্কিঝামেলা সবই তো আমাকে পোহাতে হয়। তুমি কি করে জানবে টিকটিকিটার ওপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখতে কেন আমি বাধ্য হয়েছি।'

মি. নাসির বললেন, 'তার মানে আমাদের ব্যবসার কথা আঁচ করে ফেলেছে নাকি কিছুটা?'

'সোনার কারবার ছেড়ে দিতে হবে, হে নাসির। শুধু আঁচ করেনি, সব জেনে ফেলেছে।'

'তবে! তবে কি হবে?'

মি. নাসিরকে অকারণে উদ্বিগ্ন করে তুলে আনন্দ পায় ইকরামুল্লা। হাসে সে। বলে, 'ভেব না তুমি, ব্যবসা ঠিক খাড়া রাখব আমি। তা না হলে খাব কি? আসলে একটু সতর্ক থাকতে হবে আর কি।'

ইকরামুল্লার আশ্বাসবাণী শুনে কিছুটা শান্ত হন মি. নাসির। হঠাৎ ইকরামুল্লা চোখ দুটো কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার ভাইপোদের হত্যা আর নিখোঁজ সম্পর্কে পুলিস এবং টিকটিকির ধারণা কি বল তো?'

'তারা তো আমাকেই সন্দেহ করছে,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন মি. নাসির।

হঠাৎ ঘরের ছাদ ফাটিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে ইকরামুল্লা খান। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মি. নাসির ইকরামুল্লার দিকে। তাঁর অসহায়তা দেখে লোকটা হাসছে কেমন করে ভেবে পান না তিনি। হাসি থামতে ইকরামুল্লা বলে, 'ব্যাঙ্কে চিঠি দেখিয়ে টাকাটা কবে তাহলে তুলছ, নাসির?'

'টাকাটা কি তুলব?' অসহায় কণ্ঠে পরামর্শ চান মি. নাসির।

ইকরামুল্লা বলল, 'আরও দু'দিন অপেক্ষা কর বরং। আমার মতে আরও চমক অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'মানে!' মি. নাসির প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকান ইকরামুল্লার দিকে।

ইকরামুল্লা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। বলে, 'দু'দিন ধৈর্য ধরে থাক, নিজেই বুঝতে পারবে মানেটা। যাকগে, অনেক রাত হয়েছে নাসির। তোমার বেগম সাহেব শুয়ে শুয়ে অভিমান করছে বুঝি ফিরতে দেরি দেখে।'

মিসেস নাসিরের প্রসঙ্গ উঠতেই শক্ত হয়ে ওঠে মি. নাসিরের চোয়াল দুটো।

কিন্তু কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। তারপর বিদায় নিয়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

আগন্তুক এতক্ষণ ধরে ওদের দুজনের সব কথা শুনে নিয়েছে। সে-ও এবার পানির কলের উপর থেকে মেঝেতে নেমে বের হয়ে আসে সন্তর্পণে বাথরুম থেকে। ব্যালকনিতে পৌঁছে লাফিয়ে পড়ে সে মাটিতে। তারপর বাগানের দিকে হাঁটতে থাকে সতর্ক পায়ে।

তিন

রাত একটা।

সোনার মা বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে কাঁদছিল। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে বাড়ির মেজ ছেলে কাওসারের লাশ খুঁজে পাবার পর। সেই তখন থেকেই কাঁদছে প্রৌঢ়া সোনার মা। কত কথাই তার মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে ক্ষণে ক্ষণে। বড় ভাল ছিল কাওসারের আম্মা। কাওসারের আম্মা যখন এ বাড়ির বড় বউ হয়ে আসে তার সঙ্গেই দেখাশোনার ভার দিয়ে কাওসারের নানী পাঠিয়েছিলেন সোনার মাকে। সোনার মা তখন সবেমাত্র বিধবা হয়েছে। ছেলেটাও মরে গেছে কলেরায়। খুশি মনেই দিদিমণির সাথে দিদিমণির শ্বশুর বাড়ি এসেছিল সে। মনে আশা ছিল নিজের ঘর-সংসার যখন নেই তখন দিদিমণির ঘর-সংসার দেখাশোনা করেই সাধ মেটাবে সে। তবে সে সাধ তার ব্যর্থ হয়নি। দিদিমণির শ্বশুর বাড়িতে সোনার মা স্থায়ী হয়ে গেল। দিদিমণি মায়ের বাড়ির লোককে ছাড়তে রাজি হল না কোনমতে।

সারওয়ার এবং কাওসার যখন হল তখন সে কি আনন্দ সোনার মার। রাত জেগে আঁতুড় ঘরে ঠায় বসে থাকে সে পুরো পাঁচটি দিন। দু'দুটো ছেলে, দিদিমণি সামলাতে পারত না একা। কিন্তু তাই বলে কোনও সমস্যাতেই পড়তে দেয়নি সে দিদিমণিকে। দু'ছেলেকেই খাইয়েছে দাইয়েছে, রাত জেগে বসে থেকেছে, যদি বাচ্চারা ঘুম ভেঙে কান্না শুরু করে দেয়।

একটু বড় হতে কোলে পিঠে করে সারওয়ার এবং কাওসারকে মানুষ করেছে সে। দিদিমণিকে কোনও ঝক্কি ঝামেলাই পোহাতে দেয়নি সে।

ধীরে ধীরে সারওয়ার এবং কাওসার বড় হয়ে গেল। অনেক দিন আর বাচ্চা-কাচ্চা হল না দিদিমণির। তারপর বারো বছর পর পেটে এল ছোটটি—মন্টি। কিন্তু মন্টি প্রসব হতেই দুধের বাচ্চাকে রেখে চলে গেল দিদিমণি সকলের হাতের বাইরে। বুক শূন্য হয়ে গিয়েছিল সোনার মার দিদিমণিকে চলে যেতে দেখে। এতদিন বুঝতে পারেনি সে যে তার জীবনের অর্ধেকটাই ছিল দিদিমণি। দিদিমণি তার অর্ধেক জীবন নিয়ে চলে যেতে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। তারপর থেকে

কোনদিন হাসতে পারেনি সে ভুলেও। কিন্তু দিদিমণি চলে যাবার সাথে সাথে তার মাথায় একটা দায়িত্ব দিয়ে গেল—দুধের বাচ্চা মন্টিকে মানুষ করে তোলার।

আবার কাজে লাগল সোনার মা। মন্টির ভার নিজের হাতে নিয়ে বড় দাদামণিকে নিশ্চিন্ত করল সে। কিন্তু দিদিমণির শোকে বড় দাদামণিও ইহজগতে বেশিদিন টিকতে পারল না। হঠাৎ কি যে হল, তিন দিনের জ্বরে বিছানায় পড়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বড় দাদামণি অবশ্যি বিছানায় পড়েই বলেছিল আমার সময় হয়ে গেছে, সোনার মা। তুমি আমার মন্টিকে দেখো।

কিন্তু সোনার মা'র কপাল খারাপ। দাদামণি আর দিদিমণির দেয়া গুরু দায়িত্ব সে পালন করতে পারল কই!

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল সোনার মার। হঠাৎ···!

ও কে সরে গেল জানালার সামনে দিয়ে?

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে সোনার মা। দরজার দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিল সে। এদিকের দেয়ালেও জানালা আছে, কিন্তু দরজা নেই। সোনার মা স্পষ্ট দেখল জানালা পথে, কে যেন দ্রুত পায়ে সরে গেল। চেহারাটা চিনতে পারেনি সে। কিন্তু একটা ছায়া সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। কোনও মানুষেরই ছায়া।

কে ঐ ছায়া? এই মাঝরাতে কোথা থেকে আসল? ওদিকে যাবার তো কোনও রাস্তা নেই। শুধু সুড়ঙ্গটাই আছে ওদিকে। তবে কি সুড়ঙ্গ থেকেই বেরিয়ে এল কেউ? কিন্তু তা কি করে সম্ভব! নদীর কিনারা থেকে শুরু হয়েছে সুড়ঙ্গটা। নদীর দিক থেকে এত রাতে কোনও চোর ছ্যাঁচড় ঢুকল নাকি বাড়িতে? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? স্পষ্ট মনে আছে সোনার মার যে, সে সন্ধেবেলায় সুড়ঙ্গের দরজা খোলা দেখে নিজের হাতে বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল! তাহলে! তাহলে বাইরে থেকে কেউ ঢোকেনি বাড়িতে। বাড়িরই কেউ সুড়ঙ্গ-পথে নদীর কিনারায় গিয়েছিল। এখন সে ফিরে এল। তাই হবে!

কিন্তু এই মাঝরাতে কেন গিয়েছিল ছায়াটা নদীর ধারে?

সোনার মার বুকের ভিতর কি যেন দাপাদাপি করে ওঠে। কি একটা কথা মন্টি হারিয়ে যাবার পর থেকেই উঁকি-ঝুঁকি মারছে তার মনে অহরহ—মন্টি কোথায় আছে? এ বাড়িতেই নেই তো কোথাও?

বুকের ভিতর থেকে কে যেন কথা বলে ওঠে। মন্টির করুণ স্বর যেন বেজে ওঠে সোনার মার কানে। কিছুই জানে না সে বাচ্চাটার কি হাল হয়েছে। তবু যেন কোথা থেকে মন্টির আছাড়-পাছাড় করে কান্নার স্বর কানে এসে বাজতে থাকে তার। কান পেতে কি যেন শুনতে চায় সোনার মা। কিন্তু রাতের একটানা নিস্তব্ধতাই বিরাজ করছে চারদিকে। কোনও শব্দ নেই কোথাও। সোনার মার

চঞ্চলতা তবু কমে না। বুকের ভিতর থেকে মন্টির কাকুতি-মিনতি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যেন সে।

গায়ের কাপড় ঠিক করতে করতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায় সোনার মা মেঝেতে। তারপর পা টিপে টিপে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চাঁদ ডুবে যাচ্ছে আকাশের শেষ প্রান্তে। গাছের ছায়াগুলো বিরাট বিরাট হয়ে পড়ে আছে মাটির ওপর। সোনার মা কোনও প্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পায় না।

জানালার সামনে থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে সোনার মা। মন্টির আব্বা যেন কথা বলে ওঠে তার কানের পাশ থেকে—আমার মন্টিকে তুমি দেখ, সোনার মা!

চমকে ওঠে সোনার মা। কি যেন চিন্তা করে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে। গতরাতের কথা মনে পড়ে যায় তার। সাহেবের ঘরে একজন লম্বা-চওড়া মানুষ এসেছিল। তার হাতে ছিল ছোট একটা বন্দুক। সে এসেছিল নদীর দিক থেকেই।

সোনার মার মনে হয়—নদীর ধারে হয়ত কিছু ব্যাপার আছে। বাড়ির কোথাও খুঁজতে বাকি রাখেনি সে মন্টিকে। কিন্তু নদীর কিনারায় যে বোট-হাউসটা আছে সেটা অনেকদিন থেকে তালা মারা বলে কেউ খোঁজ করেনি সেখানে। সে-ও ভাবেনি কথাটা। বোট-হাউসটা একবার দেখা দরকার।

নিঃশব্দে খুলে ফেলে সোনার মা ঘরের দরজা। উঁকি মেরে দেখে নেয় বারান্দাটা। কেউ নেই। উঠানের দিকে তাকিয়ে থাকে সোনার মা খানিকক্ষণ। গাছের ছায়াগুলোকেই কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে তার। কেউ লুকিয়ে নেই তো ঐ আলোছায়াতে?

বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পর মনে সাহস আনতে পারে সোনার মা। ঘর থেকে বেরোবার আগে গায়ে-মাথায় ভাল করে কাপড় জড়িয়ে নেয় সে। দোয়া-দরুদ পড়ে কয়েকবার করে। তারপর বিসমিল্লা বলে বেরিয়ে পড়ে বারান্দায়।

মাঝরাতে আর কোনদিন ঘর ছেড়ে একা বেরোয়নি সোনার মা। অশরীরী একটা ভয় পেয়ে বসতে চায় যেন তাকে। অলৌকিক শক্তি বলেই যেন হাঁটতে থাকে। বারান্দা থেকে নেমে যন্ত্রচালিতের মত উঠান ধরে সে।

উঠানটা ঘুরে তার নিজের ঘরের পিছন দিকে এসেও পা থামে না তার। অদ্ভুত একটা ক্ষমতা এসে গেছে সোনার মার পা দুটোয়। নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। ইচ্ছা করলেই এখন আর সে থামতে পারছে না। সে যেন চলছে না, কে যেন চালাচ্ছে তাকে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চোরের মত সুড়ঙ্গটার মুখের সামনে পৌঁছে যায় সোনার মা। সুড়ঙ্গের দরজা খোলা দেখে চমকে ওঠে সে। সুড়ঙ্গটার ভিতরে জমাট অন্ধকার যেন খিলখিল করে হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। নিজেকে সামলাতে পারে না এবারও সোনার মা। ঢুকে পড়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর।

সামনের কিছুই দৃষ্টিগোচর হবার নয়। নিজের পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে সোনার মা। বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে । নিজের ঢোক গেলার শব্দ শুনেও সন্দেহ হয়, কে যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু পা পা করে এগিয়েই চলল সোনার মা সুড়ঙ্গ পথে। এখন তার থেমে দাঁড়ানোর কোনও উপায়ই নেই। পিছন থেকে কারা যেন ছুটে আসছে বলে মনে হতে থাকে তার। হাঁটার গতি নিজের অজান্তে বেড়ে যায়।

হঠাৎ বিদঘুটে একটা ছোট্ট আর্তধ্বনি করে দাঁড়িয়ে পড়ে সোনার মা। দুটো হাত দিয়ে সাথে সাথে নিজের মুখ চেপে ধরে সে। উত্তেজনায় হাঁপাতে শুরু করেছে বলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলে । কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'বার থরথর করে কেঁপে উঠে তার সর্বশরীর । একটা বাদুরের বাচ্চা উড়ে এসে হঠাৎ তার ঘাড়ে বসে পড়েছিল। সোনার মা চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল ভীষণভাবে চমকে উঠে। যেন পেছন থেকে কেউ তার ঘাড় চেপে ধরেছে।

বুকের ধড়ফড়ানি কিছুটা কমতে আবার অন্ধকারে পা ফেলে হাঁটতে থাকে সোনার মা। ঘর থেকে হ্যারিকেনটা জ্বেলে না নিয়ে এসে ভুল করেছে সে। সুড়ঙ্গটা পরিচিত তার। কিন্তু অন্ধকারে কে কোনখানে ওঁৎ পেতে আছে কে জানে। সাবধান হবার কোনও উপায় নেই। বাঁ পাশের চুন-খসে পড়া এবড়োখেবড়ো দেয়ালের গায়ে একটা হাত রেখে হাঁটতে থাকে সে।

আর বেশি দেরি হয় না সোনার মার। সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে একেবারে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। সুড়ঙ্গটা একেবারে নিকষ কালো অন্ধকারে ডোবা। কিন্তু বাইরে এসে আবছা আলো পাওয়া গেছে। নদীর পানি দেখাচ্ছে কালো পিচের মত। চকচক করছে। নদীর ওপারে গ্রাম।

চাঁদের অন্তিম আলো পড়ে কেমন ছবি মত দেখাচ্ছে গ্রামটা। কোনও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। মৃদুমন্দ শব্দে নদীর পানি বইছে। হঠাৎ ছানাবড়া হয়ে ওঠে সোনার মার চোখ দুটো। ওটা কি ভেসে যাচ্ছে নদীতে?

নদীর মধ্যিখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা আধকাটা কলা গাছ। সোনার মার চোখ ধোকা দেয় তাতে। মনে হয়, কোনও মানুষের পচে ওঠা লাশ ভেসে যাচ্ছে। তারপর নিজেরই অজান্তে অলক্ষুণে একটা সন্দেহ জাগে তার মনে —মন্টির লাশ নয়ত!

তওবা তওবা করে সোনার মা। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে, তারপর নদীর দিকে তাকায় ভাল করে। এদিকেই ভেসে আসছে কলা গাছটা। একটু পরই চিনতে পারে সোনার মা কলাগাছটাকে। বুকটা কে যেন মুক্ত করে দেয় ভারি ওজনদার একটা পাথর সরিয়ে দিয়ে। সোনার মা এবার নদীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে উঁচু পাড়ের দিকে তাকায়। বোট-হাউসটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কিন্তু নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে চায় না সোনার মা। কাদায় পা পিছলে যাবার ভয় আছে।

নদীর কিনারা থেকে উঁচু পাড়ের দিকে উঠতে শুরু করে সোনার মা। বেশ উঁচু পাড়টা। কষ্ট হয় উঠতে। এমনিতেই দারুণ একটা গা ছমছমে ভয় তাকে কাহিল করে ফেলেছে। তার ওপর এত পরিশ্রম। রীতিমত হাঁপাতে থাকে সোনার মা।

পাড়ের উপর উঠে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে। কেউ কোথাও নেই। বাড়ির পিছন দিক এটা। দরকার না পড়লে ভুলেও কেউ কখনও এদিকে আসে না। তাই কচু গাছ, জংলী লতা-পাতায় জঙ্গল মত হয়ে আছে এদিকটা। সোনার মা সেই ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে হাঁটতে থাকে বোট-হাউসের দিকে।

আবার সেই করুণ কান্নাটা শুনতে পায় সোনার মা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কোথায় যেন কাঁদছে মন্টি। থমকে দাঁড়ায় সোনার মা। কিছুই যেন বুঝতে পারে না সে। কে যেন কানে কানে কি বলতে চাইছে তাকে। কান পাতে সে শ্বাস বন্ধ করে। কিন্তু কিছুই তেমন স্পষ্ট করে শুনতে পায় না। শুধু মন্টির অসহায় কান্নাটা বেজে ওঠে তার কানে। মনের কোনও কোণ থেকে যেন আসছে কান্নাটা। কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ হয় তার। পিছন ফিরে তাকায় সে। কচু বন থেকে আসছে নাকি কান্নার সুরটা? আশপাশেও তাকায়। কিন্তু বুঝতে পারে না সে রহস্যটা। একবার মনে হয়, ও তার কানের ভুল। আবার পরক্ষণেই কান খাড়া করে কি যেন শুনতে চেষ্টা করে সে। ভাবে—না তো, কাছে পিঠে থেকেই কেউ কাঁদছে থেকে থেকে। ঠিক যেন মন্টির গলার আওয়াজ!

বোট-হাউসের দিকে তাকায় সোনার মা। আবার কান পাতে। তারপর হঠাৎ অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, 'ঐ তো আবার শোনা যাচ্ছে আমার খোকামণির কান্না!'

ভয়ঙ্কর ভয় পায় সোনার মা। শিউরে ওঠে অকারণেই! হঠাৎ অদ্ভুত একটা ইচ্ছা জাগে—ছুটে পালাতে ইচ্ছা করে ঘরের দিকে। তারপরই মনে হয়—গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে সে যেন। কিন্তু পালাতেও পারে না সোনার মা, চেঁচিয়েও ওঠে না। পাথরের মূর্তির মত আরও খানিকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। বিলম্বিত একটা ডাক শুনে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কুঁকড়ে যায় তার। কোথায় যেন একটা কুকুর ককিয়ে উঠল।

যা থাকে কপালে, এসেছি যখন তখন এর হদিশ করেই যাব—ভাবে সোনার মা। তারপর পা বাড়ায় সামনের দিকে। কিন্তু মনের ভিতর থেকে কে যেন বারবার সাবধান করতে থাকে—যাসনি তুই, আর এক পাও এগোবি না, যদি নিজের ভাল চাস।

সোনার মা মনের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করেই এগোতে থাকে। এখন তার গতি ঢিমে হয়ে গেছে আপনা থেকেই। প্রতি পদেই ভয়ের চাপ আরও বেশি করে তার বুকে চেপে বসছে। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে কে যেন তাকে বারণ করছে—আর না, ফিরে যা এবার!

আরও কয়েক পা এগোল সোনার মা। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখজোড়া। অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। মধ্যরাতের শীতল বাতাসেও দরদর করে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট দুটো থেকে থেকে। সেই ঠোঁটের ফাঁক গলে একটি নাম অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে যেন তার অজান্তেই—'মন্টি! মন্টি! মন্টি! মন্টি!'

সোনার মা এখন স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে মন্টির ফোঁপানি! কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই আর। ভয়ের চেয়ে অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় কাঁপছে সে। অপ্রত্যাশিত আনন্দে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সোনার মা। একদিকে উত্তেজনা, একদিকে আতঙ্ক, একদিকে আনন্দ—সব মিলেমিশে অবর্ণনীয় আকার পেয়েছে সোনার মার মুখমণ্ডল। কোনও দিকে খেয়াল দেবার কথা ভুলে গিয়ে বোট-হাউসের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাঁটছে সে। আর মাত্র পাঁচ হাত দূরে বোট-হাউসের জানালাটা!

উন্মাদিনীর মত এক ছুটে গিয়ে জানালাটার শিক ধরে ঝুঁকে পড়ল সোনার মা। কিন্তু বোট-হাউসের ভিতর একাগ্র দৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ করে মন্টিকে খুঁজে ফিরতে লাগল তার চোখজোড়া। কিন্তু ব্যর্থ হল চেষ্টা। অন্ধকার ভেদ করে মন্টিকে দেখতে পেল না সে।

'মন্টি! খোকাবাবু!' ফিসফিস করে আকুল গলায় ডেকে উঠল সোনার মা।

বোট-হাউসের ভিতর মন্টির কান্না মুহূর্তের জন্যে থমকে থেমে গেল।

'খোকাবাবু! কে তোমাকে এখানে আনছে বাছা!' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল সোনার মা।

কিন্তু কোনও উত্তর এল না তার কথার। মন্টি এবার জোরে কেঁদে উঠল। সোনার মার বুক ফেটে যেতে লাগলো মন্টির কান্না শুনে। কি করবে সে ভেবে পেল না। একবার মনে হল ছুটে গিয়ে বাড়িতে খবর দিয়ে আসে। একবার মনে হল—না, এখান থেকেই গলা ফাটিয়ে সাহেবকে ডাকতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল—কে রেখে গেছে এখানে মন্টিকে? সাহেবের কাজ নয়তো? কিংবা ছোট বউয়ের হাত নেই তো এই কাজে?

সন্দেহ দুটো মন থেকে কোনমতে সরাতে পারল না সোনার মা। এখন কি করবে সে? মন্টিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কে তাকে এই বোট-হাউসে রেখে গেছে? কিন্তু মন্টি যে আরও আছাড়-পাছাড় করে কাঁদতে শুরু করেছে।

'মন্টি! খোকাবাবু! আমার কথা শোন, বাবা! আমি সোনার মা! আমাকে তোমার ভয় কি! আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। সেজন্যেই তো এসেছি আমি, খোকাবাবু! আর কেঁদ না, লক্ষ্মী আমার, আর কেঁদ না…।'

কিন্তু সোনার মার আদরের কণ্ঠ শুনেই প্রচণ্ড অভিমানে কান্না জোর করে তুলেছে মন্টি। থামছে না সে কোনও মতে। হাজার কথাতেও সে এখন থামবে না।

জানালার সামনে থেকে সরে গিয়ে বোট-হাউসের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোনার মা। বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। তালাটা ভাঙা তার কর্ম নয়। ফিরে এসে দাঁড়াল আবার জানালাটার সামনে। বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ সেখানেই। মন্টির কান্না থামবে কিসে সেই চিন্তাতেই পাগল সে এখন। মারা যাবে যে ছেলেটা! এভাবে গলা ফাটিয়ে কি কেউ বেশিক্ষণ কাঁদতে পারে?

চোখের জল বাঁধ মানে না সোনার মার। দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ে তাঁর দু'গাল বেয়ে। কে এমন নিষ্ঠুর কাজ করল? দয়ামায়া বলতে কি কিছু নেই তার বুকে!

'খোকাবাবু!' মন্টি আরও জোরে কেঁদে ওঠে।

'খোকাবাবু, আমি তোমার সোনার মা!'

মন্টি মাথা ঠুকতে থাকে বোট-হাউসের দেয়ালে। শব্দটা যেন ছুরির ফলা হয়ে ঢোকে সোনার মার বুকে!

'খোকাবাবু তোমাকে খাবার এনে দেব? টফি?'

টফি মন্টির খুব প্রিয়। তাই টফির কথা বলে কান্না থামাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু বুকটা তার ভয়ে হিম হয়ে গেল পরক্ষণেই। মন্টি এক নাগাড়ে মাথা ঠুকতে শুরু করল তার কথা শুনে।

স্থান-কাল ভুলে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল সোনার মা। আর সহ্য হচ্ছে না ছেলেটার দুর্দশার কথা ভেবে। মা হয়ে ছেলের এই হাল কে আর সইতে পারে। মন্টি তার পেটের ছেলে না হতে পারে, কিন্তু তার চাইতে কম কিসে? পরের ছেলের জন্যে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ মমতা ঢেলে দিয়েছে সে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষ করেছে পাঁচ-পাঁচটি বছর। মায়ের বাড়া সে।

মা এবং ছেলের আকুল কান্না শুনে চারপাশের গাছপালা পর্যন্ত থমকে গেছে যেন। চাঁদ এই করুণ দৃশ্য সইতে না পেরেই বুঝি অস্ত গেল। আর দূরে কোথাও করুণ স্বরে ডেকে উঠল একটা মোরগ।

চার

পরদিন সকালে সোনার মাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ঘরের ভিতর।

ভোর বেলা এক কাপ চা হাতে নিয়ে মি. নাসিরের ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্বটা অনেকদিন থেকেই নিয়মিত পালন করে আসছিল সোনার মা। সেদিন সকাল সাতটা বেজে গেল অথচ চায়ের দেখা নেই। মি. নাসির কিছুটা আশ্চর্য হয়ে মিসেস নাসিরের দরজায় এসে করাঘাত করলেন। মিসেস নাসিরের বেলা আটটার আগে ঘুম ভাঙে না কোনদিন। স্বামীর ঘন ঘন ডাকে ঘুম জড়িত চোখে দরজা খুলে

দিয়েই বিরক্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়িতে! এত চেঁচামেচি কিসের শুনি?'

মি. নাসির শান্তভাবেই বলেন, 'সোনার মা কোথায় দেখ তো। আমার চা দেয়নি কেন এখনও?'

'ও, এই জন্যে এত হট্টগোল! তা তুমি নিজে গিয়ে দেখতে পার না? জান না এত সকালে আমার ঘুম ভাঙে না!'

স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকান মি. নাসির। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে রান্নাঘরের উদ্দেশে হাঁটতে থাকেন। কিন্তু রান্নাঘর অবদি যেতে হয় না তাঁকে। সোনার মার ঘরটাই আগে পড়ে। মি. নাসির দেখেন তার ঘর এত বেলাতেও ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হয় ঘুম ভাঙেনি এখনও।

অগত্যা সোনার মার দরজার কড়া নাড়েন মি. নাসির। কিন্তু বারবার শব্দ করে কড়া নাড়াতেও সাড়া পাওয়া যায় না তার। আশ্চর্য হন মি. নাসির। নাম ধরেও ডাকেন তিনি তাকে। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও টুঁ-শব্দও পাওয়া যায় না। আবার তিনি স্ত্রীর দরজায় ফিরে এসে দাঁড়ান। মিসেস নাসির ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়েছেন। এবারও প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেন তিনি।

'সোনার মার ঘরের দরজা বন্ধ কেন? এত ডাকাডাকি করছি তবু কোনও সাড়া নেই!'

মিসেস নাসির ভ্রূ কুঁচকে তাকান স্বামীর দিকে। বিরক্তি এখনও পুরোপুরি যায়নি যেন তাঁর, তবে কিছুটা অবাক ভাব ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

'কই চল তো দেখি!'

স্বামীর সঙ্গে সোনার মার দরজার সামনে এসে দাঁড়ান মিসেস নাসির। তারপর কড়া নাড়েন জোরে জোরে।

কিন্তু এবারও সোনার মার কোনও সাড়া পাওয়া যায় না ভিতর থেকে। এরপরও নানা চেষ্টা চলে তার ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু সোনার মা চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বরং বলা ভাল সোনার মাকে চিরদিনের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এখন আর ডাকাডাকি করে লাভ কি?

কুড়ি মিনিট পরই মিসেস নাসিরের পরামর্শে মি. নাসির ফোন করেন থানায়।

মি. সিম্পসন খবর পেয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে শহীদকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনীড়ে উপস্থিত হন। তারাও অনেক চেষ্টা করেন সোনার মার ঘুম ভাঙাতে। জানালা-দরজা সব বন্ধ। সুতরাং ভিতরে কি ঘটেছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। অগত্যা গায়ের জোরে ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলা হয় দরজা।

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই চমকে ওঠে শহীদ। সোনার মাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় সে। কড়ি-কাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস পরে যেন

আত্মহত্যা করেছে সোনার মা।

'মাগো!'

মিসেস নাসির সকলের পিছনে ঘরে ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেন। মি. নাসির বোকার মত তাকিয়ে থাকেন কড়ি-কাঠের দিকে, যেখানে দড়িটা বাঁধা হয়েছে। মি. সিম্পসন তাকান শহীদের দিকে। শহীদ ধীরে ধীরে ঘরের অপর দিকের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে ঘুরে দাঁড়ায় সে। একে একে মি. নাসির এবং মিসেস নাসিরের দিকে তাকায় সে। তারপর অতি গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে, 'গত রাতে এ বাড়িতে সোনার মাকে নিয়ে আপনারা তিনজন ছিলেন মোট, তাই না?'

'জ্বি, হ্যাঁ।' উত্তর দেন মিসেস নাসির, 'ড্রাইভার শামসু মিয়া গত কালকের রাত থেকে কোথায় যেন চলে গেছে।'

'আপনি জানেন কেন এ বাড়ি থেকে ও চলে গেছে।'

মিসেস নাসির চমকে উঠে তাকান শহীদের দিকে। শহীদ তাকে প্রশ্ন করছে, না নিজের সিদ্ধান্ত জানাল, তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

'আমি জানি না!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিসেস নাসিরের দিকে তাকিয়ে থেকে শহীদ বলল, 'জানেন না?'

মি. নাসির হঠাৎ বলে ওঠেন, 'একটা কথা, মি. শহীদ।'

শহীদ বলল, 'আমি জানি, আপনি কি বলতে চান, মি. নাসির। আপনি বলতে চান, আপনার স্ত্রী যখন একবার বলছেন যে, ড্রাইভার শামসু মিয়া এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে কেন তা উনি জানেন না, তখন ওনাকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা ঠিক নয়—তাই না?'

অপ্রতিভ হয়ে যান মি. নাসির। শহীদ ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'বেশ!'

মি. সিম্পসন বলেন, 'লাশটা নামাবার ব্যবস্থা করব কি, শহীদ?'

'হ্যাঁ।' ছোট্ট করে উত্তর দেয় শহীদ। সে তখন ঘরের একটি মাত্র দরজার সামনে গিয়ে কি যেন পরীক্ষা করছে গভীর মনোযোগের সাথে।

মি. সিম্পসন ঘর থেকেই হাঁক ছাড়লেন, 'জমাদার।'

একজন পুলিস কনস্টেবল এসে ঢোকে ঘরের ভিতর।

'আপনারা একটু ঘরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন দয়া করে।'

মি. এবং মিসেস নাসিরের উদ্দেশ্যে কথাটা বলল শহীদ। ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান ওঁরা। জমাদার আসলে পুলিস কনস্টেবলটির ডাক নাম। সে সম্মুখে দাঁড় করানো একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে সোনার মার গলার দড়ি ব্লেড দিয়ে কেটে লাশটা নামাতে লেগে যায়। মি. সিম্পসন সাহায্য করেন তাকে। এদিকে শহীদ

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে কি যেন পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একসময় বাইরে বের হয়ে এসে দরজার মাথার উপরের ছোট একটু ফাঁক দিয়ে কড়ে আঙুলটা ভিতরে ঢোকাতে চেষ্টা করে সে। একটু চেষ্টা করার পরই আঙুলটা ঢুকিয়ে ঘরের ভিতরকার ছিটকিনিটা স্পর্শ করতে পারে। সাফল্যের একটুকরো হাসি ফোটে তার মুখে। মি. এবং মিসেস নাসির ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শহীদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন এতক্ষণ।

শহীদ তাঁদের দিকে ফিরেই বলল, 'বুঝতে পারলেন কি দেখছিলাম আমি?'

'কি!' স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রশ্ন করে ওঠেন একসঙ্গে।

'খুনীর বুদ্ধিমত্তা!'

'খুনী!' এবার রীতিমত চমকে উঠে বলে ওঠেন মি. এবং মিসেস নাসির।

'ইয়েস! দিস ইজ এ প্লেন কেস অভ মার্ডার!' দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে এসে মি. সিম্পসন বলে ওঠেন। 'সোনার মাকে গলা টিপে খুন করে খুনী কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে লটকে দিয়েছে। আমাদের চোখে ধোঁকা দেবার জন্যেই অবশ্য। কিন্তু লাশের গলা টিপে ধরার ফলে দাগ রয়েছে, এখনও মিটে যায়নি। যদিও এখনও আমি জানি না খুনী কিভাবে ঘর থেকে···।'

'এ কি বলছেন আপনারা!' আর্তনাদ করে ওঠেন মি. নাসির।

মিসেস নাসির ককিয়ে উঠে বললেন, 'হায়, আল্লা! এ কি শুরু হল বাড়িতে!'

শহীদ কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকে সোনার মার লাশের উপর ঝুঁকে পড়ে।

মি. সিম্পসন ঢোকেন পিছন পিছন।

'ঠিক তাই! আপনি নির্ভুল!' মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে কথাটা বলে শহীদ।

মি. সিম্পসন শহীদের কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে বলেন, 'আর দেরি করে কোনও লাভ আছে কি, শহীদ? মি. নাসিরকে এখুনি গ্রেফতার করাটাই কি উচিত হবে না?'

'না ! আরও একদিন···

মি. এবং মিসেস নাসিরকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে যায় শহীদ। তারপর আবার বলে, 'লাশ পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠাতে পারেন মি. সিম্পসন।'

'এ বাড়ির ফোনটা একটু দেখিয়ে দেবেন?'

মি. সিম্পসনের কথা শুনে মিসেস নাসির বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

মি. সিম্পসন এবং মিসেস নাসির ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতেই মি. নাসির দ্রুত পায়ে শহীদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ শহীদের একটা হাত ধরে ফেলে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আপনি এ ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ করবেন না, মি. শহীদ—প্লীজ! আমি যা জানি সব আপনাকে বলব, কিন্তু আপনি শুধু মণ্টিকে খুঁজে বের করে দিন।'

শহীদ বলল, 'সোনার মার হত্যার ব্যাপারে কিন্তু আপনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন,

মি. নাসির। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। আপনি যদি সব কথা খুলে বলতেন, তবে না হয় বুঝতাম। কিন্তু…'

'আমি বলব, মি. শহীদ! আমার যা অপরাধ তা আমি স্বীকার করব। বিশ্বাস করুন আমার কথা। কিন্তু তার আগে আমার মন্টিকে খুঁজে দিন আপনি…'

শহীদ স্থির দৃষ্টিতে তাকায় মি. নাসিরের চোখের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, 'যদি বলি আপনি নিজেই মন্টিকে এ বাড়ি থেকে সরিয়েছেন!'

'আমি!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার কি স্বার্থ তাতে, মি. শহীদ! মন্টিকে আমি আমার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি।'

শহীদ বলে, 'স্বার্থ? সেই চিঠিটা দেখিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে বলবেন আপনার বড়দার ছেলে বিপদগ্রস্ত, টাকা দরকার। উইলে তো সেরকম ব্যবস্থা করে রেখেই গেছেন আপনার বড়দা। টাকাই যদি হয় আপনার স্বার্থ? আর মন্টিকে আপনি বেশি ভালবাসেন বলেই আপনি হয়ত মনে করছেন, পুলিস আপনাকে সন্দেহের অতীত ব্যক্তি বলে মনে করবে। কিন্তু আপনার ব্যবহারই এমন উদ্ভট, যাতে আপনাকে নানা দিক দিয়ে সন্দেহ না করে উপায় নেই।

নিরাশ দৃষ্টিতে মি. নাসির তাকান শহীদের দিকে। তারপর বলেন, 'আমার শেষ কথা আমি বলে দিয়েছি, মি. শহীদ। মন্টিকে খুঁজে এনে দিন যেভাবেই হোক, তখন আমি নিজের কথা বলব। তার ফলে আমার কপালে যা আছে তাই হবে। কিন্তু মন্টিকে জীবিত এবং বিপদমুক্ত না দেখে মুখ খুলব না আমি। এখন যা করার ইচ্ছা করুন আপনারা।'

শহীদ কথা না বলে দরজার দিকে তাকায়। মি. সিম্পসন এবং মিসেস নাসির ফিরে এসেছেন।

মর্গের গাড়ি এসে পড়বে বিশ মিনিটের মধ্যে। লাশ পাহারা দেবার জন্যে জমাদার রইল। এখন আসুন আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসি। আপনাদের জবানবন্দী লিখে নিতে হবে।

ড্রয়িংরুমে এসে বসল ওরা সকলে। জেরা করা হল মি. এবং মিসেস নাসিরকে, কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনও তথ্যই তাঁরা দিতে পারলেন না। মি. সিম্পসন পরোক্ষভাবে এ প্রশ্নও করলেন যে, আপনারা কেউ কি হত্যা করেছেন সোনার মাকে? ওনারাও পরোক্ষভাবে জানালেন—না। কারও উপর সন্দেহ হয় কিনা জিজ্ঞেস করাতে দুজনেই ড্রাইভার শামসু মিয়ার নাম উল্লেখ করলেন । কারণ জিজ্ঞেস করতে উত্তর এল দুজনের একই—লোকটার না বলে পালিয়ে যাওয়াটা সন্দেহের ব্যাপার।

আর কিছু উল্লেখযোগ্য কথা আদায় করা গেল না জেরা করে। ঢাকার বাইরে

ওঁরা না জানিয়ে যেন না যান এই নির্দেশ দিয়ে শান্তিনীড় ছেড়ে বের হয়ে এল শহীদ এবং মি. সিম্পসন। গাড়ি এসে ততক্ষণে মৃতদেহ নিয়ে চলে গেছে।

শহীদের ফোক্সওয়াগেনে উঠে বসে মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু মি. নাসিরকে গ্রেফতার করতে মানা করলে কেন, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'ভোর রাতে বার্মা থেকে আসা সেই টেলিগ্রামটি পেয়ে গেছি আমি মি. সিম্পসন। আমার বন্ধু মিয়ান জাপকে টেলিগ্রাম করেছিলাম কয়েকটি তথ্য পাঠাবার জন্যে। বার্মার বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিয়ান। সে জানিয়েছে যে, ইকরামুল্লা খান এবং নাসিরউল্ল্যা নামের দুজন সোনা চোরাচালানকারী পাণ্ডা বার্মায় ধরা পড়তে পড়তে পালিয়ে গেছে। তারা পালাবার সময় চীরণ নামের বিখ্যাত মন্দিরের গুপ্তধনের নকশাটিও চুরি করে নিয়ে গেছে একজনকে খুন করে। যাকে খুন করা হয়েছে সে-ও বার্মার এক সোনা চোরা-চালানকারী দলের পাণ্ডা। এ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারকে শিগগির জানানো হবে। বুঝলেন?'

'অদ্ভুত! তা কি করতে চাও তুমি এখন, শহীদ?'

মি. সিম্পসনের কথার উত্তরে শহীদ বলল, 'মি. নাসিরকে এখনই গ্রেফতার করলে সাবধান হয়ে যাবে পুরো দলটা। আমার ইচ্ছা তা নয়। আরও একদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক মন্টির কোনও খবর পাওয়া যায় কিনা। তারপর কাওসারের হত্যাকারীকেও খুঁজে বের করতে হবে। সবগুলো রহস্যের জাল একই সঙ্গে ছিঁড়তে চাই আমি। ভাল কথা, ড্রাইভার শামসুর কোনও হদিস করতে পারলেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'শান্তিনীড়ের আশপাশে তো দূরের কথা, ঢাকা শহরের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। আর একটি কথা, শহীদ, তুমি তো আমাকে জিজ্ঞেস করনি ড্রাইভার শামসু মিয়ার ঘরে রক্তমাখা যে হাতুড়ীটা পাওয়া গেছে তাতে কারও হাতের ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা?'

'আমি জানি, হাতুড়ীটায় কারও হাতের ছাপ পাওয়া যাবে না।'

শহীদের কথা শুনে মি. সিম্পসন বললেন, 'মানে! কিভাবে জানলে তুমি?'

'অনুমান। যাকগে, আপনি এখন চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নজর রাখার ব্যবস্থা করুন শান্তিনীড়ের ওপর। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম দেখলেও আমাকে জানাতে ভুলবেন না যেন।'

'ঠিক আছে।'

মি. সিম্পসনের অফিসের সামনে এসে পড়েছে গাড়ি। বিদায় নিয়ে নেমে পড়েন তিনি। শহীদ বলে, 'মৃতদেহের গলায় হাতের ছাপ আছে, ওর রেজাল্ট কি হয় জানাবেন।'

দ্বিতীয়বার ঠিক আছে বলে বিদায় নেন মি. সিম্পসন। শহীদ বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে নেয় গাড়ি।

*

দু'ঘণ্টা পরই সিম্পসন ফোন করলেন শহীদকে। 'শান্তিনীড়ে একজন লোক ঢুকে মি. নাসিরের সঙ্গে দেখা করে তখুনি বের হয়ে গেছে। লোকটা গাংচিল বারে ফিরে গিয়ে আর বের হয়নি। এদিকে মি. নাসির উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করেছেন শান্তিনীড়ের বারান্দাময়। মনে হয় অপরিচিত আগন্তুক কোনও দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে তাকে। তাই তিনি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।'

মি. সিম্পসনের কথা শুনে শহীদ বলল, 'আমি এখুনি গাংচিল বার-এ যাচ্ছি। আপনি মি. নাসিরের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকুন।'

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল শহীদ গাংচিল বারের উদ্দেশে। কমার্শিয়াল এরিয়ার কাছাকাছি গাংচিল বার। রাস্তা থেকে একটা বেবি ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছুল সে গাংচিল বার অ্যাণ্ড হোটেলে।

গাংচিল বার অ্যাণ্ড হোটেলের বিল্ডিংটা তিনতলা। নিচের তলায় বার ও রেস্তোরাঁ। দোতলা এবং তিনতলায় বোর্ডারদের থাকবার জন্যে সুইটের ব্যবস্থা।

শহীদ যখন বারের হলঘরে পৌঁছল তখন লোকজন নেই বললেই চলে। গাংচিল হোটেল অ্যাণ্ড বারে লোক জমায়েত হয় সন্ধ্যার পর থেকে। শহীদ দেখল মোট গোটা সাতেক লোক এ-টেবিল ও-টেবিলে ছাড়াছাড়া ভাবে বসে আছে। বদ্ধ মাতাল এরা। এক মুহূর্ত থাকতে পারে না এরা মদ ছেড়ে। তা না হলে এমন সময় বারে লোকজন থাকার কথা নয়।

ভিড় বেশি থাকলে কোণের একটা টেবিল বেছে নিত শহীদ। কিন্তু এখন সে হলঘরের মাঝবরাবর একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে উর্দিপরা একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল। লোকটা বুড়ো। চিবুকে সাদা দাড়ি।

লোকটার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়ের অর্ডার দিয়ে চোখ ফিরিয়ে কাউন্টারের দিকে দৃষ্টি ফেলতে যাচ্ছিল শহীদ। হঠাৎ আবার সে চোখ তুলে তাকাল বুড়ো বেয়ারাটার দিকে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর বোঝা যায় না এমন মৃদু একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁট জোড়ায়। বুড়ো বেয়ারা আর দাঁড়াল না। চলে গেল পানীয় আনার জন্যে।

এক মিনিট পর ফিরে এসে শহীদের অর্ডার মোতাবেক টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বেয়ারা। শহীদ গলা ভেজাবার সাথে সাথে হলঘরটা ভাল করে জরিপ করে নিল। হলঘর থেকে বোর্ডারদের কেবিনে যাবার দরজা মোট চারটে। দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা দেখা গেল না খোলা জানালা দিয়ে।

একটু পরই বুড়ো বেয়ারাটা বিল নিয়ে ফিরে এল। বিলটা হাতে নিয়ে কত টাকা হয়েছে দেখে, বিল মিটিয়ে দিল শহীদ। তারপর মেমোটা উল্টে দেখল, তাতে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছেঃ

শহীদ,

রাত এগারটার দিকে মি. নাসিরকে অনুসরণ করে এখানে এস। পিছনের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠবার চেষ্টা করবে। ছদ্মবেশে দলবল নিয়ে হাজির থাকতে বলবে কাছাকাছি মি. সিম্পসনকে।

কুয়াশা

চিরকুটটা পড়ে আবার একবার অস্পষ্টভাবে হাসল শহীদ। বুড়ো বেয়ারা ওরফে ছদ্মবেশী কুয়াশাকে আগেই চিনতে পেরেছিল সে।

গাংচিল হোটেল অ্যাণ্ড বার থেকে বের হয়ে সিধে মি. সিম্পসনের অফিসে পৌঁছুল শহীদ। মি. সিম্পসন জরুরী একটা কাজে বাইরে গেছেন, তবে এক্ষুণি ফিরবেন। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর মি. সিম্পসন ফিরলেন।

'অদ্ভুত, অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে শহীদ! মণ্টিকে কে চুরি করেছে তা জেনে ফেলেছি!' অফিসরুমে ঢুকে শহীদকে দেখতে পেয়েই উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ বলল, 'তাই নাকি? কে?'

'মি. নাসিরের বন্ধু, ইকরামুল্লা চুরি করেছে মণ্টিকে!'

'অসম্ভব!' দৃঢ়কণ্ঠে দ্বিমত প্রকাশ করল শহীদ, 'ইকরামুল্লার পক্ষে মণ্টিকে চুরি করা সম্ভব নয়। ইকরামুল্লা অনেকদিন শান্তিনীড়ে পা দেয়নি এখবর আমি জানি।'

'কিন্তু এই দেখ চিঠি! এই চিঠিটা একটা লোক মি. নাসিরকে দিয়ে গাংচিল বারে গিয়ে ঢুকেছে—যার কথা তোমাকে ফোনে জানিয়েছিলাম। মি. নাসির এই চিঠি নিয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছে একটু আগে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চিঠিটা পরীক্ষা করার জন্যে রেখে দিয়েছিল। আমি খবর পেয়ে নিয়ে এসেছি চিঠিটা। তুমি নিজেই দেখ।'

মি. সিম্পসনের বাড়ানো হাত থেকে চিঠিটা নিল শহীদ। চিঠিটায় লেখাঃ

বন্ধুবর নাসির,

আমার এই চিঠি পেয়েই তোমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠবে। তুমি হয়ত এক্ষুণি ছুটে আসতে চাইবে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে। কিন্তু তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি—রাত এগারোটার আগে এস না আমার কাছে। দেখা পাবে না এলে।

যাকগে, যা বলতে চাই তা এবার বলেই ফেলি। মণ্টিকে যে চুরি করেছিল সে তোমার কাছে মাত্র দশ হাজার টাকার দাবি করেছিল। কিন্তু এখন তুমি তার নির্দেশ মত দশ হাজার টাকা রেখে আসলেও মণ্টিকে ফিরে পাবে না। পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা যদি তুমি আমার টেবিলে নিয়ে এসে সাজিয়ে দাও তবে কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমার মণ্টিকে ফিরে পাবে। নচেৎ এ জীবনে তার হদিস করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

ইতি,
তোমার অসময়ের বন্ধু।

চিঠিটা পড়া শেষ করে মৃদু হাসল শহীদ। তারপর বলল, 'চিঠিটা ইকরামুল্লা খান লিখেছে বলেই একথা সত্যি নয়, মি. সিম্পসন, যে মন্টিকে সে-ই চুরি করেছে। তাছাড়া একথাও তো লিখেছে যে দশ হাজার টাকার দাবি যে করেছিল তার কাছে এখন মন্টি নেই। কথাটা একটু ঘুরিয়ে লিখেছে সে।

মি. সিম্পসন শহীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, 'শহীদ, তুমি কি জানতে পেরেছ মন্টিকে কে চুরি করেছে?'

'না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মন্টিকে ঐ বাড়ির কোনও মানুষই সরিয়েছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ড্রাইভার শামসু মিয়াকে সন্দেহ হয় তোমার?'

শহীদ বলল, 'মি. নাসিরের প্রতি লোকটার বিরূপতা আছে বটে। কিন্তু তার পক্ষে কাওসারকে খুন করা অসম্ভব। আক্রমণ করার হাত তার কাঁচা। আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'

'তবে?'

মি. সিম্পসনের মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল দেখে শহীদ হাসে। তারপর বলে, 'আপনাকে আগেই বলেছি, মি. সিম্পসন, যে অপরাধীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে—যার ফলে আমরা কোনও রহস্যেরই হদিস করে উঠতে পারছি না। কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়ে অপরাধী এমন সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে চলেছে যে, তারা নিজেরাই ধরা পড়ে যাবে। কষ্ট করে আর ধরতে হবে না আমাদেরকে।'

মি. সিম্পসন আর কোনও প্রশ্নই করলেন না। শহীদ আবার বলতে শুরু করল, 'আজ রাত এগারটার সময় আপনি সিভিল ড্রেসে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিস নিয়ে উপস্থিত থাকবেন গাংচিল হোটেলের কাছাকাছি। আমি পিছন দিয়ে উপরে উঠব। হুইসেল বাজলেই ভিতরে ঢুকে পড়বেন আপনি।'

মি. সিম্পসন আশ্চর্য হয়ে তাকালেন শহীদের দিকে। শহীদ মৃদু হেসে আরও কয়েকটি কথা বলে বিদায় নিল মি. সিম্পসনের অফিসরুম থেকে।

পাঁচ

কাঁটায় কাঁটায় রাত এগারোটা। গাংচিল হোটেল অ্যাণ্ড বার।

মি. নাসিরের গাড়ি এসে থামল বারের ফটকে। সারবন্দী আরও অনেকগুলো গাড়ির পাশে নিজের গাড়িটা রেখে নেমে পড়লেন মি. নাসির। ঠিক সেই সময় শহীদের ক্রিমসন কালার ফোক্স-ওয়াগেনটি হোটেলের পিছন দিককার মাঠের অন্ধকারে এসে থামল। গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল শহীদ ধীর-শান্তভাবে। গাড়ি লক করে একই জায়গায় অনড় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড।

তার হাতে একটা দড়ির মই দেখা গেল।

পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা একবার স্পর্শ করল শহীদ। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফাঁকা মাঠটা জরিপ করে নিল। দ্বিতীয়বার গাংচিল হোটেল অ্যাণ্ড বারের বিল্ডিঙের পিছন দিককার কাঠামোটায় চোখ বুলাল। না, কেউ দেখছে না তাকে।

রাত এখন এগারোটা। কেবিনে কেউ নেই বললেই চলে। সকলে পান-ভোজনে মত্ত বারের হলঘরে। নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত এগোল শহীদ। দশ কদম হেঁটেই পাঁচিলের আড়ালে চলে এল। মাথা নিচু করে দড়ির মইটা খোলার কাজে লেগে গেল সে তখুনি। মইটা খোলা হয়ে যেতেই এক কাণ্ড ঘটল। এক গামলা ময়লা পানি ঠিক শহীদের মাথার ওপর পড়ল। কে যেন উপর থেকে ফেলেছে পানিটা।

ঝট করে রিভলভারটা বের করতে করতে উপর দিকে তাকাল শহীদ। দেখল একজন বেয়ারা চলে যাচ্ছে বারান্দা ধরে। তার হাতে একটা গামলা। হেসে ফেলল শহীদ। লোকটা অজ্ঞাতসারেই শহীদের মাথার উপর ফেলেছে ময়লা পানি। রুমাল দিয়ে মাথা আর কাঁধের কাছটা মুছে নিয়ে তৈরি হল শহীদ। প্রথমবারের চেষ্টাতেই দড়ির মইটা আটকাতে সমর্থ হল সে দোতলার বারান্দার রেলিঙের উপর। দেরি করা মানেই শত্রুপক্ষকে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়া। তরতর করে উঠে পড়ল সে মই বেয়ে দোতলায়। ফাঁকা বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থেকে মইটা টেনে তুলে ফেলল তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। তারপর বারান্দা ধরে নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে একটা আধ-খোলা দরজার সামনে গিয়ে ভিতরটা উঁকি মেরে দেখল।

ঘরটায় আনাজ-পাতি রাখা হয়। ঢুকে পড়ল শহীদ। দড়ির মইটা ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে বন্ধ একটা দরজার দিকে এগোল। হঠাৎ শব্দ শোনা গেল কোনও লোকের। ঝটিতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল শহীদ। একটা লোক আলুর বস্তার আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে খোলা দরজাটা দিয়ে। পাথরের মত অনড় দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। লোকটা কোনও কাজে আগেই ঢুকেছিল ঘরে। শহীদ টের পায়নি। লোকটাও বুঝতে পারেনি শহীদের অনুপ্রবেশ। বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল লোকটা। খোলা দরজা বন্ধ করে দিল সে বাইরে থেকে। অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পেন্সিল-টর্চটা বের করে অপর বন্ধ দরজাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। দেখল ও দরজাটা ভিতর থেকেই বন্ধ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। এটাও যদি বাইরে থেকে বন্ধ থাকত। তাহলেই হয়েছিল! বন্ধ ঘরের ভিতরই আটকা পড়ে যেত সে।

দরজার ছিটকিনিটা খুলল শহীদ। উঁকি মেরে দেখল ফাঁকা একটা করিডর, আর করিডরের সর্বদক্ষিণে উপরে ওঠার সিঁড়ি। দ্বিধায় পড়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, আর একবার সতর্কভাবে ফাঁকা করিডরটা দেখে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল শহীদ সিঁড়িটার দিকে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে হাতে নিল সে। কিন্তু তিন তলায় উঠে কাউকে দেখতে পেল না। করিডরের দু'পাশের কেবিনের দরজা জানালা বন্ধ। সতর্কভাবে এগোল শহীদ। সামনেই একটা জানালা দেখা যাচ্ছে। কাচের শার্সি ভেদ করে ঘরের আলো এসে পড়েছে করিডরের মেঝেতে। উঁকি মেরে দেখল শহীদ জানালাটার পাশ থেকে। মি. নাসির!

দেখা গেল ঘরের ভিতর মি. নাসির একা পায়চারি করে বেড়াচ্ছে উত্তেজিত ভাবে। জানালাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও তিন কদম এগোল শহীদ। জানালাটার একটু দূরেই একটা আধ-ভেজানো দরজা। তিরিশ সেকেণ্ড ধরে অল্প অল্প করে ফাঁক করল শহীদ দরজাটা। একটা বাথরুম। ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে পানির চৌবাচ্চার উপর উঠে দাঁড়িয়ে ভেন্টিলেটারের ফোকর দিয়ে পাশের ঘরের ভিতর তাকাল সে। মি. নাসির এখনও একা একা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। চোখ দুটো খুনীর মত অচঞ্চল, আর একটা হিংস্র প্রতিজ্ঞার চিহ্ন তার দৃষ্টিতে। হাত দুটো শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ, দ্রুত পায়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন তিনি।

অপেক্ষা করাই স্থির করল শহীদ। ইকরামুল্লা খানের জন্যেই মি. নাসির অপেক্ষা করছেন। সে ঘরে প্রবেশ করলেই কথোপকথন শুরু হবে ওদের। শোনা দরকার ওদের কথাবার্তা।

কিন্তু শহীদের অজ্ঞাতসারে ঠিক তখুনি বাথরুমের দ্বিতীয় দরজাটি বিন্দুমাত্র শব্দ না তুলে খুলে গেল আস্তে আস্তে। বিশালাকার একজন লোক ঢুকল তীক্ষ্ণফলা একটা ছোরা হাতে। লোকটার মুখে ধূর্ত হাসি ফুটে রয়েছে। চোখ দুটোয় হিংস্র দৃষ্টির ঝলকানি। পা পা করে এগোচ্ছে সে শহীদের দিকে নিঃশব্দে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে। হাতের চকচকে ছোরা বাগিয়ে ধরে।

দাঁড়িয়ে আছে শহীদ চৌবাচ্চার উপর। ভেন্টিলেটারের ফোকর থেকে চোখ সরাচ্ছে না সে। মি. নাসির আগের মতই ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন একা। শত্রুর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয় শহীদ। জানা আছে বাথরুমের দুটো দরজাই বন্ধ। কেউ যে ইতিমধ্যেই সেখানে ঢুকে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে তা সে বুঝবে কি করে?

লোকটা ঠিক শহীদের পিছনে এসে পড়েছে। ছোরাটা আরও শক্ত ভাবে ধরল সে আঙুলগুলো দিয়ে। তারপর হাতটা উপরে তুলে পিছন দিকে নিয়ে গেল। এবার সে বিদ্যুৎ গতিতে শহীদের পিঠে বসিয়ে দেবে ছোরাটা আমূল।

লোকটা বিদ্যুৎ গতিতেই চালাল ছোরাটা।

'আঁ-আঁ-আঁ!'

অস্ফুট একটা আর্তনাদ উঠল বাথরুমের ভিতর। পলকের মধ্যে চৌবাচ্চার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল শহীদ বাথরুমের মেঝেতে। একটা লোককে বিস্ফারিত

চোখে হাঁ করে মেঝেতে পড়ে যেতে দেখল। লোকটার হাতে তখনও একটা চকচকে ছোরা ধরা। লোকটা মেঝেতে পড়ে যাবার সাথে সাথে শহীদ দেখল তার পিঠে একটা ছোরা বিঁধে রয়েছে। ঠিক তক্ষুণি খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তে শহীদ দেখল কুয়াশা এগিয়ে আসছে।

'কি ব্যাপার, কুয়াশা?' শহীদ প্রশ্ন করল।

কুয়াশা লোকটার উপর ঝুঁকে পড়ে একটা রুমাল দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলতে ফেলতে বলল, 'তোমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল শয়তানটা, শহীদ।'

কুয়াশা লোকটার মুখ বাঁধার পর হাত-পাও বাঁধল পকেট থেকে সরু কর্ড বের করে। তারপর শহীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'চল, কামালকে নিয়ে আসি।'

'কামাল কোথায়?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তরে কুয়াশা বলল, 'কামাল একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছে। তাকে আমি নিজের বাঁধন খুলতে এবং লাগাতে শিখিয়ে দিয়েছি। শত্রুদের অজ্ঞাতে নিজেকে নিজেই মুক্ত করে ইকরামুল্লার কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনে সে।'

নির্জন করিডর ধরে নিঃশব্দ পায়ে আধমিনিট হেঁটে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পরপর বিশেষ ভঙ্গিতে টোকা দিল কুয়াশা দরজার গায়ে। এর মিনিট খানেক পরই খুলে গেল দরজা। দরজার মুখে দেখা গেল কামালের সদা হাস্যময় মুখমণ্ডল।

'কি খবর শহীদ?'

কামালের প্রশ্ন শুনে শহীদ বলল, 'তোর খবর কি তাই বল?'

কুয়াশা বলল, 'কথাবার্তা পরে হবে, শহীদ। এখন চল মি. নাসির আর ইকরামুল্লার নাটক শুনি।'

কুয়াশা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদেরকে। কয়েকটি খালি ও নোংরা ঘরের ভিতর দিয়ে ওরা একটা ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে একটা বন্ধ দরজা দেখাল কুয়াশা শহীদকে। বলল, 'ঐ ঘরের ভিতর মি. নাসির আছেন।'

ওরা তিনজন দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই মি. নাসিরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ল ঘরের ভিতর। মি. নাসির সম্ভবত ইকরামুল্লা খানকে এতক্ষণে ঘরে ঢুকতে দেখে চিৎকার করে উঠলেন। 'তুমি! তাহলে তুমিই আমার মন্টিকে চুরি করেছ! উহ্! কি ভয়ঙ্কর, এত বড় নিষ্ঠুরতা তুমি করতে পারলে, ইকরামুল্লা? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও!'

ইকরামুল্লার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঘরের ভিতর থেকে। 'কথা আস্তে বল, নাসির। এত চেঁচাচ্ছো কেন?'

'কিন্তু আমার কথার উত্তর দাও, ইকরামুল্লা?' উত্তেজনায় আবার চিৎকার করে

ওঠেন মি. নাসির।

ইকরামুল্লা বলে, "সবই তো জেনেছ তুমি আমার চিঠিতে। আবার কি জানতে চাও?'

মন্টিকে তাহলে তুমিই চুরি করেছ?'

'চুরি করিনি। তবে মন্টি এখন আমার হাতেই আছে। মানে, আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি তুমি না দাও, তবে ওকে ফিরে পাবে না।'

মি. নাসির এক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'আর কাওসারকে খুন করেছ তাহলে তুমিই?'

'আমি না। কাওসারকে খুন করেছে অন্য একজন।'

'কে?'

'তা তুমি কোনদিন জানতে পারবে না।'

মি. নাসির হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'শয়তানের বাচ্চা শয়তান! তোর স্পর্ধা দেখে...'

'সাবধানে কথা বল নাসির। নয়ত...' ইকরামুল্লাও সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে কথাটা।

মি. নাসির প্রচণ্ড ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'নয়ত কি? আমাকে গুম করে ফেলবে বুঝি।'

'অসম্ভব নয়।' নির্বিকার কণ্ঠে বলে ইকরামুল্লা।

মি. নাসির হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন, 'ইকরামুল্লা! তুমি না আমার বন্ধু? বন্ধু হয়ে আমার এমন সর্বনাশ তুমি করতে পারলে!'

'কেউ কারও বন্ধু নয়, নাসির, এই দুনিয়ায়।'

ইকরামুল্লা মৃদু মৃদু হেসে বলে, 'তোমার আমার বন্ধুত্ব? সে তো প্রয়োজনের খাতিরে গড়ে উঠেছিল।'

হা-হুতাশ করে মি. নাসির বলে ওঠেন, 'এখন আর আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই বুঝি?'

'আছে! তবে এখন তোমার সঙ্গে আগের মত বন্ধুত্ব না রাখলেও তুমি আমার কাজ করে দেবে।'

ইকরামুল্লা বলতে থাকে কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে, 'একটা কথা ভুলে গেছ তুমি, নাসির। আমি কেন তোমাকে এতদিন বন্ধুত্বের সমান মর্যাদা দিয়েছি, তা তুমি ইচ্ছে করেই ভুলে থাক দেখছি।'

মি. নাসির ককিয়ে ওঠেন, 'তাহলে তোমার বন্ধুত্ব মেকি ছিল?'

'নিশ্চয়ই! আসলে তোমার একটা দুর্বলতা খুঁজে পাবার পরই আমার মাথায় বুদ্ধিটা আসে। তোমার বাড়িতে যে গুরুতর দুর্ঘটনাটা তুমি ঘটিয়ে ফেলেছিলে তার সাক্ষী কেবল তুমি আর আমি ছিলাম। তারপর থেকেই আমি তোমাকে আমার

চেয়ে হাজার গুণ নিম্নপদস্থ লোক বলে জানতাম। সোনা চোরাচালানীর ব্যবসা যদিও আমরা দুজন একসঙ্গেই শুরু করেছিলাম, কিন্তু এই ঘটনার পর তুমি আর আমার সমকক্ষ হতে পার না। ঠিক সেই কারণেই তোমাকে আমি অর্ধেক শেয়ার না দিয়ে দশ পারসেন্ট দিয়ে আসছি। এই দশ পারসেন্টও তোমার পাওনা হয় না। তুমি যে কাজ কর, তার জন্যে বেতন হওয়া উচিত বড় জোর দু'শো টাকা। কিন্তু এখন তুমি বছরে প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা রোজগার করছ। এত বেশি তোমাকে দিচ্ছি কেন জান?'

'কেন?' হতভম্ব মি. নাসির প্রশ্ন করেন যেন স্বপ্নের ঘোরে।

'তোমার সোশ্যাল প্রেসটিজের জন্যে। সমাজে তুমি গণ্যমান্য ব্যক্তি, তোমার নাম লোকে সমীহের সঙ্গে উচ্চারণ করে—তাই! যাতে আমার অবৈধ সোনা চোরাচালান কারবারের প্রতি পুলিসের নজর সহজে না পড়ে। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে একথা যখনই লোকে শুনবে তখনই অন্য একটা ধারণা জন্মাবে তাদের মনে। বুঝলে? লোকে মনে করবে মি. নাসির যেখানে আছেন সেখানে কোনও অসৎ কাজ ঘটতে পারে না। এই সুযোগ ব্যবহার করি আমি নানা ভাবে।'

মি. নাসির বোবা হয়ে যান। অনেকক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'তাহলে অনেক আগে থেকেই তুমি আমাকে এইভাবে বিচার করে আসছ!'

'নিশ্চয়! আমি তোমার 'সামাজিক মূল্যের' কদর করে এসেছি এতদিন। একথা তো তোমারও না জানার কথা নয় হে! তুমি বাধ্য হয়েই আমার কাজ করছ। যদি তোমার অপরাধের কথাটা আমি না জানতাম তাহলে কি আর তুমি মাত্র দশ পারসেন্টে আমার হয়ে কাজ করতে?'

এই অবধি কথাবার্তা শুনেই কুয়াশা শহীদ ও কামালকে দরজার সামনে থেকে সরে যেতে বলল। ওরা দরজার এক পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কুয়াশাও বন্ধ দরজার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে পড়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বন্ধ দরজার নিচের দিকে ঠক ঠক করে টোকা মারল। পরমুহূর্তেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল একটা!

বন্ধ দরজার ঠিক মাঝবরাবর দিয়ে ফুটো করে বেরিয়ে গেল কয়েকটি রিভলভারের গুলি। করিৎকর্মা ইকরামুল্লা খানের তারিফ না করে পারা যায় না। বন্ধ দরজার গায়ে অপরিচিত টোকা পড়তেই বুঝতে পেরেছে সে শত্রুর আগমন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বের করে গুলি ছুঁড়েছে সে।

কুয়াশাও দেরি করল না। বিদ্যুৎগতিতে সামনে এসে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা মারল দরজার গায়ে। এক ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ল মজবুত দরজাটা। দরজার ভাঙা হুড়কোটা সিধে গিয়ে লাগল ইকরামুল্লা খানের মাথায়। দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল। উফ্‌ফ্‌ করে চিৎকার করে উঠল সে। পড়ে গেল হাত থেকে রিভলভারটা, আর ঠিক তখুনি কুয়াশা এক লাফে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

এদিকে সুইটে আরও দুজন ষণ্ডামার্কা লোক ছিল। এদের অস্তিত্বের কথা জানত না ওরা। যাই হোক, শহীদ এবং কামাল ঐ দুজনকে নিয়ে পড়ল। ইকরামুল্লা খান কুয়াশার মাত্র দুটো আধমণী ওজনের ঘুসি খেয়েই ঢলে পড়ল চেয়ার থেকে মাটিতে। কুয়াশা তাকে ছেড়ে দিয়েই দেখল খোলা দরজা দিয়ে একজন লোক ঢুকছে রিভলভার হাতে। লোকটা আত্মসমর্পণ করার জন্যে আদেশ দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল শহীদের দিকে তাকিয়ে। শহীদ তখন তার শত্রুকে ধরাশায়ী করে বেদম ঘুসি মারছে। কুয়াশা দেখল কামালের শত্রু ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। রিভলভার হাতে যে লোকটি সবেমাত্র ঘরের চৌকাটে এসে দাঁড়িয়েছে সে কুয়াশাকে দেখতে পায়নি। কামালের শত্রুও জানে না তার ঠিক পিছনে রয়েছে কুয়াশা। সুযোগটা নষ্ট করলে বিপদ ঘটবে বুঝতে পেরে দেরি করল না কুয়াশা। কামালের শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করেছিল কামালের উপর। কুয়াশা পিছন দিক থেকে লোকটাকে ধরে ফেলে পলকের মধ্যে তুলে ফেলল মাথার উপর। তারপর প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারল দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার উপর।

দরজার বাইরে গিয়ে আছড়ে পড়ল দুজনেই। কুয়াশাও চলে এল বারান্দায়। রিভলভারটা লোকটার হাত থেকে পড়ে গেছে। সেটা তুলে নিল সে। তারপর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'মাথার উপর হাত তুলে সাধু বাবাদের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক!'

কিন্তু এদিকে ইকরামুল্লা খান সকলের অলক্ষ্যে টেবিলের উপর একটা হাত তুলে দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল শহীদ। তখন তার হাতেও রিভলভার ধরা রয়েছে। কিন্তু বারান্দার দিকে মুখ করে গুলি ছুঁড়তে হবে তাকে ইকরামুল্লা বাধা দিতে গেলে। লক্ষ্যস্থির করতে না পারলে কুয়াশার গায়ে গিয়ে লাগতে পারে গুলি।

দপ্ করে নিভে গেল ঘরের বাতি!

আন্দাজেই ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শহীদ ইকরামুল্লার উপর। কিন্তু কোথায় ইকরামুল্লা! পালিয়েছে সে।

খট খট করে কয়েকটা সুইচ টিপল কামাল সুইচবোর্ডটা খুঁজে পেয়ে। কিন্তু তখুনি জ্বলল না বাতি। জ্বলল আরও কয়েক সেকেণ্ড পর। আলোকিত সুইটে ওরা তিনজন পরস্পরের মুখ দেখল শুধু নিরুপায় বোধে। বাইরের বারান্দায় দুজন আহত হয়ে পড়ে আছে, সুইটের ভিতরও পড়ে আছে একজন। কিন্তু মি. নাসির এবং ইকরামুল্লার কোনও হদিস নেই।

'দরজা দিয়ে পালায়নি ওরা! নিশ্চয় কোনও গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে এই ঘরে।'

কুয়াশার কথা শেষ হতেই শহীদ পকেট থেকে হুইসেল বের করে বাজাল দু'বার। কুয়াশা ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। গুপ্ত পথের সন্ধান করছে সে।

আধমিনিটের মধ্যে সফল হল কুয়াশা। দেয়ালের গায়ে একটা অতি ক্ষুদ্র বোতাম দেখে চাপ দেয় সে আঙুলের মাথা দিয়ে। একদিকের দেয়াল সরে যেতে থাকে বেশ দ্রুতভাবেই। দেয়ালটা একজন মানুষ গলার মত ফাঁক হতেই দেখা গেল একটা সরু সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। কোনও দ্বিরুক্তি না করে এগিয়ে যায় কুয়াশা সিঁড়ির দিকে। ঠিক তখুনি মি. সিম্পসন তার দল বল নিয়ে উপর তলায় হাজির হন।

কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গেছে গুপ্ত পথে। মি. সিম্পসন শহীদকে কোনও প্রশ্ন করার আগেই শহীদ বলল, 'সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে, মি. সিম্পসন। শত্রুরা পালাবার তালে আছে!'

কামাল বলল, 'এতক্ষণে পালিয়েছে বলেই তো মনে হয়···

'না।' শহীদ বলে, 'সোনার গুদাম-ঘর আছে এই হোটেলেই। তার একটা ব্যবস্থা না করে পালাবে না শয়তান ইকরামুল্লা।'

'মি. নাসিরও ভেগেছেন নাকি!'

মি. সিম্পসনের প্রশ্নের উত্তরে শহীদ বলল, 'আসুন দেখা যাক। এই পথেই পালিয়েছে সবাই।'

কুয়াশা যে পথে কিছুক্ষণ আগে নেমে গেছে, শহীদ দ্রুত পায়ে সেই গুপ্ত পথের দিকে এগোয়। মি. সিম্পসন আর কামাল তার পিছু নেয়। পুলিস কনস্টেবল কজনও সবার পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে একটা আলোকিত সুইটের ভিতর। সুইটের সবগুলো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। বাঁ দিকের একটা দরজা শুধু খোলা দেখা গেল। ভেজানো রয়েছে। দ্রুত হাতে দরজাটা খুলতেই একতলার হলঘরটা দেখা গেল।

হলঘরে তখন মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। মদ্যপায়ী নারী-পুরুষ টেবিল চেয়ার উল্টে দিয়ে ভীত কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। হুড়মুড় করে কেটে পড়তে চাইছে অনেকে দরজা দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে।

'কাউকে বের হতে দেবেন না, মি. সিম্পসন, হোটেল থেকে। ইকরামুল্লা ওদের সাথে সাথে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে নেবে তাহলে।'

রিভলভার হাতে সকলের উদ্দেশ্যে হুকুম জারি করেন মি. সিম্পসন, 'দরজার কাছ থেকে সরে এসে হলঘরের মাঝখানে জড়ো হন সকলে। কোনও ভয় নেই আপনাদের। কিন্তু কেটে পড়ার চেষ্টা করবেন না কেউ দয়া করে।'

মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল হলঘরে। পুলিস কনস্টেবল ক'জন ছুটল দরজার দিকে। শহীদ বলল, 'আপনি দরজাটা দেখুন, কেউ যেন পালাতে না পারে। আমরা ভিতরটা দেখি। হুইসেল বাজালে ভিতরে আসবেন আপনি।'

মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে কথাকটি বলেই ছুটল শহীদ কামালকে সঙ্গে নিয়ে। হলঘর থেকে বের হয়ে ফাঁকা করিডর ধরে এগোল ওরা। চারদিকে উজ্জ্বল বাতি

জ্বলছে। কিন্তু কোনও জন-মানুষের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। এমন সময় ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করার কথা বয়-বেয়ারাদের। কিন্তু কারও দেখা নেই। খবর পেয়ে কে কোথায় সটকেছে কে জানে।

একটার পর একটা কেবিনের দরজা খুলে ভিতরটা পরীক্ষা করে সামনের দিকে এগোল ওরা। দু'বার মোড় পরিবর্তন করে হোটেলের বাঁ দিকের শেষ প্রান্তের করিডরে চলে এল ওরা। শেষ সুইটের দরজার সামনে এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল শহীদ। সুইটের ভিতর কারা যেন কথা বলছে!

কান পেতে রইল ওরা। হঠাৎ কামাল তাকাল শহীদের দিকে। মিসেস নাসিরের স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল সুইটের ভিতর থেকে, 'বোট-হাউজের ভিতরে আছে। আমি যাব?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে তোমাকে। নাসির পৌঁছুবার আগেই যেতে হবে।'

ইকরামুল্লা খানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'কিন্তু যাব কিভাবে? পুলিস যে সারা হোটেল ঘিরে ফেলেছে!'

'আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এস।'

ইকরামুল্লার কথা শেষ হতেই করাঘাত করল শহীদ দরজায়। কিন্তু ভিতর থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

'ভাঙতে হবে দরজা। আয় ধাক্কা মারা যাক!'

দু'জন একসঙ্গে ছুটে গিয়ে গায়ের ধাক্কা লাগাল দরজার কপাটে। ভেঙে গেল দরজা। রিভলভার হাতে হুড়মুড় করে সুইটের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা দুজন। কিন্তু ঘর ফাঁকা! অপর দিকের দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে ভেগেছে ইকরামুল্লা এবং মিসেস নাসির।

সুইট থেকে আবার বের হয়ে ছুটল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুইটটার অপরদিকের করিডরে এসে হাজির হল। কিন্তু এখানেও কারও চিহ্ন দেখা গেল না। কোন্ দিক দিয়ে সরে পড়েছে ইকরামুল্লা ও মিসেস নাসির বোঝা গেল না।

ডান দিকে হোটেলের মেইন গেটটা আন্দাজ করে সেদিকেই ছুটল ওরা। ঠিক সেই সময় দু'রাউণ্ড গুলির শব্দ শোনা গেল ডান দিক থেকে। ছুটল ওরা পড়িমরি করে। কিন্তু যা ঘটবার ঘটে গেছে ততক্ষণ। ওরা পৌঁছুবার আগেই একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শোনা গেল। সম্ভবত মিসেস নাসির সরে পড়লেন।

মি. সিম্পসন ছুটে এলেন শহীদকে দেখতে পেয়ে।

'কে গেল গাড়ি নিয়ে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মি. নাসির পালালেন! হলঘরের লোকজনদের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলেন তিনি। সুযোগ বুঝে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।'

'মিসেস নাসিরকে যেতে দেখেছেন?' কামাল প্রশ্ন করে। মি. সিম্পসন বললেন, 'মিসেস নাসির! মিসেস নাসির আবার কোথা থেকে এলেন?'

হঠাৎ হোটেলের ভিতর থেকে রিভলভারের শব্দ শোনা গেল কয়েকবার। কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটল ওরা সেইদিকে।

হোটেলের দক্ষিণ প্রান্তের করিডরে পৌঁছুতেই ওরা দেখল কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক মেঝেতে পড়ে আছে গুলি খেয়ে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখল শহীদ লোকগুলো জীবিত না মৃত।

বেঁচে আছে একজন। শহীদ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই লোকটা ব্যথায় ঠোঁট কামড়ে ধরে অন্ধকার নিচু উঠানটা দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'শালা ইকরামুল্লা আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে ঐ দিকে।'

ছুটল শহীদ তখুনি। কিন্তু করিডর থেকে নামার আগেই অন্ধকার উঠান থেকে কুয়াশার স্বর শোনা গেল, 'শহীদ, মন্টিকে জীবিত পেতে হলে এখুনি ছুটে যাও শান্তিনীড়ে!'

থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে শহীদ। তারপর হোটেলের মেইন গেটের দিকে ছুটতে শুরু করল। কামালও সঙ্গ নিল বিনাবাক্যব্যয়ে।

ছয়

মি. নাসির নিজেদের বাড়ির বাগানে মাটি খুঁড়ে চলেছেন কোদাল দিয়ে!

রাত বারোটা বেজে বাইশ মিনিট। সবেমাত্র ঝড়ের বেগে মোটর চালিয়ে গাংচিল হোটেল অ্যাণ্ড বার থেকে ভেগে এসেছেন তিনি পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে। ভাবছেন নাসির সাহেব, 'কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে হবে। তাঁর অপরাধের চিহ্নমাত্র আর রাখবেন না তিনি এ বাড়ির কোথাও। শয়তান ইকরামুল্লা এর পর তাঁকে আর শায়েস্তা করার কথা ভাবতে সাহস পাবে না। উফ! এতদিন শয়তানটা তাঁকে ব্লাকমেইল করে আসছিল শুধু তাঁর পুরানো এই অপরাধের জন্যে। অনেক আগেই কাজটা করা উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেরি করে নিজের সর্বনাশই ডেকে এনেছেন তিনি। আর নয়। আজ তিনি এর একটা ব্যবস্থা করবেনই। তারপর দেখবেন ইকরামুল্লা কিভাবে তাঁকে দিয়ে কাজ করাতে পারে।

দশ মিনিটের মধ্যে কোদাল চালানো বন্ধ করলেন মি. নাসির। ঝুঁকে পড়ে গর্ত থেকে একটা বড় আকারের কাঠের বাক্স টেনে বের করলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন মি. নাসির। ভূত দেখার মত থমকে গিয়ে তাকালেন সামনের দিকে। হাতে রিভলভার নিয়ে তার পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরই সহধর্মিনী—মিসেস নাসির!

'প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাও বুঝি!' ব্যঙ্গ ভরে কথা বলে ওঠেন মিসেস নাসির, 'কিন্তু অত সহজ নয়, নাসির সাহেব! আমি যে তোমার ঐ অপরাধ-চিহ্নের

পাহারাদার!'

'তুমি! তুমি এত রাতে বাগানে এসেছ কেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মি. নাসির।

মিসেস নাসির বলেন, 'আমিও তো তোমাকে ঐ প্রশ্ন করতে পারি। এত রাতে বাগানে কি করছ তুমি? মাটি খুঁড়ে ঐ যে বাক্সটা বের করেছ ওতে কি আছে?'

এক পা এগিয়ে এসে মি. নাসির বললেন, 'সে কথায় তোমার দরকার কি? যাও, ঘরে যাও তুমি।'

এগোবার চেষ্টা করবে না আর এক পাও। গুলি করব তাহলে।

'কি!' গর্জে ওঠেন মি. নাসির। বললেন, 'তুমি আমাকে গুলি করবে বললে? কেন? কি অপরাধ দেখলে আমার?'

মিসেস নাসির খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, 'অপরাধ! তোমার অপরাধ হচ্ছে তুমি তোমার পাপের চিহ্ন চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছ।'

'কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি কি? ইকরামুল্লার স্বার্থ আছে জানি, কিন্তু তুমি কেন আমাকে বাধা দিতে এসেছ?'

মিসেস নাসির হেলেদুলে বললেন, 'আহা, কচি খোকা যেন তুমি! ইকরামুল্লা যে আমাকে পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখেছে তা জান না বুঝি?'

নিষ্ফল আক্রোশে বিকট চিৎকার করে উঠলেন মি. নাসির। জানি, হারামজাদী, আমি সব জানি। অনেকদিন থেকেই সন্দেহ জেগেছে আমার। তোর সঙ্গে ইকরামুল্লার অবৈধ সম্পর্ক আছে। তা আমার আগেই সন্দেহ হয়েছে। আজ আমি জানলাম আমার সন্দেহটা অমূলক নয়।'

'চেঁচামেচি কোরো না বেশি। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত নিজের ঘরে যাবে কিনা বল।'

মি. নাসির চিৎকার করেই বললেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দে, পিশাচিনী। মন্টিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বল।'

খিলখিল করে পিশাচিনীর মতই হেসে উঠলেন মিসেস নাসির। কৌতুক করে বললেন, 'জা-নি-না।'

'জানিস না! আর আমার কাওসারকে, কাওসারকে কে হত্যা করেছে বল?'

'আমি।'

নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিয়ে এক পা এগোন মিসেস নাসির। তারপর বলেন, 'তুমি ঘরে ফিরে যাবে কি না বল এবার।'

মিসেস নাসিরের কঠিন কণ্ঠস্বর শুনেও নড়েন না মি. নাসির। চিবিয়ে চিবিয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন, 'আমি জানতে চাই মন্টিকে কোথায় রেখেছিস তোরা সরিয়ে?'

মিসেস নাসির ব্যঙ্গ ভরে বললেন, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে মন্টি কোথায়

আছে শুধু তাই বলব না, তোমার আদরের মন্টিকে এনে কোলে তুলে দেব জ্যান্ত।'

'কোথায় রেখেছিস বলবি না তাহলে?' নিজের পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে তীব্র কণ্ঠে শাসিয়ে উঠলেন মি. নাসির।

সাবধানী কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন মিসেস নাসির, 'পকেট থেকে খালি হাত বের করে আন ভালয় ভালয়। নয়ত বুক ফুটো করে বেরিয়ে যাবে গুলি। একটুও কাঁপবে না আমার হাত।'

মি. নাসির শ্লেষাত্মক একটুকরো হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'আমি জানি তোর মত পাপীয়সীর হাত এতটুকুও কাঁপবে না স্বামীর বুক ফুটো করে দেবার জন্যে গুলি ছুঁড়তে। জানি বলেই আগে থেকে সাবধান হয়ে আছি। এই আমি আমার রিভলভার বের করছি। গুলি করে দেখ, হারামজাদী—তোর রিভলভারে একটিও গুলি নেই। আজ দুপুরের পর সবগুলি আমি বের করে নিয়েছি ।

চমকে ওঠেন মিসেস নাসির মি. নাসিরের কথা শুনে। নিজের হাতে ধরা রিভলভারের দিকে একবার তাকিয়েই তাকান তিনি স্বামীর দিকে। মি. নাসির ততক্ষণ নিজের পকেট থেকে রিভলভার বের করে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্বৈরিণী স্ত্রীর দিকে। বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে নিজের রিভলভারের ট্রিগার টিপে ধরেন মিসেস নাসির মি. নাসিরের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মৃত্যু ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে যায় তাঁর মুখ। সত্যিই গুলি বের হয় না রিভলভার থেকে। আতঙ্কে নীল হয়ে ওঠে তাঁর চেহারা। বিকৃত ঠোঁট জোড়া থরথর করে কেঁপে ওঠে। কি যেন বলতে চান মিসেস নাসির অস্ফুট স্বরে। কিন্তু ঠিক তখুনি গর্জে ওঠে মি. নাসিরের হাতের রিভলভার।

পরপর দুবার গুলি বর্ষণ করেন মি. নাসির। প্রথম গুলিতেই আহত হয়ে পড়ে যান মিসেস নাসির বিকট আর্তনাদ করে। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল কি না বোঝা গেল না। তৃতীয় বারও ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিলেন মি. নাসির। কিন্তু কাদের যেন দ্রুত পায়ের শব্দ কানে এসে ঢুকতেই চমকে উঠে থমকে গেলেন তিনি। শখের গোয়েন্দা শহীদ খান আর তার সঙ্গী কামাল আহমেদ ছুটে এসে পড়েছে এদিকে দেখতে পেলেন তিনি চাঁদের আলোয়। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করা মানে ধরা পড়ে যাওয়া। কিন্তু ধরা পড়লে চলবে না এখন। মন্টির খোঁজ পেতে হবে। আর সেই লকেটটা! ইকরামুল্লার হাত থেকে বাঁচাতে হবে সেই মহামূল্যবান লকেটটা।

শহীদ এবং কামাল কাছে এসে পড়ার আগেই ছুটতে শুরু করলেন মি. নাসির। নদীর দিকে চললেন তিনি। মোটর বোটটা নদীর ধারেই রাখা আছে।

শহীদ ও কামাল দৌড়ুতে দৌড়ুতে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। মিসেস নাসিরের ভূপাতিত দেহটা পলকের জন্যে দেখল ওরা। তরপর মাটি খুঁড়ে যে বড় আকারের বাক্সটা

বের করা হয়েছে সেটার দিকেও চোখ পড়ল ওদের। কিন্তু দেরি করল না ওরা এখানে দাঁড়িয়ে। মি. নাসির নদীর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ধরতে হবে তাঁকে।

কিন্তু ওরা নদীর কিনারায় পৌঁছবার আগেই মোটর বোটের গর্জন শোনা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে নদীর কিনারায় পৌঁছল ওরা। মি. নাসির ততক্ষণ মোটর-বোট নিয়ে মাঝ দরিয়া বরাবর চলে গেছেন।

'পালিয়ে গেল, শহীদ!' কামাল নিরাশ কণ্ঠে বলে উঠল।

শহীদ কোনও উত্তর না দিয়ে দূরবর্তী বোট-হাউসের দিকে হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

শহীদ বলল, 'হোটেলের কেবিনে মিসেস নাসির ইকরামুল্লাকে কি বলছিল মনে নেই তোর?'

কামাল বলল, 'হ্যাঁ, বলেছিল বোট-হাউসের ভিতরে আছে। কিন্তু বোট-হাউসের ভিতর কি আছে, শহীদ?'

শহীদ হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'কান পেতে শোন তো, কেউ যেন কাঁদছে মনে হচ্ছে?'

কামাল কান পেতে শুনে বলল, 'হ্যাঁ! বাচ্চা ছেলের কান্না বলেই তো মনে হচ্ছে!'

আরও খানিকটা সামনে এগোতে বোট-হাউসের ভিতর থেকে স্পষ্ট কান্না শুনতে পেল ওরা। পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে বোট-হাউসের জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল শহীদ।

অন্ধকার বোট-হাউস পলকের মধ্যে আলোকিত হল। বিদ্যুৎবেগে একটি ছোট ছেলে জানালার দিকে তাকাল মুখ ফিরিয়ে। শিউরে উঠল শহীদ। সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল টকটকে হয়ে গেছে। চোখের কোণে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। সারা গাল সিক্ত। শুকনো পাণ্ডুর, পীড়িত একটি কচি মুখ। মনে মনে দুঃখ অনুভব করল শহীদ ছেলেটার অসীম দুর্দশা দেখে। এই-ই তাহলে মন্টি!

'দরজা ভাঙতে হবে শহীদ!' কামাল বোট-হাউসের দরজাটা পরীক্ষা করে বলল।

শহীদ বলল, 'তাড়াতাড়ি যা করার করতে হবে কামাল। আরও কাজ আছে আমাদের।'

দুজনের মিলিত চেষ্টায় ভেঙে ফেলা হল বোট-হাউসের দরজা। শহীদ ও কামালকে এগিয়ে আসতে দেখে আর্তনাদ করে উঠল মন্টি দারুণ ভয়ে। যে-কোনও লোককে দেখলেই এমন চিৎকার করে উঠবে সে এখন। কারও উপর তার কোনও বিশ্বাস নেই আর।

'কেঁদো না, মন্টি, আমরা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। কোথায় নিয়ে যাব বল তো? তোমার বড়দার কাছে নিয়ে যাব, বুঝলে?'

শহীদের মিষ্টি এবং নরম কথা শুনে কান্না থামিয়ে অবিশ্বাস ভরে তাকিয়ে রইল মন্টি। শহীদ ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কে এখানে নিয়ে এসেছিল বল তো, মন্টি?'

মন্টি শহীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মুখ বিকৃত করে ফুঁপিয়ে উঠল। কোলে তুলে নিল শহীদ তাকে। কাঁদতে কাঁদতে মন্টি বলল, 'চাচীমা আমাকে এখানে রেখে চলে গেল। আমি বললাম, এখানে থাকব না, চাচীমা...'

শহীদ এবার আরও নরমভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাওসারদা কোথায় জান, মন্টি?

'চাচীমা মেজদাকে মেরেছে...'

এই পর্যন্ত বলেই মন্টি চিৎকার করে বলতে শুরু করল চাচাজীর কাছে যাব! চাচাজীর কাছে নিয়ে চল!

কামাল বলল, 'আর দেরি করা উচিত নয়, শহীদ। মি. নাসির বক্সনগরের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। ইকরামুল্লাও বক্সনগরে পৌঁছুতে চাইবে।

শহীদ মন্টিকে কোলে রেখেই হাঁটতে শুরু করে বলল, 'সুতরাং সময় থাকতে বক্সনগরে আমাদেরও পৌঁছুনো উচিত। চল্ মন্টিকে মহুয়ার কাছে রেখে ছুটে যাই আমরা।'

শান্তিনীড় থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল ওরা। মিসেস নাসিরের কথা মনে ছিল ঠিকই শহীদের। কিন্তু ফিরে এসে একটা বিহিত করা যাবে মনে করে ক্ষান্ত হল সে। মিসেস নাসির মারা গেছেন মনে করেই কথাটা ভেবেছিল শহীদ। কিন্তু ভুল করেছিল সে!

সাত

মীরপুরের হাবলা নদীর ধারে বক্সনগরের গভীর কাঁঠাল বাগান। কাঁঠাল বাগান ছিল একসময় বক্সনগরে। কিন্তু আজ বাগান বলা চলে না, জঙ্গল বললেই ঠিক বলা হয়।

বক্সনগরের জঙ্গল।

রাত একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। নদীর ধারে এসে ভিড়ল একটা মোটর-বোট। চারদিকের নির্জন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল মোটর-বোটের ক্ষীণ গর্জন। কেঁপে উঠল বক্সনগরের জন্তুজানোয়ারেরা। মি. নাসির এক লাফে পারে এসে উঠলেন মোটর-বোট থেকে। মোটর-বোটের দড়িটা একটা গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে দ্রুত পদক্ষেপে উঁচু পাড়টা অতিক্রম করে জঙ্গলে প্রবেশ করলেন তিনি।

জঙ্গলে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন মি. নাসির। চারদিকে তাকিয়ে সঠিক পথ বেছে নিতে একটু সময় লাগল তাঁর। চাঁদের আলো আছে এখনও। চন্দ্রালোকিত বনভূমিতে সরু পায়ে চলা পথ ধরে একা একা হাঁটতে লাগলেন মি. নাসির।

মিনিট দশেক কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পা চালালেন মি. নাসির। তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ তাঁর সর্বক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। আশপাশে নজর দেবার কথা মনেও নেই। সড়সড় করে সরে যাচ্ছে একটা দুটো সাপ শিয়ালেরা দলভেঙে পড়িমরি করে ছুটছে পিছন দিকে, বনভূমির সকল অধিবাসী চঞ্চল হয়ে উঠেছে গভীর রাতে কোনও শত্রুর অনধিকার প্রবেশে।

হঠাৎ চোখ দুটো চকচক করে ওঠে মি. নাসিরের। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু এবার তিনি এক পা এক পা করে হাঁটছেন। বুকটা নেচে ওঠে তাঁর। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে সাফল্যে ইকরামুল্লার আগেই তিনি পৌঁছে গেছেন নির্দিষ্ট স্থানে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে শিমুল গাছটা! ঐ গাছের কাণ্ডের উপরদিকে আছে একটা কোটর। সেই কোটরে আছে বার্মা থেকে উদ্ধার করা চীরণ মন্দিরের লকেট। লকেটের ভিতর আছে চীরণ মন্দিরের কোটি কোটি টাকার গুপ্ত ধনের চাবিকাঠি। চীরণ মন্দিরের গোপন কুঠরীর নকশা!

এক পা এক পা করে এগিয়ে শিমুল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ান মি. নাসির। উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি। হাত, পা, বুক কাঁপছে তাঁর।

ধীরে ধীরে একটা হাত তোলেন মি. নাসির। গাছের কোটরের মুখে গিয়ে ঠেকে তাঁর হাতটা। ঠিক সেই সময় কেঁপে ওঠে মি. নাসিরের পৃথিবীটাও।

রিভলভারের একটি মাত্র শব্দ শোনা যায়। শিমুল গাছের কোটরের মুখে রাখা মি. নাসিরের ডান হাতের উল্টো দিকে এসে লাগে গুলিটা। হাড় ভেদ করে গাছের ভিতর গিয়ে ঢোকে বুলেটটা। আটকে গেল যেন হাতটা গাছের সঙ্গে। কেউ যেন পেরেক মেরে আটকে দিয়েছে।

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকান মি. নাসির।

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা !'

ইকরামুল্লার বাজখাঁই গলার অট্টহাসি শোনা গেল অদূরেই। মাত্র পনের হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'কি ব্যাপার, ওস্তাদ! ফাঁকি মারার তালে আগেই পৌঁছে গেছ দেখছি! ভেবেছ ইকরামুল্লা পুলিসের ভয়ে ভুলে গেছে লকেটের কথাটা—কেমন?'

মি. নাসির কয়েক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারেন না যেন। ফ্যাল ফ্যাল করে ইকরামুল্লার হাতে ধরা রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। কথা সরে না মুখে।

এদিকে শহীদ আর কামাল নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ায় একটা গাছের আড়ালে। দ্রুত গাড়ি ছুটিয়ে শহীদ মন্টিকে মহুয়া ও সারওয়ারের হেফাজতে রেখে এসেছে। স্পষ্ট দেখতে পায় ওরা ইকরামুল্লা এবং মি. নাসিরকে। মি. নাসিরের সর্বনাশ আসন্ন বুঝতে পারে শহীদ। ইকরামুল্লা মি. নাসিরকে আহত করেই ক্ষান্ত হবে না। আজ তার মাথায় খুনের নেশা চেপেছে। তার কিছুক্ষণ আগের অট্টহাসি শুনে যে-কোনও সাহসী লোকেরও বুক কেঁপে উঠত। অথচ মি. নাসিরকে বাঁচাবার কোনও উপায়ই নেই! মি. নাসিরের দিকে এগোতে গেলেই দেখে ফেলবে ইকরামুল্লা শহীদকে। ইকরামুল্লার দিকেও এগোনো সম্ভব নয়। দেখলেই গুলি চালাবে সে। এখান থেকে গুলি করাও চলে না। ইকরামুল্লা দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের আড়ালে। অর্ধেকটা মাত্র শরীর দেখা যাচ্ছে তার। লক্ষ্য ব্যর্থ হলে সমূহ বিপদ।

'পিছন দিক থেকে গিয়ে শয়তানটাকে ধরে ফেললে মি. নাসিরকে হয়ত রক্ষা করা যায়, শহীদ!' ফিসফিস করে বলল কামাল।

শহীদ ইকরামুল্লার পিছন দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। হঠাৎ কামালের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'তার আর দরকার নেই, কামাল। ইকরামুল্লার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ, কে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে!'

'কুয়াশা!' উৎফুল্ল কণ্ঠ কেঁপে উঠল কামালের।

'চুপ! মি. নাসির কি যেন বলছেন ইকরামুল্লাকে।'

মি. নাসিরও হঠাৎ দেখে ফেলেছেন কালো আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় একজন মানুষকে। মানুষটা নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে। মি. নাসির চোখ সরিয়ে ইকরামুল্লার দিকে তাকালেন। ইকরামুল্লা টের পায়নি অপরিচিত মানুষটার আগমন।

'লকেটটা তোমার কপালে নেই, নাসির! শুধু শুধু এত কষ্ট করে ছুটে এসেছ তুমি। আমি আজই ঐ লকেট নিয়ে রওনা হব বার্মা। এখানকার ব্যবসা আপাতত বন্ধই করে দিলাম। সেই সাথে কয়েকজনের মুখও বন্ধ করে দিয়ে যাব!'

'কার মুখ বন্ধ করে দিয়ে যাবে, ইকরামুল্লা?' আঁতকে উঠে প্রশ্ন করেন মি. নাসির।

'তোমার মুখ বন্ধ করব সবার আগে। কেননা তুমি পুলিসকে জানিয়ে দেবে আমি বার্মায় চলে গেছি। সেটা বিপদের কথা।'

মি. নাসির বললেন, 'কিন্তু আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি, ইকরামুল্লা? তুমি আমার এতবড় শত্রু কেন হলে?'

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে ইকরামুল্লা।

শহীদ চমকে উঠে বলে, 'একি। গাড়ির শব্দ আসছে কোথা থেকে। জঙ্গলের ভিতর মোটর আসবে কেমন করে?'

কামাল কান পেতে কি যেন শুনতে শুনতে বলে, 'আরে, তাই তো। মৃদু একটা গর্জন এদিকেই এগিয়ে আসছে যেন! কে আসছে গাড়ি নিয়ে!'

এদিকে অনর্গল কথা বলে চলেছেন মি. নাসির। পা পা করে এগিয়ে আসছে ইকরামুল্লার পিছন দিক থেকে আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি। ঐ মানুষটার উপরই নির্ভর করছে তার জীবন। এতটুকু চঞ্চলতা তার চেহারায় ফুটে উঠলেই ইকরামুল্লা সন্দেহ করে বসবে। পিছন ফিরে তাকাবে সে তখুনি। মি. নাসির তাই বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করছেন না। অনর্গল কথা বলে ইকরামুল্লার মনোযোগ নিজের দিকে টেনে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি।

'আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে তুমি অসৎপথে টেনে নিয়ে গেছ, ইকরামুল্লা! আমার কাওসারকে খুন করিয়েছ তাকে দিয়ে···তোমার কাছেই শিখেছে সে নিষ্ঠুরতা। আমার প্রতি, আমার সংসারের প্রতি তার মনে ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে নিজের দলে টেনে নিয়ে গেছ তুমি। কেন এমন সর্বনাশ করলে তুমি আমার?'

কথা বলতে বলতে খোদার দরবারে মিনতি জানাচ্ছেন মি. নাসির—ইকরামুল্লা যেন কিছু টের না পায়! খোদা!

হঠাৎ চমকে ওঠে ইকরামুল্লা। তার কানেও ঢোকে অদূরবর্তী গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন। তীব্রবেগে ছুটে আসছে একটা গাড়ি এদিকেই।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে ইকরামুল্লা। তারপর হেসে ওঠে সে কুৎসিত ভঙ্গিতে। মি. নাসিরের দিক থেকে পলকের জন্যেও চোখ না সরিয়ে বলে ওঠে, 'ঘাবড়াচ্ছ কেন, ওস্তাদ! এসে পড়েছে তোমার বিবাহিতা বউ। শুনতে পাচ্ছ না গাড়ির শব্দ? ঐ আসছে সে, তার মুখেই শুনবে সে কেন তোমাকে ঘৃণা করত!'

মি. নাসির সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'কিন্তু তুমি তো আমার অনেক দিনের পুরানো বন্ধু, ইকরামুল্লা। আমার স্ত্রী আমাকে ঘৃণা করত বলে তুমিও কেন তার সঙ্গে হাত মেলালে? কি করেছিলাম আমি তোমার?'

'বারবার নিজের সাফাই গেয়ো না, নাসির! সময় হয়ে এসেছে তোমার, পরওয়ারদেগারকে ডাকো!'

মি. নাসির বললেন, 'আমাকে মেরে কি লাভ তোমার, ভাঁই?'

গাড়ির শব্দ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে এবার। নির্জন বনভূমির উঁচু-নিচু মাটির উপর দিয়ে মাতালের মত টালমাটাল ভঙ্গিতে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। কিন্তু হেড লাইট দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে কোনও বদ্ধ মাতাল ঝড়ের বেগে বিপথে গাড়ি ছুটিয়ে আসছে। এদিকে অনর্গলভাবে কথা বলে ইকরামুল্লার মনোযোগ টেনে রেখেছেন মি. নাসির। আলখাল্লা পরিহিত কুয়াশা নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে এখনও। আর মাত্র সাত কি আট হাত সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ইকরামুল্লা।

আরও এক পা এগোল কুয়াশা।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ ও কামাল। যে কোনও মুহূর্তে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

'কার হাতে মরতে চাও, ওস্তাদ?' ব্যঙ্গ ভরে জিজ্ঞেস করে ইকরামুল্লা, 'বউয়ের হাতে না বন্ধুর হাতে?'

মি. নাসির বললেন ব্যাকুল কণ্ঠে, 'আমাকে প্রাণে মের না তোমরা, ইকরামুল্লা!'

কুয়াশা সামনে বাড়ে আরও এক পা।

উশখুশ করে ওঠে কামাল। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। গাড়ির শব্দ ক্রমেই বনভূমি কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। উঁচু-নিচু মাটিতে গাড়ির চাকা পড়ে যান্ত্রিক শব্দ উঠছে—শোনা যাচ্ছে এখন।

মি. নাসির কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'কাউকে কোনও কথা বলব না আমি, ইকরামুল্লা! তোমরা শুধু প্রাণে বাঁচতে দাও আমাকে…'

আরও এক পা এগোল কুয়াশা।

ইকরামুল্লা বলে, 'কেন, মন্টিকে ফিরে চাও না তুমি?'

মি. নাসির বলে উঠলেন কোনও রকমে, 'না! আমি বাঁচতে চাই শুধু…'

'কিন্তু তা হবে না…'

কথা শেষ হয় না ইকরামুল্লার। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুয়াশা তার উপর। শহীদ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'সরে যাও, কুয়াশা!'

ইকরামুল্লাকে নিয়ে মাটির উপর গড়াতে গড়াতে এক পাশে সরে যায় কুয়াশা! ঠিক সেই সময় ঘটনাস্থল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। এসে পড়েছে গাড়িটা ঝড়ের বেগে। হেড লাইট জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে।

এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে গাড়িটা বদ্ধ মাতালের মত। মাত্র বিশ হাত দূরে দেখতে পান মি. নাসির গাড়িটার চোখ ঝলসানো দুটো হেড লাইটের উজ্জ্বল আলো। গাড়িটা তার দিকে ছুটে এসে পড়েছে।

পালাতে চান মি. নাসির ছুটন্ত যমের হাত থেকে। চোখ মুখ বিকৃত হয়ে বীভৎস আকার নেয়। মৃত্যু ভয় জাগে মি. নাসিরের বুকে। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কাঁপেন তিনি। দৌড়ুবার শক্তি পান না শরীরে। বিড় বিড় করে কি যেন বলতে থাকেন। ঠোঁট জোড়া নড়ে ওঠে করুণ ভাবে। কিন্তু…

কিন্তু ছুটন্ত মৃত্যুদূত কোনও প্রার্থনাই শোনে না তাঁর। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে মি. নাসিরের এবং গাছের গয়ে সিধে ধাক্কা মারে! বিকট একটা আর্তনাদ নির্জন বনভূমিতে জেগে উঠেই চাপা পড়ে যায় চিরতরে। সেই সাথে উল্টে যায় গাড়িটাও! থেঁতলে যায় গাছের খানিকটা অংশ।

ছুটে যায় শহীদ ওল্টানো গাড়িটার দিকে। উল্টে গিয়েও ইঞ্জিনটা চালু

রয়েছে। হেড লাইট দুটোও জ্বলছে তেমনি।

গাড়িটার সামনে গিয়ে শহীদ দেখে মি. নাসিরের দেহ দু'ভাগ হয়ে গেছে প্রায়। ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছেন তিনি। মাথাটা থেঁতলে ছাতু হয়ে গেছে। প্রাণের কোনও চিহ্নই নেই।

ঝুঁকে পড়ে ওল্টানো গাড়ির ভিতর তাকাল শহীদ। কামালও এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'একি! এ যে ড্রাইভার শামসু মিয়া! চমকে উঠে বলে কামাল।'

শহীদ বলল, 'মিসেস নাসিরও আছেন পিছনের সিটে!'

'কিন্তু...'

কামাল কি যেন বলতে চায়। শহীদ বলল, 'মিসেস নাসির মি. নাসিরের গুলিতে মারা যাননি, আহত হয়েছিলেন কেবল। তিনিই রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন ড্রাইভার শামসু মিয়াকে।'

কামাল বলল, 'কিন্তু ড্রাইভার শামসু মিয়া কেন মি. নাসিরকে খুন করল?'

কুয়াশা ইতিমধ্যে বেঁধে নিয়ে এসেছে ইকরামুল্লাকে গাড়িটার কাছে। ইকরামুল্লার ডান চোখ দিয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। একটি মাত্র হাত তার, তাও পিঠের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে কুয়াশা। কাঁধের উপর মুখ ঘষে রক্ত মুছতে মুছতে সে বলল, 'ড্রাইভার শামসু মিয়ার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলেছিল নাসির দু'বছর আগে। লাশটা সে লুকিয়ে রেখেছে শান্তিনীড়ের বাগানে মাটির তলায়। শামসু মিয়া তারই প্রতিশোধ নেবার জন্যে...

'গাড়ির ভিতর কি ওরা দুজনেই মারা গেছে শহীদ?' কুয়াশা কথা বলে উঠল এতোক্ষণে।

শহীদ গাড়ির ভিতর থেকে মাথা আর হাত বের করে নিরাশ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, দুজনেই মারা গেছে!'

কুয়াশা কামালের দিকে ইকরামুল্লার কোমরে বাঁধা দড়ির অবশিষ্টাংশটা বাড়িয়ে ধরে বলল, এর ভার নাও কামাল। আমি চলি এবার।'

কামাল দড়িটা ধরে। কুয়াশা বলল, 'চলি শহীদ, আর কোনও দরকার নেই তো এখানে আমার?'

শহীদ অবাক হয়ে বলল, 'চলে যাচ্ছ তুমি, কুয়াশা? কিন্তু লকেটের জন্যে এসে লকেট না নিয়ে চলে যাচ্ছ যে?'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'লকেট আমি আজ দুপুরেই নিয়ে গেছি এখান থেকে।'

'সেকি!'

কামাল বলল, 'তাহলে তুমি রাত এগারোটার পর থেকে আমাদের সঙ্গে এত ছুটোছুটি করলে কেন?'

কুয়াশা ঘুরে দাঁড়ায়। হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে

শুধু, আর কোনও কারণে নয়।'

'ধন্যবাদ, কুয়াশা!' শহীদ আন্তরিক গলায় বলল। কুয়াশা ততক্ষণ বনভূমির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে শুধু শোনা গেল তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, 'Don't mention, my friend!'

কুয়াশা ১৮

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৬৯

এক

কুয়াশার হাতের উপর মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মেয়েটি। নিস্পন্দ হয়ে গেল তার তন্বী দেহটা। মাথাটা ঢলে পড়ল এক পাশে।

অনেক কষ্টে আর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে মাত্র একবার চোখ মেলে তাকাতে পেরেছিল মেয়েটি। যন্ত্রণার্ত বোবা দৃষ্টি মেলে বোধহয় চিনবার চেষ্টা করল কুয়াশাকে। ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করল, 'এডিথ গ্রে, হোটেল ডি এলিসা, রুম নম্বর···।'

থেমে গেল মেয়েটা। শ্বাস নেবার চেষ্টা করল। তীব্র আক্ষেপে দেহটা কুঁচকে গেল। কপালে হাত বুলিয়ে দিল কুয়াশা। আবার কি যেন বলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল মেয়েটি। পর মুহূর্তেই স্থির হয়ে গেল দেহটা।

গভীর স্নেহে কুয়াশা আলগোছে ক্যানোর পাটাতনের উপর শুইয়ে দিল প্রাণহীন দেহটা। কৃষ্ণাতিথির অস্পষ্ট জ্যোৎস্না মেয়েটার যন্ত্রণায় কুঞ্চিত মুখের উপর এসে পড়েছে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে। সুগঠিত সুঠাম দেহের সঙ্গে সাঁটা খাকি রঙের সুইম স্যুট।

এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এখন কুয়াশা দেখল মেয়েটার কোমরে একটা ওয়াটার-প্রুফ পাউচ। খুলে দেখল একটা রিভলভার তাতে। ম্যাগাজিন পরীক্ষা করল। একটা গুলিও খরচ হয়নি। পাটাতনের তলে পাউচ আর রিভলভারটা রাখল।

সুইম স্যুটের নিচে উরুতে লেগেছে গুলিটা। হয়ত মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। পাটাতনের উপর পানি আর রক্ত কালচে দেখাচ্ছে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায়। বেদিং ক্যাপটা খুলে ফেলল কুয়াশা মেয়েটার মাথা থেকে। একগুচ্ছ সোনালী চুল ছড়িয়ে পড়ল পাটাতনের উপর।

অপলক দৃষ্টিতে কুয়াশা চেয়ে রইল মৃত মেয়েটার যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখের দিকে। বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

কাছেই ছপ ছপ একটা শব্দ হতেই মুখ তুলে তাকাল কুয়াশা যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল সেই দিকে। একটা ডিঙি তার ক্যানোর দিকেই আসছে। ডিঙিতে তিনজন লোক। দুজনের গায়ে নাবিকের পোশাক। তৃতীয় লোকটা মাঝখানে

একটা চেয়ারে বসে আছে। লোকটার দামি বেশভূষা। কুয়াশার ক্যানোর পাশে এসে ডিঙিটা ভিড়ল।

চেয়ারে বসা লোকটাই প্রথমে কথা বলল, 'কিছু একটা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে?' লোকটার কণ্ঠ কর্কশ।

কুয়াশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখে বলল, 'আপনার মনে হওয়ার কারণ জানি না। তবে ঘটেছে সত্যি।' মৃত মেয়েটিকে দেখিয়ে কুয়াশা বলল, 'এই মেয়েটি মারা গেছে। গুলির আঘাতে।'

লোকটার হাতে একটা ফ্লাশলাইট। সে লাইটটা জ্বালিয়ে মেয়েটিকে দেখে বলল, 'ভেরী স্যাড। পুরো ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।' নিরুত্তাপ কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল লোকটার।

'অত্যন্ত দুঃখিত। আমি কিছুই জানি না। দেখিনি কখনও মেয়েটাকে।' লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল কুয়াশা। দেখল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে সন্দেহ। কিন্তু তা উপেক্ষা করে কুয়াশা বলল, 'বীচ থেকে ইয়টে ফিরছিলাম। হঠাৎ কানে এল কাতরানির শব্দ। চারদিকে লক্ষ্য করতেই দেখলাম কে একজন হাত পা ছুঁড়ছে আর অস্ফুট আর্তনাদ করছে। দ্রুত ক্যানো চালিয়ে গিয়ে টেনে তুললাম। একটু পরেই মারা গেল।'

লোকটা আবার মেয়েটার মুখের উপর ফ্লাশলাইটের আলো ফেলল। নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'একেবারে ছেলেমানুষ। কিন্তু মেয়েটা এই গভীর রাতে হারবারে এসেছিলই বা কেন?' প্রশ্নটা বোধহয় নিজেকেই করল সে।

'কোথায় গুলি লেগেছে, মশিয়ে।' নাবিকদের একজন এতক্ষণে কথা বলল।

'ঊরুতে লেগেছে। আঘাতটা তেমন গুরুতর ছিল না। কিন্তু রক্তপাত হয়েছে বিস্তর। ঐ অবস্থাতেই অনেকক্ষণ সাঁতার কেটেছে। ঠিক সময়ে মেডিক্যাল এইড দিতে পারলে বোধহয় বাঁচানো যেত।'

লোকটা বলল, 'মশিয়ে, যদি প্রয়োজন বোধ করেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ধন্যবাদ। আমি নিজেই পারব,' কুয়াশা জবাব দিল।

'কিন্তু সেটা বিপজ্জনক হতে পারে। বাঘের মত পুলিসে ছুঁলেও আঠারো ঘা। হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে।' লোকটা সহানুভূতির ভাব আনবার চেষ্টা করল কণ্ঠে। কিন্তু আবেগহীন কণ্ঠে সহানুভূতি মেশাতে গেলে যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় তার কণ্ঠ তেমনি শোনাল।

'সেটা তো পুলিসের কর্তব্য।' ইঞ্জিনটা চালু করতে করতে বলল কুয়াশা। শেষটায় যোগ দিল, 'সাহায্য করতে চাওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

জেটিতে নামতেই হারবার পেট্রোলের সাথে দেখা হয়ে গেল কুয়াশার। ক্যানোতে লাশটা একজন পেট্রোলের পাহারায় রেখে কুয়াশা পুলিস স্টেশনে গিয়ে

পৌঁছুল।

পুলিস স্টেশনটা জনশূন্য। করিডরে একজন পুলিস দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কুয়াশা তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই সে নিয়ে গেল কর্তব্যরত পুলিস প্রধান ইন্সপেক্টর দুবোঁয়ার কাছে।

ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া চেয়ারে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাকে ডেকে তোলা হল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে তিনি বারবার দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'ব্যাপার কি, মশিয়ে?'

ঘটনাটা খুলে বলল কুয়াশা। লিখিত একটা বিবৃতিতে সই করল।

বিবৃতিটা পড়তে পড়তে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনার নাম?'

'জন আর্থার ল্যাম্প।'

'আমেরিকান না ব্রিটন।'

'ব্রিটন।'

'কোথায় থাকা হয়?'

'হোটেল ডি লা মেয়ার। রুম নম্বর ১০৭। ছয়তলা।'

টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়। রিসিভার তুলে ইন্সপেক্টর বললেন,' 'হ্যালো। ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া বলছি···হ্যাঁ···হ্যাঁ···হ্যাঁ···হ্যাঁ আপনি কে বলছেন···হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব···।' শেষের দিকে গম্ভীর হয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। একটু বিচলিত মনে হল তাঁকে।

কুয়াশা সিগারেট টানতে টানতে ইন্সপেক্টরের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। রিসিভার নামিয়ে কুয়াশার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। নীরবে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর উঠে দরজার কাছে গেলেন। দরজা খুলে কি যেন দেখলেন বাইরের দিকে। গার্ডটা দূরে ছিল। খট খট পদশব্দে সে এগিয়ে এল। একটু পরে ফিসফিস শব্দ হল। কুয়াশার মনে হল, ইন্সপেক্টর আর গার্ড কি যেন ফিসফিস করে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল কুয়াশার কাছে। কিন্তু চঞ্চলতা প্রকাশ করল না সে।

ইন্সপেক্টর ফিরে এসে বসতেই ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা।

'মাফ করবেন, ইন্সপেক্টর, আমি যেতে চাই।'

ইন্সপেক্টর বিচলিত হয়ে বললেন, 'আর কিছুক্ষণ যদি দয়া করে অপেক্ষা করেন—এনকোয়ারীর···'

'মাফ করবেন, ইন্সপেক্টর। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে।' কিছুক্ষণ দেরি হলে কি হবে কুয়াশা জানে। কিন্তু সে তো আর আত্মসমর্পণ করার জন্য পুলিস স্টেশনে আসেনি।

এবার গম্ভীর হলেন ইন্সপেক্টর। বললেন, 'আমি দুঃখিত, মশিয়ে ল্যাম্ব।'

'মশিয়ে ল্যাম্প—কিন্তু ইন্সপেক্টর, আমাকে যেতেই হবে। আপনার সাধ্যও নেই আমাকে এখানে আটকে রাখবার।' ভ্রু নাচাল কুয়াশা।

'আপনাকে গ্রেফতার করা হল।' রাগে গরগর করতে করতে বললেন ইন্সপেক্টর।

'আমার অপরাধ?' ঠাট্টার সুরে বলল কুয়াশা।

'পুলিসের ধারণা এই মহিলার হত্যার সাথে আপনি জড়িত আছেন।'

'পুলিসের ধারণা মানে তো আপনার ধারণা!' কৌতুকে চোখ নাচাতে নাচাতে বলল কুয়াশা।

'যদি তা বলেন তো তাই। সুতরাং আপনাকে…' বাক্যটা শেষ করার সুযোগ পেল না ইন্সপেক্টর। কানের পাশে প্রচণ্ড একটা ঘুসি এসে পড়তেই চেয়ারসুদ্ধ সশব্দে পড়ে গেলেন তিনি। মুখ দিয়ে 'কোঁক' করে একটা শব্দ বেরোল।

দু'পা এগিয়ে ইন্সপেক্টরের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখল কুয়াশা। চেতনা ফিরতে একটু সময় নেবে।

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। গার্ড ঢুকে পড়েছে রুমের মধ্যে। বোধহয় চেয়ার পড়ার শব্দ শুনে। হাতে রাইফেল। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়।

রাইফেল উপেক্ষা করল কুয়াশা। বলল, 'ইন্সপেক্টর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চেয়ার সুদ্ধ পড়ে গেলেন।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গার্ড তাকাল তার দিকে।

'হাঁ করে দেখছেন কি। একটা ডাক্তার ডাকুন। কিন্তু তার আগে ঐ হোঁতকা লোকটাকে তো তুলতে হবে। আসুন দুজন ওকে তুলে নিয়ে যাই। বেঞ্চ টেঞ্চ নিশ্চয়ই দু'একটা আছে কাছে-পিঠে।' অসহিষ্ণু হওয়ার ভান করল কুয়াশা।

একটু ইতস্তত করল গার্ড। রাইফেলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে এগিয়ে গেল ভূপাতিত ইন্সপেক্টরের দিকে কুয়াশাকে পাশ কাটিয়ে। আর সেই মুহূর্তে তার ঘাড়ের পিছনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

একটু পরে সমস্ত কক্ষটাই অন্ধকার হয়ে গেল। সুইচ বোর্ডটার সব ক'টা বোতাম একে একে টিপে দিল কুয়াশা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেটিতে পৌঁছে গেল সে। দিনার্দ হারবার ঘুমে অচেতন। জেটিতে আর ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য জাহাজ। নানা আকারের, নানা আয়তনের।

কুয়াশার ইয়ট 'দি ফগ' জেটি থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে। ভাড়াটে ক্যানোর খোঁজ করল কুয়াশা। পাওয়া গেল না। শহরের দিকে চলল সে হাঁটতে হাঁটতে। হোটেল ডি লা মেয়ারে জন আর্থার ল্যাম্পের নামে তার একটা স্যুইট আছে। কিন্তু সেখানে এখন যাওয়া যাবে না।

দুই

হোটেল ডি এলিসার লাউঞ্জে ব্রেকফাস্টের পর বসেছিল এডিথ গ্রে আর তার বন্ধু কামাল আহমেদ।

ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিল কামাল। এডিথ গ্রে তার পেন ফ্রেণ্ড। দুজনেরই পরস্পরকে দেখবার আগ্রহ ছিল। কিন্তু এতদিন সুযোগ আসেনি। লণ্ডনে কামাল এডিথের খোঁজ করেছিল। সেখানে জানা গেল এডিথ গেছে প্যারিসে। প্যারিসের ঠিকানায় খোঁজ করে কামাল গতকালই এসে পৌঁছেছে। হোটেল রিজে উঠেছে কামাল।

এডিথ সুন্দরী। একুশ-বাইশ বছর বয়স হবে। অথবা কিছু কম। একহারা গড়ন। মজবুত বাঁধুনি। লম্বা মিষ্টি মুখ। চাপা কপাল। চুল আধুনিক ঢঙে ছেলেদের মত করে ছাঁটা। চোখের তারা দুটো ঘন নীল। তাতে বুদ্ধির দীপ্তি।

লাউঞ্জটা শূন্যপ্রায়। এক কোণে বসে নিচু গলায় কথা বলছিল কামাল আর এডিথ। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিল এডিথ। আর লাউঞ্জের দরজার দিকে তাকাচ্ছিল।

কথা বলছিল প্রধানত কামাল। আর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এডিথ।

কামাল বলছিল, 'তোমার আর এথেলের মনের বাসনা পূরণ করতে পারে দুনিয়ায় মাত্র একটি লোক। আর কেউ নয়। পুলিস তো নয়ই।'

'তুমি নিশ্চয়ই তোমাদের দেশের সেই কুয়াশার কথা বলতে চাইছ। কিন্তু তাকে আমি পাচ্ছি কোথায়?'

'সেটাই তো সমস্যা,' কামাল চিন্তাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল। 'তবে যত দূর মনে হয় সে ইংল্যাণ্ডে অথবা কন্টিনেন্টেই আছে। লণ্ডনে ঐ রকম শুনেছিলাম, সে নাকি কিছুদিন আগে জডরেল ব্যাংক অবজারভেটরীতে গিয়েছিল। অথচ তার তখন থাকবার কথা বার্মায়। যাকগে, ওসব ভেবে আর লাভ নেই। এখন আমি তুমি আর এথেল তিনজন মিলে কি করে জো স্টিফেন শয়তানটাকে আর তার অনুচরদের স্যাশ করতে পারি তাই ভেবে দেখতে হবে।'

'তোমার সেই বন্ধু শহীদ খান আমাদের সাহায্য করতে পারে না?'

'অবশ্যই পারে। দরকার হলে তাকে খবর দেব।'

কাউন্টার ক্লার্ক কাছে এসে বলল, 'মাফ করবেন, মিস গ্রে। আপনার টেলিফোন।'

এডিথ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরে এল তখন তার মুখে দুর্ভাবনার ছাপ।

কামাল এডিথের মুখেরদিকে চেয়ে বলল, 'কি হল, এডিথ। কোনও দুঃসংবাদ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। ফগ নামে এক ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে

চান। লাউঞ্জে নয়, আমার রুমে। তিনি নাকি এথেল সম্পর্কে কি একটা সংবাদ দেবেন।'

'কি হয়েছে এথেলের?'

'তা তো বললেন না। বুঝতে পারছি না। কিছু বোধহয় ঘটেছে। সাড়ে আটটায় তো এথেলের এখানে পৌঁছুবার কথা ছিল। এখনও এল না।' চিন্তা-জড়িত গলায় বলল এডিথ। তার গলাটা কেঁপে গেল।

'ভদ্রলোক কখন আসবেন?'

'এখুনি এসে পৌঁছুবেন। চল আমার রুমে।'

'ভদ্রলোক আমার উপস্থিতি পছন্দ না-ও করতে পারেন,' কুণ্ঠিত হয়ে বলল কামাল।

'সে তখন দেখা যাবে।' দুজন ধীরে ধীরে লিফটের দিকে এগোল।

কুয়াশা আরও মিনিট পনের পরে পৌঁছুল। দরজায় আঘাত করতেই ভিতর থেকে এডিথ বলল, 'ভিতরে আসুন।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কুয়াশা। কামাল সেদিনের সংবাদপত্র পড়ছিল। সে মুখ তুলে তাকাল। আর দুজনেই ভীষণ ভাবে চমকাল।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দুজনই অনেকক্ষণ চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। এডিথ কিছু বুঝতে না পেরে একবার আগন্তুক আর একবার কামালের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রথমে কথা বলল কুয়াশাই। ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠল হাসি। 'আমার দৃষ্টিশক্তি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে, তাহলে আমি বলব যে, তোমার নাম কামাল আহমেদ।' কামালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল কুয়াশা।

কামালও হাত বাড়িয়ে দিল কুয়াশার দিকে। কিন্তু তার বাকস্ফূর্তি হল না।

কুয়াশা তার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে বলল, 'কিহে একেবারে চুপসে গেলে যে?' তারপর এডিথের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'জন আর্থার ফগ।'

করমর্দন করে এডিথ বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু।'

'হাউ ডু ইউ ডু।'

সোফা দেখিয়ে দিয়ে এডিথ বলল, 'বসুন, মি. ফগ।'

কামালের বিস্ময় পুরোপুরি কেটে গেছে। সে এডিথকে বলল, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন, বিশ্বাস কর তো এডিথ?'

'কেন বলত?'

'আমরা এতক্ষণ যে লোক সম্পর্কে আলাপ করেছিলাম,' চমকে উঠল এডিথ, 'ইনিই সেই...'

'মানে!' অবাক হয়ে বলল এডিথ।

'হ্যাঁ, ইনিই সেই কুয়াশা।'

বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে এডিথ দেখতে লাগল কুয়াশাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কুয়াশার

শালপ্রাংসু দেহ, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে মুগ্ধ হল এডিথ। মনে হল যেন একটা দিগ্বিজয়ী ব্যক্তিত্ব আর প্রবল পৌরুষ তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে অনুভব করল তার সামনে যেন মাথা আপনা থেকেই নুয়ে আসে। নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হয়। আরও মনে হল, আজ পর্যন্ত যত লোককে সে দেখেছে, তাদের চাইতে ইনি সবদিক থেকে আলাদা। এর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা চলে, ভরসা করা চলে। চোখ বুজে তাকে অনুসরণ করা চলে। পলকহীন দৃষ্টিতে এডিথ মন্ত্রমুগ্ধের মত কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল।

আর সে দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করল কুয়াশা।

আরও আধঘন্টা পার হয়ে গেছে। এডিথ গ্রের দু'গাল বেয়ে তখন অশ্রু ঝরছে। কুয়াশা আর কামাল নীরবে বসে আছে। রুমালে চোখ মুছল এডিথ। কান্না ভেজা গলায় বলল, 'এমনি কিছু একটা হবে আমি জানতাম। ঐ শয়তানটার পিছনে যারা লেগেছে আজ পর্যন্ত তাদের কেউই রেহাই পায়নি। হয়ত···আমিও···' কথাটা শেষ না করেই নীরব হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কুয়াশা, খবরটা পৌঁছে দেবার জন্য। লাশ এখন নিশ্চয়ই পুলিস স্টেশনে?'

মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'পুলিস স্টেশন থেকে হয়ত মর্গে পাঠিয়েছে।'

'পুলিস নিশ্চয়ই আপনার খোঁজ করবে এখন।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু পুলিসকে টেলিফোন করল কে—তাই আমি ভাবছি । যারা গুলি করেছে তারাই অর্থাৎ জো স্টিফেন, না যারা তোমার ক্যানোতে মৃত এথেলকে দেখেছিল?' কামাল চিন্তা জড়িত গলায় বলল।

'আমি জো স্টিফেনকে চিনি না, কিন্তু এমনও তো হতে পারে সে-ই ডিঙি নিয়ে এথেলের খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। আমার নিজের তো তাই ধারণা। সুতরাং সে যাতে কোনরকম সন্দেহে জড়িয়ে না পড়ে তার জন্য পুলিসের কাছে টেলিফোন করে আমার বিরুদ্ধে বলা অস্বাভাবিক নয়। অথবা এমনও হতে পারে, ঐ লোকটা হয়ত আমাকে আগে থেকেই চেনে। সুতরাং এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। কিন্তু কে এই জো স্টিফেন, আর তার সাথে এথেলের কনফ্রন্টেশনের কারণটাই বা কি? অবশ্য ব্যাপারটা যদি গোপনীয় হয় তাহলে বলবার দরকার নেই,' কুয়াশা বলল।

'ব্যাপারটা গোপনীয় অবশ্যই, কিন্তু আপনাকে সব কথাই খুলে বলব। তবে কথা দিন আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।' আকুল আবেদন জানাল এডিথ।

'আমার সাধ্যে কুলালে অবশ্যই করব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

কুয়াশার কণ্ঠের দৃঢ়তায় আশ্বস্ত হল এডিথ। একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, 'তাহলে আমি গোড়া থেকেই বলি। 'আমার বাবা সিডনী

গ্রে আর এথেলের বাবা হেনরী ওয়াকার ছিলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ অফিসার। আপনি হয়ত জানেন প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এক বা একাধিক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জলদস্যুদল গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজের সম্পদ চুরি করে বেড়াচ্ছে। এই র‍্যাকেটগুলোকে ধরবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমার আর এথেলের বাবার উপর।

'যে দস্যুদলটার পিছনে আমার আর এথেলের বাবা লেগেছিলেন, সে দলটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এরা মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন অপহরণ করছে। অথচ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের পুলিস এত বছর ধরে চেষ্টা করেও তাদের সন্ধান পায়নি। বরং যাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তারা সবাই খুন হয়েছে। একজনও রেহাই পায়নি।

'বছর তিনেক আগে আমার আর এথেলের বাবার উপর ঐ র‍্যাকেটটাকে অনুসন্ধানের এসাইনমেন্ট দেওয়া হয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পরিভাষায় ঐ অ্যাসাইনমেন্টের নাম ছিল "অ্যাসাইনমেন্ট উইথ ডেথ।" ওদের পিছনে লেগে কেউ আজ পর্যন্ত রক্ষা পায়নি।

'আমার আর এথেলের বাবাও রক্ষা পাননি। ওঁদের দুজনকে নৃশংসভাবে খুন করে কফিনে করে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়। আমি আর এথেল তখন অক্সফোর্ডে রিসার্চ করছিলাম। আমরা দুজন ছেলেবেলা থেকেই বন্ধু। দুজনই বরাবর এক সঙ্গে থাকতাম। শৈশবে দুজনই মা হারিয়ে হোস্টেলে থেকে মানুষ হয়েছি।

'দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আমরা দুজনই প্রতিজ্ঞা করলাম, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ যেমন করে হোক নিতেই হবে। তাতে নিজের জীবন যদি দিতে হয় দেব।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল এডিথ। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল এডিথের। মাথা নিচু করে উদ্‌গত অশ্রু দমন করে বলল, 'মেসোপটেমিয়া জাহাজের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

মাথা নাড়ল কুয়াশা।

এডিথ বলল, '১৯০১ সালে মালবাহী জাহাজ মেসোপটেমিয়া ডুবে গিয়েছিল লোহিত সাগরে। তাতে ছিল কয়েক কোটি পাউণ্ডের সোনা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফ্রান্সে আসছিল জাহাজটা। বুঝতেই পারছেন, তোলবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ সালে একটা ফরাসী স্যালভেজ কোম্পানি মেসোপটেমিয়ার সিন্দুকে রাখা সম্পদ উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের অনুমতিও পাওয়া যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে স্যালভেজ কোম্পানিটি একটি জাহাজ পাঠায়। কোম্পানির চেয়ারম্যান নিজে উদ্ধার কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্যালভেজ জাহাজ পাঠাবার আগে কোম্পানিটির কাছে তাদের পরিকল্পনা থেকে বিরত হবার জন্য হুঁশিয়ারী জানিয়ে কয়েকটি উড়ো চিঠি

এসেছিল। বলাবাহুল্য, তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি স্যালভেজ কোম্পানি। কিন্তু করলেই ভাল হত। কোম্পানির চেয়ারম্যানসহ প্রায় বিশজন মারা যায় স্যালভেজ জাহাজে এক বিস্ফোরণে। বিস্ফোরণের কারণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

'পরের বছরই আর একটা ঘটনা ঘটে। আমেরিকান স্যালভেজ জাহাজ রোজেনা সিক্স বসফরাসের কাছে গ্র্যাণ্ড ডাচেজ নামে একটি ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধানে যাত্রা করেছিল। গ্র্যাণ্ড ডাচেজ ছিল রাশিয়ার জাহাজ। ডুবেছিল ১৯০৮ সালে। তাতে ছিল তখনকার রাশিয়ার জারের মুকুট ও জার পরিবারের কয়েক লক্ষ পাউণ্ড দামের অলঙ্কার। কিন্তু রোজেনা সিক্স গ্র্যাণ্ড ডাচেজের স্ট্রংরুমে এক ক্যারেট সোনাও পায়নি। মাছ তো আর অলঙ্কার পরে না।

'ক্যারিবিয়ান সীতে ইস্ট অব মার্সের কাছে ডুবে যাওয়া ফেয়ারব্যাংকে জাহাজটির ধনরত্ন তুলে আনতে গিয়েছিল রোজেন সেভেন। ফেয়ারব্যাংকের স্ট্রংরুমও ছিল শূন্য। অথচ তাতে থাকবার কথা ১ কোটি পাউণ্ড দামের সোনা আর ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড দামের আকাটা হীরে। সমস্ত জাহাজ খুঁজেও কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়। এরকম আরও অসংখ্য জাহাজের ধন সম্পদ সমুদ্র তল থেকে উধাও হয়েছে। এর কোনটাই নিশ্চয়ই সাগরের প্রাণীদের কীর্তি নয়।' এডিথ থামল।

অবাক হয়ে শুনছিল কুয়াশা। সমুদ্র তলে যে এই ধরনের লুণ্ঠন চলছে, সে সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা তার ছিল, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে কতকগুলো হীন দস্যু বিপুল সম্পদ করায়ত্ত করে আসছে এতটা সে কখনও ভাবেনি। এই বিপুল অর্থ কুয়াশার হাতে এলে সে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে পারে।

তাছাড়া তার নিজের এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. কোটজে চাঁদের চারদিকে ঘুরছেন তাঁর স্পেস ক্যাপসুলে সামান্য গলদ দেখা দেওয়ায়। তাঁকে সাহায্য করতে হবে। তারজন্য চাই আর একটা স্পেস ক্রাফট। কয়েক কোটি পাউণ্ড লাগবে একটা স্পেস ক্রাফট তৈরি করতে। চীরণ মন্দিরে যে ধনরত্ন সে পেয়েছে মহাশূন্যযান তৈরির জন্য তা নিতান্তই অপ্রতুল। অথচ তিন মাসের মধ্যে ড. কোটজেকে সাহায্য করতে হবে। অন্যথায় তিনি সেখানেই মারা যাবেন। মানবতা আর বিজ্ঞানের অপরিসীম ক্ষতি হবে তাতে।

কুয়াশা সেই কথাটা ভাবছিল। মুখ তুলে দেখল, এডিথ আবেদন ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। কুয়াশা বলল, 'এই র‍্যাকেটটাকে শায়েস্তা করাই তাহলে আপনাদের লক্ষ্য?'

মাথা নাড়ল এডিথ।

'কিন্তু ওরা যে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে সেগুলোর কি হবে?'

'ওদিকটা আমি বা এথেল কখনও ভাবিনি। আমাদের লক্ষ্য বরাবরই একটা।'

'মনে হয় অনেকটা এগিয়েছিলেন আপনারা?' সিগারেট ধরাতে ধরাতে কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'সামান্যই। দেড় বছর ধরে অত্যন্ত সাবধানে এগিয়েছি আমরা। র‍্যাকেটটার পরিচয় সংগ্রহ করতেই তো প্রায় এক বছর লেগেছে। এখানে এসেছি মাস চারেক আগে। আমাদের প্ল্যান ছিল আমি দলপতির সাথে খাতির জমাব। এথেল থাকবে দূরে। একদম ধরাছোঁয়ার বাইরে। রঙ্গমঞ্চে সে আবির্ভূত হবে না। এমন কি আমরা দুজনে দেখাশোনাও করতাম গোপনে। কথা ছিল, যদি আমি ফেঁসে যাই তাহলে সে শেষ চেষ্টা করবে। কিন্তু ফেঁসে গেল এথেলই।'

'দলপতির নামই সম্ভবত জো স্টিফেন?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি জো'র সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছি। হোটেল দ্য দিনার্দে লোকটা মাঝে মাঝে ব্যাকারেট খেলতে যায়। ওর সাথে সেখানেই আলাপ জমিয়েছি। ব্যাকারেট খেলাও শিখতে হয়েছে আমাকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনুসঙ্গিক অনেক নোংরামীও সইতে হয় মাঝে মাঝে। হেরেছিও অনেক। আলাপটা জমে উঠেছে ইদানীং। অবশ্য আমার পক্ষ থেকে প্রবল আগ্রহের ফলেই। আশা করেছিলাম জো আমাকে তার জাহাজে দাওয়াত করবে। কিন্তু ভয়ানক হুঁশিয়ার লোক সে। আমি প্রকারান্তরে প্রস্তাব করেও দেখেছি। চমৎকার ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়। এথেল অধৈর্য হয়ে উঠেছিল দেরি দেখে। সম্ভবত ঝোঁকের মাথায় এথেল কাল নিজেই হানা দিয়েছিল রোজমেরীতে।'

'রোজমেরীতে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল কুয়াশা।

'হ্যাঁ। জো'র ইয়টের নাম রোজমেরী। বিরাট ইয়ট। দেখতে চমৎকার।'

'কিন্তু মিস এডিথ, রোজমেরীতে হানা দিয়ে কিভাবে জোকে স্যাশ করতে পারা যাবে তা তো আমি বুঝতে পারলাম না?' প্রশ্ন করল কুয়াশা।

এডিথ বলল, 'দেখুন আমরা দুজনই নারী। আমাদের পক্ষে বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, জো ও তার দলবলের বিরুদ্ধে এমন অকাট্য প্রমাণ পুলিসকে জানানো যে তারা যেন অতিসহজেই তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে যেতে পারে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে নিজেরাই ওদেরকে শাস্তি দেব। পুলিস তো অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

'আমি কিন্তু পুলিসের সঙ্গ বর্জন করে চলি,' মৃদু হেসে বলল কুয়াশা।

'তাতে আমার আপত্তি নেই। ওদের শায়েস্তা করাই আমার উদ্দেশ্য।'

'আর একটা কথা।'

'বলুন।'

'জো'র কবল থেকে যে ধনরত্ন উদ্ধার করব তাতে আপনার কোনও দাবি থাকবে না।'

'বিলক্ষণ। আমি তো জানি ঐ ধনসম্পদ আপনার ব্যক্তিগত ভোগে লাগবে না। তা মানুষের কল্যাণেই ব্যয় করা হবে।'

আরও আধ ঘন্টা পরে কুয়াশা বিদায় নিল এডিথ ও কামালের কাছ থেকে।

তিন

ইয়টেই লাঞ্চ সারল কুয়াশা। বাইরে কর্মব্যস্ত দুপুর। আকাশে মেঘ জমেছিল সকালের দিকে। এখন বেশ পরিষ্কার। অদূরে নিচে লোকজনের ভিড়। একটা তপ্ত হাওয়া আসছে ডাঙার দিক থেকে। লাঞ্চের পর বাটলার চার্লি হ্যারিস হুইস্কির বোতল আর গ্লাস এনে দিল।

ইশারায় বোতল আর গ্লাস সরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে ডেকের উপর এসে দাঁড়াল কুয়াশা। পাশে যে ইয়টটা ছিল তার নোঙর তুলে ফেলা হচ্ছে। ইয়টের মালিক মোটাসোটা বুড়ো লোক। তিনি চিৎকার করে ক্রুদের নির্দেশ দিচ্ছেন ফরাসী ভাষায়। কুয়াশাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'চললাম। আবার দেখা হবে।' কুয়াশা হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ইয়টটা।

কুয়াশার দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে রোজমেরীর উপর নিক্ষিপ্ত হল। শ'দুয়েক গজ দূরে নোঙর করা আছে রোজমেরী। ডেকের উপর দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। নিচে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে একটা ডিঙি আর একটা মাঝারী আকারের টেণ্ডার।

ইয়ট থেকে দু'জন লোক টেণ্ডারে নামল। একজনকে তার চেনা চেনা মনে হল। গতরাতের সেই অনুসন্ধিৎসু লোকটা। টেণ্ডারটা যাচ্ছে জেটির দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল কুয়াশা। সেলুনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল। নিচে নেমে এসে স্পীড বোটে চাপল। চিৎকার করে চার্লিকে ডেকে বলল, 'ডিনার বাইরেই সেরে নেব, চার্লি।'

টেণ্ডারটা জেটিতে পৌঁছে গেছে। মিনিট দু'য়েক পরে কুয়াশাও গিয়ে পৌঁছুল জেটিতে। এতক্ষণ ধরে সে টেণ্ডারটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওদের অনুসরণ করল কুয়াশা। দু'জন ফিরেও তাকাল না পিছন দিকে।

ওরা দু'জন বীচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। একটা ক্যাসিনোতে গিয়ে ঢুকল। কুয়াশাও ঢুকল একটু পরে। ভিতরে অর্ধ উলঙ্গ নারী-পুরুষের ভিড়। আর আছে রোদে পোড়া চেহারার সেইলার্স। বিচিত্র ভাষায় কিচির-মিচির হচ্ছে। হৈ চৈ চলেছে। সেইলার্সদের বগলদাবা হয়ে বসে আছে কয়েকজন অর্ধ-উলঙ্গ তরুণী। কারণে অকারণে খিলখিল করে হাসছে। সামনের দিকে কোনও টেবিল খালি নেই। ওদের দুজনকে কুয়াশা আবিষ্কার করল পিছন দিকে এক কোণে।

শূন্য টেবিলের সন্ধান করছে এমন একটা ভাব করে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ওদের টেবিলের কাছে গিয়ে পৌঁছুল। খুব কাছে যেতেই চোখাচোখি হয়ে গেল কাল রাতের সেই লোকটার সাথে।

কুয়াশা লক্ষ্য করল লোকটার চেহারায় কেমন একটা ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি আছে। নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে কুয়াশার মুখের দিকে তাকাল লোকটা। তাতে পরিচয়ের কোনও আভাস খুঁজে পেল না সে। কিন্তু হাসি মুখে পরিচয়ের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল। লোকটার এত কাছে গিয়ে পড়েছিল যে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হল না। অথবা, কুয়াশা ভাবল, তাকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছে লোকটার আদৌ ছিল না। নিরুত্তাপ হাসি ফুটিয়ে তুলল লোকটা চোখে-মুখে।

কুয়াশাই কথা বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু।'

'হাউ ডু ইউ ডু।' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে লোকটা সম্ভাষণের জবাব দিল। 'তারপর? আপনার ঝামেলা চুকল?'

'সে আর এমন কি ঝামেলা? পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে এলাম মেয়েটার লাশ। এবার পুলিস বুঝুকগে।' অবজ্ঞার একটা ভাব করল কুয়াশা।

কুয়াশার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পাশের ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। বয়স অবশ্য পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না। দাড়ির জন্য চেহারাটা বানার্ড শ'এর মত দেখায়। চোখ দুটো স্বপ্নালু। সমস্ত মুখটা জুড়ে শিশুসুলভ সারল্য। চেনা-চেনা লাগছিল চেহারা, অথচ ঠিক চিনতে পারছিল না।

কুয়াশার দৃষ্টি অনুসরণ করে লোকটা বলল, 'ইনি প্রফেসর রোজেনবার্গ, আমি জো স্টিফেন। আবাস--রোজমেরী ইয়ট। বসুন না আমাদের সঙ্গে মি.···।'

'ফগ।' অবলীলাক্রমে জবাব দিল কুয়াশা। 'আর্নেস্ট হ্যারল্ড ফগ; আমার বাসস্থানও একটা ইয়ট। নাম--দি ফগ। আমিও আপনার মত জলচর।'

'হুইস্কি না বিয়ার?'

'হুইস্কি।'

ওয়েটারকে অর্ডার দিল জো। সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল কুয়াশার দিকে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে ভাবছিল প্রফেসর রোজেনবার্গের কথা। এখন তার মনে পড়েছে ভদ্রলোক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওশানোলজিস্ট। গতবছর জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল ডীপ-সী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেখানেই সে দেখেছে প্রফেসরকে। সমুদ্রের মতই অসীম পাণ্ডিত্য ভদ্রলোকের। গতবছরই তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের পাঁচ হাজার ফুট নিচে নেমে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। সাগর তলে অত নিচে মানুষের অবতরণ সেই প্রথম। সর্বশেষ ডীপ-সী কস্ট্যুমও তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু জো স্টিফেনের সাথে তাঁর সম্পর্ক কি?

কুয়াশা সেটাই ভাবতে ভাবতে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল, 'অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন, প্রফেসর। আপনিই তো পাঁচ হাজার ফুট পানির নিচে নেমেছিলেন? নিশ্চয়ই আপনার অভিযান অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ছিল?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা ভুল করে বড্ড অসুবিধায় পড়েছিলাম।

জানেন তো সাগরের অত নিচে তাপ মাত্রা অত্যন্ত কম। পাঁচ হাজার ফুট পানির নিচে তাপ মাত্রা হিমাংকের সামান্য উপরে থাকে। শীতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড়। অথচ আমি পানির চাপ, আলো আর বাতাসের ব্যবস্থা করতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ঠাণ্ডার কথাটা আমার খেয়ালই হয়নি। শীতে তো আমার জমে যাবার অবস্থা। তবে এবারে আমি আমার বাথিস্টলটাকে আরও উন্নত করেছি। তাতে বৈদ্যুতিক উত্তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকবে। ঠাণ্ডায় আর কষ্ট পেতে হবে না।'

'তাহলে আপনি আবার সমুদ্রের তলে নামছেন?' আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গি করল কুয়াশা।

'নিশ্চয়ই। এই তো সবেমাত্র শুরু। প্রথম অভিযান তো বলতে গেলে স্রেফ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল। আমার নতুন বাথিস্টলে করে পাঁচ হাজার ফুট কেন তার দ্বিগুণ এমন কি তিন চার গুণ পর্যন্ত নামা চলবে! আর এতে যে ধাতুগুলো ব্যবহার করেছি তা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে সমুদ্র তলে পাঁচ মাইল পর্যন্ত নামা যাবে।' উচ্ছল হয়ে উঠল প্রফেসরের স্বপ্নালু দুটি চোখ।

'কিন্তু প্রফেসর, সমুদ্রের অত নিচে নেমে কি দেখবেন বলে আশা করেন?'

উৎসুক শ্রোতা পেয়ে খুশি হলেন প্রফেসর। সোৎসাহে বললেন, 'সমুদ্র তলের জীবনটাকে জানাই আমার প্রধান লক্ষ্য। মানুষ জানতে চায় আর জয় করতে চায়। চাঁদকে আমরা প্রায় জয় করে ফেলেছি। অথচ আমাদের নিজেদের গ্রহটা সম্পর্কে কতটা জেনেছি? কিন্তু মানবতার কল্যাণের জন্য আমাদের তো এই গ্রহটাকে জানতে হবে। হয়ত এমন হতে পারে যে সমুদ্রতলের সম্পদকে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করতে পারব আমরা একদিন।'

'তাহলে তো আপনার অভিযান অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।'

'কিন্তু বড্ড ব্যয় সাপেক্ষ।' আক্ষেপ করলেন প্রফেসর। 'আসলে মি. স্টিফেন আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে সমস্ত সম্ভাবনা অর্থহীন হয়ে পড়ত। প্রথমবার সমুদ্রে নামবার খরচ বইতে গিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। এখন উনিই আমার একমাত্র ভরসা। ওঁর উপর নির্ভর করেই আমি দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' জো'র প্রতি কৃতজ্ঞতায় অধ্যাপকের গলাটা বুজে এল।

কুয়াশা হাসল না। সমুদ্রতলের গবেষণা চালাবার বিপুল সম্ভাবনার অন্তরালে জো'র যে দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে প্রফেসর রোজেনবার্গ তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারবেন না।

কুয়াশা জানে, স্টিফেন নামক শয়তানটা তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে। তার প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া সে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। অথচ বাইরে নির্বিকার নিরাসক্ত ভাব বজায় রাখছে নিপুণ ভাবে।

ক্যামেরা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক হঠাৎ উপস্থিত হল। টেবিলের উপর একটা কার্ড রেখে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার মাথাটা চাই প্রফেসর।'

'ক্যামেরা কি ছুরি, মশিয়ে? তা দিয়ে কি মাথা কাটা যায়?' হেসে উঠলেন প্রফেসর।

কুয়াশা দেখল, কার্ডটাতে লেখা আছে জিম প্যাটারসন। ফটোগ্রাফার, আমেরিকান প্রেস ট্রাস্ট।

ফটোগ্রাফার হেসে উঠল। ক্লিক ক্লিক করে কয়েকটা ছবি তুলে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল ফটোগ্রাফার।

জো এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সে হঠাৎ বলল, 'মি. ফগ, এইসব সমুদ্র সম্পর্কিত ব্যাপারে আপনার উৎসাহ আছে বলে মনে হচ্ছে?'

'নেই একথাও জোর দিয়ে বলব না, আবার আগ্রহটা তেমন প্রবল একথাও ঠিক নয়,' মৃদু হেসে বলল কুয়াশা।

'যদি উৎসাহ থাকে তাহলে আসুন না আমাদের সাথে। শিগগিরই আমরা একটা ট্রায়াল দেব রডরিক দ্বীপের কাছে। ওখানে অবশ্য পানি বেশি নেই। মাত্র ৯০ ফ্যাদম। তবুও প্রাথমিক ট্রায়াল দেয়া যাবে। তাই না, মি· প্রফেসর?' একঘেয়ে ধাতব গলায় বলল জো।

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।' সোৎসাহে প্রফেসর বললেন। 'আরে আসুন না আপনিও। দেখবেন ভারি ইন্টারেস্টিং।'

কুয়াশা খুশির ভান করে বলল, 'এরকম দাওয়াত হরহামেশা আসে না। তবে আপনাদের কোনও অসুবিধা···।' কথাটা সে শেষ করল না।

'মোটেই না, মোটেই না,' প্রফেসর উত্তেজিত হয়ে বললেন।

ওয়েটারকে বিল চুকিয়ে দিল জো।

ঘড়ি দেখে বলল, 'আমরা এবারে উঠব, মি· ফগ। সামান্য কাজ আছে। যথাসময়ে আপনাকে খবর দেব।' উঠে হাত বাড়িয়ে দিল জো। সাপের শরীরের মত ঠাণ্ডা আর তুলতুলে জো'র হাতটা। ঘামে ভেজা। ঘিন ঘিন করে উঠল কুয়াশার সর্বাঙ্গ।

প্রফেসরের সাথেও করমর্দন করল কুয়াশা। সে হাতে আছে হৃদয়ের উত্তাপ। যাবার সময় আবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'আসছেন কিন্তু আপনি আমাদের অভিযানে।'

কুয়াশা তাকে আশ্বাস দিল। 'নিশ্চয়ই যাব, প্রফেসর।'

প্রফেসর ও জো চলে যেতেই কুয়াশা দ্বিতীয় দফা ড্রিংকের অর্ডার দিল। পরবর্তী কর্মপন্থা চিন্তা করতে লাগল সিগারেট ধরিয়ে। প্রথম পর্ব ভালয় ভালয় চুকে গেছে। জো'র সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে।

জো'র চরিত্র উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়নি কুয়াশার। ওর আপাত নির্বিকারত্বের অন্তরালে যে সাংঘাতিক একটা ক্রিমিনাল মন আছে, অনায়াসে তা আবিষ্কার করেছে সে। অন্যপক্ষে সে-ও জানে, জো'ও তাকে আবিষ্কার করেছে।

স্রেফ মস্করা করার জন্য জো থানায় টেলিফোন করেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাতে নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছে জো, আর সেজন্যেই এবারে অব্যর্থ টোপ ফেলেছে সে। জো জানে গভীর সমুদ্রে প্রফেসর রোজেনবার্গ যে পরীক্ষা চালাবেন তা দেখতে যদি তাকে আমন্ত্রণ করা হয় তাহলে সে তা গ্রহণ করবেই। আর একবার নিজের এলাকায় পেলে জো তার মোকাবেলায় নামবে। মনে মনে হাসল কুয়াশা। জো'র সাহসের আর বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতে হয়। কৌশলটা জো ভালোই করেছে।

বিল মিটিয়ে দিয়ে পথে নামল কুয়াশা। ট্যাক্সি খোঁজ করতে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বিচিত্র অনুভূতি হল কুয়াশার। মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। সে আবার মনে মনে তারিফ করল জো'র। লোকটা সত্যিই করিৎকর্মা। এরই মধ্যে পিছনে লেজ লাগিয়ে দিয়েছে। কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে।

দু-তিনটে মোড় ঘুরল কুয়াশা। এদিকটা ভিড় একটু বেশি। একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। শো উইণ্ডোর মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি দেখল মদের বোতল বগলে করে এক হিপ্পি বাবাজী আসছে। লোকটার চুল লম্বা। পোশাক কিম্ভূতকিমাকার।

লোকটাকে কুয়াশা অনায়াসে শায়েস্তা করতে পারে। কিন্তু সেজন্য যে নাটকীয় আচরণের প্রয়োজন হবে এখন তা করা উচিত হবে না। অনুসরণকারীকে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া চলবে না যে সে টের পেয়ে গেছে।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটায় ঢুকল কুয়াশা। একটা আই ব্রাউ পেন্সিল কিনে আবার পথে নামল। হিপ্পিবাবাজী তখন আকাশের অদৃশ্য তারার দিকে চেয়ে আছে।

আবার হাঁটতে শুরু করল কুয়াশা। এদিকটায় ভিড় বড্ডো বেশি। সুবিধেই হল তাতে কুয়াশার। সামনেই একটা সিনেমা হাউজের ভিতর ঢুকে গেল সে। টিকেট কিনে ঢুকে গেল হলের মধ্যে। পর্দায় তখন বেধড়ক মারপিট হচ্ছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে সাদা আদমীদের কি ভীষণ লড়াই। মিনিট পাঁচেক পরে কুয়াশা বেরিয়ে এল হল থেকে। লাউঞ্জ অতিক্রম করে গেটের দিকে এগোতেই কুয়াশা অপাঙ্গে দেখল হিপ্পিরত্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সিনেমা হাউজের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আছে।

কুয়াশার মুখের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল লোকটা। কুয়াশা আরও এগিয়ে এসে সোজাসুজি তাকাল লোকটার দিকে। বুঝল হতাশ হয়েছে লোকটা। আইব্রাউ পেন্সিল বেঁচে থাক।

হিপ্পিটার নাকের ডগা দিয়েই পেভমেন্টের উপর নামল কুয়াশা।

চার

নিজের রুমের মধ্যে অস্থির পদচারণা করছিল এডিথ। অবশেষে জো তাকে আমন্ত্রণ করেছে রোজমেরীতে। যে আমন্ত্রণের আশায় দিন গুণছিল সে দীর্ঘকাল ধরে। সেই প্রত্যাশিত আমন্ত্রণ এসেছে এতদিন পরে। অথচ এখন আর এ আমন্ত্রণের কোনও মানেই হয় না।

এডিথ জানে রোজমেরী ইয়টেই আছে জো'র মারণ কাঠি। এতদিন ধরে সে সেই মারণ কাঠি আবিষ্কার করে পুলিসের হাতে তুলে দেবার কথা ভেবেছে। যে মারণ কাঠির সন্ধান করতে গিয়ে এথেলকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। হয়ত তাকেও নিজের প্রাণ দিতে হত—হয়ত দিতে হবে। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে কুয়াশা যখন দিগন্তে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও ক্ষতি নেই।

অথচ উপায় নেই, যেতেই হবে রোজমেরীতে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে সে। এড়িয়ে যাবার পথও ছিল না। নিজে যেচে অতীতে যে আমন্ত্রণ ভিক্ষা করেছে, এখন তা সে প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? তাছাড়া জো নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করেছে, আর সেই সন্দেহ ভঞ্জনই হয়ত এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে না গেলে জো'র সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হবে।

এই অবস্থায় সে কি করবে, ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছে না।

টেলিফোন বেজে উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার ধরল এডিথ। 'হ্যালো···অ্যাঁ···মি· ফগ?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল এডিথের মুখ। 'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন ওঁকে।'

রিসিভারটা রেখে দিল সে। কুয়াশা এসেছেন। তিনি নিশ্চয়ই এডিথের বর্তমান দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারবেন।

মিনিট খানেক পরে আস্তে আস্তে টোকা পড়ল দরজায়, হাসিমুখে খুলল এডিথ। 'আসুন'।

হাসিমুখে ঢুকল কুয়াশা। এডিথের হাসিমাখা মুখের অন্তরালে যে চিন্তার রেখা ছিল তা কুয়াশার নজর এড়ায়নি। সে বসতে বসতে বলল, 'খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?'

এডিথ তার সমস্যার কথা খুলে বলল। কুয়াশা বলল, 'এক্ষেত্রে আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে। আর সম্ভব হলে ওদের বিরুদ্ধে কোনও দলিলপত্র পেলে তা লুকিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।'

'কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে।'

'ভয় করলে তো চলবে না এখন, মিস গ্রে। তবে খুব সাবধান। আপনাকে ওরা সন্দেহ করেছে। নিচে লাউঞ্জে জো'র লোক বসে আছে। আপনার গতিবিধি

ওরা লক্ষ্য করছে। সম্ভবত আগে থেকেই লক্ষ্য করে আসছে।'

এডিথ চমকাল। তার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল।

কুয়াশা বলল, 'মিস গ্রে, আমাদের বন্ধুটি অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক। প্রখর তার বুদ্ধিমত্তা। সে কোনও ব্যাপারে ঝুঁকি নেয় না। মুহূর্তের জন্যেও অসর্তক হয় না। প্রতিটি পা ফেলে গুণে গুণে।'

একটু হাসল কুয়াশা। 'হয়ত অবাক হবেন। আমার পিছনেও লেগেছিল জো'র লোক। অবশ্য সহজেই তাকে এড়াতে পেরেছি।'

'আপনার পিছনেও লোক লাগিয়েছে? এত শিগগির!' অবাক হল এডিথ।

দুপুরের ঘটনা বর্ণনা করল কুয়াশা। এডিথ নীরবে শুনল। কুয়াশা বলল, 'শিগগিরই অভিযানে বেরোচ্ছে জো। এবার তার লক্ষ্য হল নরউইচ নামে একটা জাহাজ! আর যাবার আগে জো তার শত্রুদের খতম করে যেতে চায়।' বলতে বলতে একটা পত্রিকার কাটিং বের করল কুয়াশা পকেট থেকে।

কাটিংটা হাতে নিয়ে পড়ল এডিথ। ছোট একটা খবর। 'আগামী বসন্তে বৃটিশ স্যালভেজ জাহাজ প্লিমাউথ জিব্রাল্টারের কাছে নরউইচ জাহাজের সম্পদ উদ্ধার করতে যাবে। নরউইচ ১৯২৯ সালে ডুবেছিল। জাহাজটার স্ট্রংরুমে তিন কোটি পাউণ্ডের আকাটা হীরে আছে। সাম্প্রতিককালে এটা এই ধরনের বৃহত্তম অভিযান।'

পড়া শেষ করে এডিথ কুয়াশার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'বুঝতেই পারছেন, প্লিমাউথ রওনা দেবার আগেই জো সেখানে লুটপাট সমাপ্ত করবে।'

'কিন্তু,' কুয়াশা দৃঢ় স্বরে বলল। 'তার আগেই জো'র লীলাখেলা শেষ হবে। কিন্তু তার আগে জানতে হবে জো তার ধনসম্পদ কোথায় রেখেছে। সেই অনুসন্ধানের ভারও আপনার।'

পাঁচ

দিনার্দ পোতাশ্রয়ে রাত নেমেছে। আকাশ ভর্তি মেঘ। চোখের সামনে না আনলে নিজের হাতটাও ভাল করে দেখা যায় না। সমুদ্রের বুক নিকষ কালো। শুধু জাহাজগুলোর রাইডিং লাইট তার চার পাশের সামান্য এলাকা আলোকিত করে রাখছে অন্ধকারের সাথে জোর সংগ্রাম করে।

নিঃশব্দে কুয়াশা দি ফগ থেকে সমুদ্রে নামল। চারদিকে বৃত্তাকারে ক্ষুদ্র ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। ডেকে ম্লান আলোর সীমানা অতিক্রম করল দ্রুত। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে নিঃশব্দে পানি কেটে চলল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে তার মাথাটাও মিশে গিয়েছে। সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলেছে রোজমেরীর দিকে।

রোজমেরীর আশপাশে এসে পড়েছে কুয়াশা। রাইডিং লাইটের অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে তার চোখে মুখে। বুক ভরে দম নিয়ে ডুব দিল কুয়াশা। কিছুক্ষণ

পরে ভেসে উঠল রোজমেরীর পাশে।

চুপ করে অনেকগুলো মুহূর্ত কাটিয়ে দিল সেখানে। চাঞ্চল্যের কোনও লক্ষণ রোজমেরীতে আছে বলে তার মনে হল না। এদিকটা জাহাজের সম্মুখ ভাগ। পাশে পরপর তিনটে পোর্টহোল। তার ভিতর দিয়ে বৃত্তাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বাইরের অন্ধকারের মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে পোর্টহোল দিয়ে। কিন্তু ডেক থেকে কোনও শব্দ আসছে না। অস্পষ্ট কোনও শব্দও আসছে না সেখান থেকে। ঘড়ি দেখে পুরো তিন মিনিট অপেক্ষা করল কুয়াশা সেখানে। অবশেষে তার মতো বেআইনী আগন্তুকের জন্য রোজমেরী কর্তৃপক্ষ কোনও আয়োজন করেনি বলে ধারণা হল তার।

প্রথম পোর্টহোলটার দিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। পোর্টহোলের ঠিক নিচে পৌঁছে হাতড়ে হাতড়ে আঙুল রাখবার স্থান করে নিল। তারপর ধীরে অতি ধীরে সন্তর্পণে তার শরীরটাকে একটু একটু করে তুলল, যতক্ষণ না পোর্টহোলের রিমের মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টি ভেতরে পৌঁছুল।

বিরাট একটা কেবিন। সম্ভবত প্রস্থে ইয়টের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে। চারটে বাংক কেবিনটাতে। একজন একটা বাংকে ঘুমোচ্ছে। এক কোণে একটা টেবিল। সেখানে টাইপ করছে একজন। একজন ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে। তার বুকের উপর একটা পত্রিকা। পাশের চেয়ারে বসে একটা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে সেই হিপ্পি প্রবর। কেবিনের ঠিক মাঝখানে বড় একটা টেবিল ঘিরে বসে চারজন তাস পিটছে। কেবিনের প্রত্যেকটা লোকের চেহারার মধ্যে একটা ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে, তা হল এই যে, প্রত্যেকের মুখে একটা ক্রুরতার ছাপ বিদ্যমান। শুধু হিপ্পিটাকে অন্যরকম মনে হল কুয়াশার। সম্ভবত নতুন রিক্রুট। পেশায় এখনও পাকা হয়নি।

দ্বিতীয় পোর্টহোলটার কাছে গেল কুয়াশা। চোখের উপর ভেসে উঠল হুইল হাউজ। অবাক হল কুয়াশা। শুধু হুইল হাউজই নয়, সুসজ্জিত একটা লিভিংরুম। যে কোনও কোটিপতির লিভিংরুমের মতই স্বাচ্ছন্দ্যকর। রুমটাতে জো স্টিফেনের রুচির পরিচয়ও পাওয়া যায়। একপাশে পরপর দুটো উঁচু বুক কেসে বই ঠাসা। তার উল্টোদিকে ডিভান। এককোণে একটা উঁচু টেবিল। একটা লোক টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে, আর মাঝে মাঝে সামনের দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল দেয়ালে ভূমধ্যসাগরের একটা মানচিত্র টাঙানো আছে।

তৃতীয় পোর্টহোলটার কাছে এগোতেই গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রফেসর রোজেনবার্গ কথা বলছেন। সম্ভবত সাগর তলের অভিজ্ঞতা বর্ণনার শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছেন তিনি। কুয়াশার কানে গেল···'মাছটা যখন কাঁচের গায়ে নাক ঘষছিল তখন তার মুখে যে ক্রোধের ছাপ দেখলাম তা দেখলে, মিস এডিথ,

আপনি ভয়ে মূর্ছা যেতেন।'

হাসির তরঙ্গ উঠল। তার মধ্য দিয়ে জো'র কর্কশ ধাতব কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এর পরেও সমুদ্রে নামতে তোমার উৎসাহ হচ্ছে না ডসন?'

'উঁহু, বিন্দুমাত্র না। মাছের রাগ দেখবার সাধ আমার কোনও কালেই ছিল না। উপর থেকে মাছ ধরাই আমার পছন্দ। আপনি কি বলেন, মিস গ্রে।'

'আমি আর কি বলব? মূর্ছা যেতে আমি কিছুতেই রাজি নই। অবশ্য সমুদ্রের তলা দেখতে কার না ইচ্ছে জাগে?' চোখ নাচিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল এডিথ।

আবার হাসির হররা বয়ে গেল। ডসন নামের লোকটাকে দেখতে পেল না কুয়াশা।

আরও পিছনের দিকে এগোতেই দেখল একটা ক্যানো দ্রুতগতিতে রোজমেরীর দিকে এগোচ্ছে। নিশ্চুপ হয়ে মাথাটাকে খোলের সাথে মিশিয়ে দিল। কিন্তু ক্যানোটা রোজমেরীর গায়ে গিয়ে থামল না। পিছনের দিকে গিয়ে সাঁ করে ঘুরে গেল জাহাজটার উল্টো দিকে। ক্যানোর শব্দটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু কুয়াশা আর একটু এগোতেই শোনা গেল ক্যানোর শব্দটা। ক্যানোটা জাহাজটাকে ঘুরে এল। এবার আরও কাছে এগিয়ে গেল ক্যানোটা। জাহাজের আলোতে দেখল, ক্যানোতে একমাত্র আরোহী তার পরিচিত। সে আর কেউ নয় কামাল।

ভীষণ বিরক্ত হল কামালের বোকামিতে। ছেলেটা সব কিছু পণ্ড করতে চলেছে। জো ও তার অনুচরদের সতর্ক দৃষ্টি এড়ানো কামালের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এই হঠকারিতার দরকারই বা কি ছিল? কিন্তু এখন আর ওকে সতর্ক করতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাতে দুজনই ধরা পড়বে।

আর একবার চক্কর দিল ক্যানোটা। কুয়াশা অসহায়ের মত অপেক্ষা করতে লাগল। আর শোনা গেল না ক্যানোর শব্দটা। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুয়াশা সাঁতার দিতে শুরু করল। সমস্তটা ইয়ট ঘুরে এল আবার সম্মুখভাগে।

পরিবেশটা শান্ত। বেশ একটা উদ্বেগহীন পরিবেশ সমস্তটা ইয়ট জুড়ে। সম্ভবত গতরাতের আগন্তুকের মৃত্যু ও সম্ভাব্য অপর অতিথি সরকারীভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে আসায় সবাই নিশ্চিন্ত। মাস্কটা একটু তুলে ডেকটা পর্যবেক্ষণ করল কুয়াশা। কোমরের পাউচ থেকে বের করল ছোট একখণ্ড পাথর। ডেক হাউজের গায়ে ছুঁড়ে মারল পাথরটা। টং করে পড়ল। মাথাটা নিচু করল কুয়াশা। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কেউ এল না শব্দের উৎসের সন্ধানে।

নিশ্চিন্ত হল কুয়াশা। ডেকের অন্তত এদিকটায় কেউ নেই। বিড়ালের মত স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়ে ডেকে উঠল কুয়াশা। কোনও শব্দ হল না। ডেকের এদিকটা আলোকিত আর উন্মুক্ত। সেই আলোকিত স্থানে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল কামালকে। পরমুহূর্তেই ডেক হাউজের অন্ধকার কোণটাতে মিলিয়ে গেল।

ডেক হাউজের কোণের অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মিনিট।

একটু দূরে কেবিনের ভিতর থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে। নিচের ক্রুদের কক্ষ থেকে ধাতব একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ডাইনে বাঁয়ে আবার তাকাল কুয়াশা। না কেউ নেই। এবারে এগোনো যেতে পারে, ফিসফিস করে নিজেকেই বলল কুয়াশা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কেবিনের শেষ প্রান্তের দরজাটা খুলে গেল। পদশব্দ কানে গেল তার। তার দিকেই এগিয়ে আসছে কে যেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। পদশব্দটা এবার থেমে গেল। আর পরমুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠল সমগ্র ডেকটা। কুয়াশা নিজেকে আলোর নিচে আবিষ্কার করল। অন্ধকার স্থানের খোঁজে সে চারদিক তাকাতে লাগল। বেশ কয়েক হাত দূরে একটা অন্ধকার কোণ আছে। কিন্তু সেখানটায় পৌঁছুবার আগেই ধরা পড়ে যাবে কুয়াশা।

কোমরবন্ধের ওয়াটার প্রুফ পাউচটার দিকে হাত চলে গেল কুয়াশার। পরমুহূর্তেই তার হাতে চকচক করে উঠল নীল রঙের একটা রিভলভার। কিন্তু কাউকে আসতে দেখা গেল না। সম্ভবত শুধুমাত্র অন্ধকার দূর করার জন্যই জ্বালা হয়েছে ঐ বাতিটা, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নয়। সেটাও টের পাওয়া গেল পরক্ষণেই। কিন্তু পদশব্দটা আবার এগিয়ে আসছে। খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখুনি ধরা পড়বে সে। জো'র গলা তার কানে এল। কাকে যেন সে ডেকের বাতির মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে।

এখুনি ধরা পড়ে যাবে কুয়াশা। উপরের দিকে তাকাল সে। হাত দুটো ঠেকল ডেক হাউসের ছাদে। পরের সেকেণ্ডে সে ছাদে গিয়ে উঠল। নিঃশব্দে ছাদের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে এক প্রান্ত দিয়ে নিচের দিকে চোখ পাতল।

জো'ই আসছে। তার পিছনে এডিথ। তার কাছেই আলোর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছে জো। ডেক হাউসের পাশ দিয়ে পিছনের দিকে চলে গেল দুজন।

ছয়

সমস্তটা সন্ধ্যা জো বিনয় ও সৌজন্যের অবতার সেজে বসে রইল। নিরুত্তাপ আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সে সম্বর্ধনা জানাল এডিথকে। প্রফেসর রোজেনবার্গ আর ডানকান ডসনের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। গোড়ার দিকে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি এডিথের মনটাকে পীড়িত করে রেখেছিল। জো'র আনুষ্ঠানিক সৌজন্য সেই অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পাকা অভিনেত্রীর মত মনের ভাব চেপে রাখতে পারায় নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা বেড়ে গেল তার।

এডিথ মেপে হাসল, মেপে কাশল। অবাক হওয়ার ভান করল, মাঝে মধ্যে আবদার করল। কিন্তু অস্বস্তিটাকে দূর করতে পারল না। প্রফেসর শুধু প্রতিভাধর

বিজ্ঞানীই নন চমৎকার হাসির গল্পও করতে পারেন। কথা বলবার এমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গি আছে যা তাঁর চারপাশে একটা প্রীতিকর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তিনি ডিনারের পর অপেক্ষা করলেন না বেশিক্ষণ। আগামীকাল সকাল দশটায় জিওগ্রাফী সোসাইটিতে তাঁর লেকচার হবে, সেই জন্যে প্রস্তুতি নিতে গেলেন তিনি। যাবার সময় বারবার বলে গেলেন, 'মিস গ্রে, আমার বক্তৃতা শুনতে গেলে আনন্দিত হব।'

আমন্ত্রণ পেয়ে আন্তরিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করল এডিথ।

এডিথ জানত, যে মুহূর্তে সে ইয়টে পা দিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই জো আর ডসন তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে আর তার প্রত্যেকটি আচরণ দুজন চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। অথচ তারা দুজনই তার সঙ্গে যে আচরণ করছে তাতে তার প্রতি রানী এলিজাবেথেরও ঈর্ষান্বিত হওয়া বিচিত্র নয়।

আসলে এ যেন সেই ইঁদুর শাবকের সাথে শিকারী বেড়ালের গল্পের মত। দুটো বিড়াল তাকে দুদিক থেকে তাড়া করে ফিরছে। ওকে নিয়ে যেন এক মনস্তাত্ত্বিক খেলায় মেতে উঠেছে জো আর ডসন।

ডসন লোকটাকে দেখে সর্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করছিল এডিথের। বিশ্রী রকমের মোটা আর বেঁটে। মাথা কামানো। অল্প অল্প সাদা ভ্রূ। দাড়িগোঁফ গজায়নি বোধহয়। ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দের মত কণ্ঠস্বর। থ্যাবড়া নাকটার পাশে আধইঞ্চি পরিমাণ গভীর গর্তে মুখটাকে ভয়ঙ্কর দেখায়। পিটপিটে দুটো চোখে নেকড়ের মত হিংস্র দৃষ্টি।

প্রফেসর বিদায় নিতেই জো উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল এডিথ, ডেকে যাই আমরা।'

এডিথ উঠল। জো'র পিছন পিছন ডেকের দিকে এগোল এডিথ। ডেকটা অন্ধকার। বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বাতির মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে করতে জো এগিয়ে গেল। জো'র একটা কথাও তার কানে গেল না। দুজন এসে পড়ল পেছনের ডেকে।

হাতের সিগারেট সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জো বলল, 'কেমন লাগছে, এডিথ?' জো'র ধাতব একঘেয়ে কণ্ঠে নতুন একটা সুর বেজে উঠল যেন।

'চমৎকার জো, চমৎকার তোমার ইয়ট।'

'শুধু ইয়টটাই চমৎকার লাগল?' এডিথের ঘাড়ে হাত রাখল জো। এই প্রথম স্পর্শ। ঠাণ্ডা ভেজা তুলতুলে হাতটার স্পর্শে শির শির করে উঠল এডিথের সর্বাঙ্গ।

দেহের শিরশিরানি জো টের পেল কিনা এডিথ তাই অনুধাবনের চেষ্টা করল। তার কথার জবাব দিল না।

জো বলল, 'তুমি যে আমার ইয়টে এসেছ এ তো আমার পরম সৌভাগ্য, এডিথ ডিয়ার। বড় চমৎকার কাটল আজকের সন্ধ্যাটা। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে

এ এক স্মরণীয় দিন। জান, এডিথ, নিঃসঙ্গ জীবন বড় পীড়াদায়ক।' একঘেয়ে সুরে জো বলে গেল ধাতব উচ্চারণে। হাসি চাপল এডিথ। আবেগহীন কণ্ঠে আবেগ মেশালে তার প্রকাশ যে হাস্যকর হয়ে ওঠে ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী জো বোধহয় তা কখনও অনুধাবনের চেষ্টা করেনি।

'তুমি বড্ড একা, জো। তাই না?'

'বড্ড একা আমি।'

'কিন্তু একাকীত্ব থেকে মুক্তিলাভ তো তোমার নিজের উপরই নির্ভর করে। তুমি, যাকে সবাই বলে বড়লোক, লাখপতি অথবা কোটিপতি। এতবড় একটা ইয়টের মালিক। হয়ত আরও অনেক সম্পত্তি তোমার আছে। আর দুনিয়াটা তো তোমার মত ধনীর ইচ্ছা অনুসারে চলে। তুমি ইচ্ছে করলে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীকে এনে তোমার একাকীত্ব ঘোচাতে পার।'

হাসির শব্দ শোনা গেল। জো হাসছে।

অবাক হল এডিথ জো'কে শব্দ করে হাসতে দেখে। কিন্তু হাসির কথা এডিথ কি বলেছে তা সে ভেবে পেল না।

জো বলল, 'মনে হচ্ছে আমার টাকাকড়িতে তোমার হিংসে হচ্ছে। কিন্তু তোমার কথা ঠিক এডিথ। অফুরন্ত আমার সম্পদ। আমি যে কতটা ধনী তা বললে হয়ত তুমি আমাকে উন্মাদ মনে করবে। ইচ্ছে করলে আমি কয়েকশ' সুন্দরী স্ত্রী লোক এনে ইয়ট ভরে ফেলতে পারি। জান তো যে কোটিপতি দুহাতে পয়সা ব্যয় করতে পারে তার আকর্ষণ মধুর; কিন্তু কোনদিনই আমি তা করিনি । তোমার আগে কোনও নারী এই জাহাজে ওঠেনি।'

জো'র কালো চোখের দৃষ্টি ঘনীভূত হয়ে উঠল। এডিথের হঠাৎ মনে হল, সবটাই কি অভিনয়? হয়ত মর্মমূল থেকেই জো'র কথাগুলো বেরিয়ে আসছে। অথচ ধাতব একঘেয়ে উত্তাপহীন কণ্ঠে, আবেগ সঞ্চারের প্রয়াস কি হাস্যকর। আর এই প্রেম নিবেদনের ফাঁকে ফাঁকেও সেই নিরুত্তাপ পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

'আমার পরম সৌভাগ্য, জো। কিন্তু কারণটা কি নারী বর্জনের এই সংযম আর কঠোরতার? প্রেমে ব্যর্থতা?'

'না এডিথ। জীবনে প্রেমই আমি কখনও করিনি। ব্যর্থতার প্রশ্ন তাই ওঠে না। তুমি—তুমিই প্রথম নারী যার কাছে আমি বোকা হয়ে গেছি। তুমি আমার ইয়ট দেখতে চেয়েছিলে। এটা তোমার কাছে সামান্য কৌতূহল, একটু আনন্দ, একটু চিত্তবিনোদন মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। কালকেই হয়ত ভুলে যাবে। কিন্তু আমার কাছে এই তো সবে শুরু। তোমাকে ইয়টে নিয়ে এসে আমি আমার সারাজীবনের আইন ভঙ্গ করলাম। কেন, তা তুমি বুঝতে পার না, এডিথ?'

জো এডিথের কোমরের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল এডিথ। বলল, 'এমন তো হতে পারে যে তুমি

সকালেই মত পাল্টাবে। নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য আফসোস করবে।'

জো এগিয়ে এসে তাকে কাছে টেনে নিল। জো'র ঠোঁট দুটো তার ঠোঁট স্পর্শ করার আগেই ঘৃণায় চোখ বন্ধ করল এডিথ। রবারের মত মুখ জো'র। ঠাণ্ডা। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল এডিথের। অনেকক্ষণ পর ছেড়ে দিল তাকে। তখন জো'র চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে।

একটু পরেই জো আবেদন জানাল, 'তুমি থাকবে তো, এডিথ ডিয়ার?'

'না।' সরে দাঁড়াল এডিথ। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছিল এডিথ। সারা গায়ে যেন বিছুটি লেগেছে তার। বাতাসটা কেমন ভারি হয়ে উঠেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'এখন নয়, জো। তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি এগোতে চাও। বল যদি তো কাল আবার আসব।'

'কাল আমি চলে যাচ্ছি এডিথ। বডরিক বে-তে। যাবে তুমি?' আবেদনের সুরে বলল জো।

'একটা সিগারেট দাও।' প্রসঙ্গ বদলের প্রচলিত ভঙ্গিটাই ব্যবহার করল এডিথ।

জো পকেটে হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত বের করে বলল, 'ভেতরে রেখে এসেছি প্যাকেট। চল না হয়, ভেতরেই যাই।'

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পেছনের দরজাটাই খুলল জো। দুজন ঢুকল কেবিনে। জো সিগারেট আর লাইটার এনে দিল এডিথের হাতে। কেবিনটার চারদিকে দৃষ্টিপাত করল এডিথ। সু-সজ্জিত একটা হুইল হাউস। শুধু হুইল হাউজই নয় একটা চমৎকার লিভিং রুমও।

সেকথাই বলল এডিথ, 'এই কেবিনটা তো আমায় দেখাওনি। ভারি চমৎকার তো?'

জো জবাব দিতে যাচ্ছিল। দরজায় টোকা পড়ল।

'কে? কি চাই?' জোর গলায় প্রশ্ন করল জো। এই প্রথম জো'কে মেজাজ হারাতে দেখল এডিথ।

'জরুরী দরকার আছে, স্যার।'

দরজা খুলে দিল জো। যে স্টুয়ার্ড ডিনার পরিবেশন করেছিল সে দাঁড়িয়ে আছে। জো এডিথের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সিগারেট ধরিয়ে এডিথ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। জাহাজে উঠবার পর এই প্রথম সে একা হতে পেরেছে। আর এই সুযোগটাই খুঁজছিল সে। হয়ত এখুনি জো আবার ফিরে আসবে। এডিথ দ্রুত চিন্তা করতে লাগল আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে লাগল। কিন্তু সে নির্দিষ্ট ভাবে কি যে চায়, তাই সে জানে না। সামনে পাশাপাশি দুটো বুককেস ভর্তি বই, ওদিকে একটা টেবিল। তারপর চার্টের মত কি একটা দেখা যাচ্ছে।

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বুককেসটার দিকে এগিয়ে গেল এডিথ।

সাত

সারাটা সন্ধ্যা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল কামাল। এডিথ গেছে রোজমেরীতে। কুয়াশা কোথায় সে খবর সে নিজে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। হাতে অখণ্ড অবসর—অন্তত শুতে যাবার আগে পর্যন্ত। অথচ রাত বারোটার আগে শয্যা গ্রহণের কথা কল্পনাই করতে পারে না সে।

বীচে কিছুক্ষণ ঘুরল অন্ধকারের মধ্যেই। ক্যানো ভাড়া করে চ্যানেলের অনেকটা দূরে পাক খেয়ে এল কয়েকবার। পরিতৃপ্তি সহকারে ডিনার সারল হোটেল ডি লা মেয়ারে। সেখান থেকে গেল একটা ক্যাসিনোতে। পায়ে ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে এক সুন্দরী যুবতীর নাচের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। আবার বীচে গেল। জিপসীদের তাঁবুতে ম্যাজিক দেখল কিছুক্ষণ।

ঘড়িতে দেখল, রাত এগারোটা বাজে। এবারে ফেরা যেতে পারে হোটেলে। কি মনে করে হোটেলের বদলে এগিয়ে গেল জেটির দিকে। অন্ধকারে জেটিতে কিছুক্ষণ ঘুরল। রোজমেরীর দিকে দৃষ্টি গেল তার। অন্ধকারের মধ্যে সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে রোজমেরী। রাইডিং লাইটের আলোকে রহস্যময় দেখাচ্ছে ইয়টটাকে। এখান থেকে কুয়াশার ইয়ট দি ফগকে দেখা যায় না। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েকটি জাহাজ। তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে দি ফগ। জেটিতে অসংখ্য ক্যানো। ভাড়ার প্রতীক্ষায় আছে।

একটা ক্যানো ভাড়া করে কামাল দি ফগ-এর স্পীডবোটের পাশে গিয়ে ভিড়ল। ক্যানো বিদায় দিয়ে ইয়টে উঠল কামাল।

সাদর সম্বর্ধনা জানাল চার্লি হ্যারিস। বিকেলে কামাল এসেছিল ইয়টে তার মাস্টারের কাছে। মাস্টার তাকে খুব খাতির করেছিলেন। মাস্টার যে এই যুবককে স্নেহ করেন তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি চার্লির।

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টার কোথায়, মি. হ্যারিস?'

চার্লি একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'আল্লাহ্ মালুম!'

'ইয়টে নেই?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কামাল।

মাথা নাড়ল হ্যারিস। বলল, 'বসুন, স্যার, স্যালুনে গিয়ে। মাস্টার যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন।'

কিন্তু কামাল নড়ল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করতে লাগল। স্পীডবোট আছে অথচ কুয়াশা নেই। একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায় উদয় হল এবং পরের মুহূর্তেই সে একটা সিদ্ধান্ত নিল।

পরম বিনয়ের সাথে কামাল বলল, 'মি. হ্যারিস, তোমাদের ক্যানোটা পেতে

পারি কি? আমি একটু ঘুরে আসতাম।'

'অবশ্য, অবশ্য।'

ক্যানোতে চেপে কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘুরল কামাল। অনেকটা দূরত্ব রেখে রোজমেরীর পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করল। স্বভাবতই কিছু বোঝা গেল না। ক্যানোটা নিয়ে কামাল চলে গেল রোজমেরীর আলোর সীমানার কাছাকাছি। দু'বার চক্কর খেল রোজমেরীর চারদিকে। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না, কোনও চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া গেল না রোজমেরীতে। ডেকে একটা লোকও দেখা গেল না।

একটু ইতস্তত করল কামাল। অথচ তার কি প্রত্যাশা ছিল স্পষ্ট করে তাও সে জানে না। ফিরে যাওয়াই উচিত বিবেচনা করল। কিন্তু একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ যেন তাকে ফিরে যেতে দিল না। তৃতীয়বার আর চক্কর দিল না। কাছেই একটা জাহাজের আড়ালে চলে গেল। ক্যানোর ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। এখান থেকে রোজমেরীর সম্মুখ দিকটা অস্পষ্ট দেখা যায়। হঠাৎ আবছা অন্ধকারে, কামালের চোখে পড়ল, একটা মানুষের মূর্তি রোজমেরীর ডেকে উঠছে। ডেকের আলোয় তাকে মুহূর্তের জন্য দেখা গেল। চমকে উঠল কামাল। মূর্তিটা আর কেউ নয় কুয়াশা।

পরবর্তী দৃশ্যের জন্য কামাল এক দৃষ্টিতে রোজমেরীর দিকে তাকিয়ে রইল। সিগারেটে টান দিতেও ভুলে গেল সে।

হঠাৎ তার মোটর বোটটা দুলে উঠল। চমকে উঠল কামাল। দেখতে পেল একটা লোক পানি থেকে লাফ দিয়ে উঠেছে তার বোটে। লোকটার মুখে একটা পিস্তল। কামাল পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই লোকটা দ্বিতীয় লাফে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ থেকে পিস্তলটা হাতে নিল। সমস্তটা ঘটনা ঘটে গেল তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। অনেকটা জিপসীদের অবিশ্বাস্য ম্যাজিকের মত। ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেল কামাল।

লোকটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বোঝাল, একটু নড়াচড়া করলে এখানেই তার মানব জীবনের ইতি ঘটবে। সুতরাং সে যেন ভদ্র সন্তানের মত তার নির্দেশ পালন করে। মোটর বোটটা দুলে উঠল আবার। আরও একজন এসে উঠল। পিস্তলধারী ইঙ্গিত করতেই দ্বিতীয় লোকটা এসে কামালের হাত ধরে টেনে তুলল। মুখে বলল, 'সরে বস্ এখান থেকে।'

ভয়ে ভয়ে কামাল সরে বসল। দ্বিতীয় লোকটা পিছনে বসে ইঞ্জিন চালিয়ে দিল। পিস্তলধারী কামালের দিকে পিস্তল উঁচিয়েই রইল। মোটরবোট দ্রুত ছুটে চলল রোজমেরীর দিকে।

কামাল এতক্ষণে তার নির্বুদ্ধিতা পরিষ্কার বুঝতে পারল। এই ভয়ঙ্কর দস্যুদলের ঘাঁটির কাছে এইভাবে ঘোরাফেরা করে সে চরম বোকামির পরিচয়

দিয়েছে। নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হল তার। মনে পড়ল, কুয়াশা তাকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে বলেছিল। অসহায়ের মত কামাল বসে রইল। এডিথ আর কুয়াশা হয়ত জানতেও পারবে না যে জো স্টিফেনের অনুচররা তাকে বন্দী করেছে।

রোজমেরীতে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল ভালই। বেঁটে মোটাসোটা গোলগাল চেহারার একটি লোক তাকে সম্বর্ধনা জানাল। লোকটার চোখ দুটো ছোট ছোট পিটপিটে। হিংস্র দৃষ্টি। নাকের পাশে এক ক্ষতচিহ্ন। সব মিলিয়ে বীভৎস।

লোকটা বলল, 'এই যে আসুন, মি. এটসেটেরা। আলফানস, ওকে নয় নম্বর কেবিনে নিয়ে যাও।'

পিস্তলধারীর নামটাই বোধহয় আলফানস। সে ইশারায় কামালকে এগোবার নির্দেশ দিল। কামাল ভাবছিল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা। কিন্তু আইডিয়াটা নাকচ করে দিল। এখন একটু সন্দেহজনক আচরণ করলেই জানে শেষ করে দেবে ওরা নির্দ্বিধায়। তবুও কিছু একটা করতে হবে।

কামাল দেরি করছে দেখে আলফানস আবার ইশারা করল। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই কোমরের উপর প্রচণ্ড একটা লাথি এসে পড়ল। কোমরটা যন্ত্রণায় বেঁকে গেল কামালের। মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার। পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল কামাল। কিন্তু পরমুহূর্তে আরও একটা লাথি পড়ল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কামাল। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

আট

প্রথম বুককেসের সামনে এসে দাঁড়াল এডিথ। ঠাসা বই। মোটা, পাতলা, বাঁধানো, পেপার ব্যাক, সবরকমই আছে। মোটা বইয়ের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশের সোনালী হরফে লেখা নাম। দর্শন, ইঞ্জিনিয়ারিং,, নেভিগেশন, খেলাধুলা, জেমস বণ্ড—সবই আছে। দ্রুত কয়েকটা বই বের করে পাতা উল্টেপাল্টে দেখল। না ডামি নয়। হয়ত দু'একটা ডামি থাকতেও পারে। কিন্তু দুটো বুককেসের বই দেখতে দু'ঘণ্টা লাগবে এভাবে।

উঁচু টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল এডিথ। টেবিলের উপর সরু পেন্সিলে আঁকা একটা চার্ট। খুঁটিয়ে দেখতেই বুঝল ওটা ভূমধ্যসাগর এলাকার একটা ম্যাপ। ডটেড লাইন দিয়ে জাহাজ চলাচলের পথ নির্দেশ করা আছে। লাইট হাউস আর বয়া দেখানো আছে লাল পেন্সিলের চিহ্ন দিয়ে।

হতাশ হল এডিথ। না এতেও কিছু নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল আর একটা লাল চিহ্ন। সেটা ঠিক অন্য লাল বিন্দুর মত নয়। এটা কলমের কালিতে আঁকা, পেন্সিলে নয়, আর বিন্দুটার চারদিকে কালো কালির সূক্ষ্ম রেখা।

এডিথের বুকের ভিতরটা ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। দাঁত দিয়ে

ঠোঁট চেপে ধরে আত্মসম্বরণ করল সে।

উত্তেজনা একটু প্রশমিত হতেই এডিথ পেন্সিল আর কাগজের জন্য ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল। এঁকে নিতে হবে ঐ চার্টটা। এডিথ জানে না ঐ চার্ট আর লাল চিহ্নের কোনও মানে আছে কিনা। হয়ত কোনও অর্থ নেই অথবা এমনও হতে পারে ঐ চিহ্নটাতেই আছে জো আর র‍্যাকেটের মৃত্যুবান, হয়ত ওতেই ইঙ্গিত আছে জো'র সঞ্চিত ধনরত্নের।

ভ্যানিটি ব্যাগে কাগজ-পেন্সিল কোনটাই পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে ব্যাগ বন্ধ করতে যেতেই মনে হল রুমাল তো আছে, লিপস্টিকও আছে। ওতেই হবে। কিন্তু তার চোখ পড়ল টেবিলের উপরেই একটা পেন্সিলের উপর। তার নিচেই এক খণ্ড ছোট সাদা কাগজ। এডিথের দরকার মাত্র এক ইঞ্চি কাগজ।

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল এডিথের। কাঁপা কাঁপা হাতে দ্রুত কাগজের উপর পেন্সিল চালাল এডিথ। দু'মিনিটও লাগল না। কিন্তু এডিথের মনে হল যেন সে যুগযুগান্তর ধরে নকল করে চলেছে চার্টটা।

ব্যাগ খুলে পাউডারের বাক্স বের করল এডিথ। কাগজের টুকরোটা বাক্সে রেখে ব্যাগটা বন্ধ করল। বুকের ভিতর তখনও হাতুড়ি পিটছে। অন্য একটা টেবিলের কাছে চলে এল এডিথ। একটা ম্যাগাজিন খুলে পাতা উল্টাতে লাগল। কিন্তু তার চোখের সামনে সমস্ত লেখা ছবি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। কোনও কিছুই তার স্নায়ুতে পৌঁছুচ্ছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

তবুও সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে এডিথের উত্তেজনার অবসান হল। রুমাল বের করে মুখটা মুছল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত প্রসাধন করে নিল। আয়নায় খুঁটিয়ে দেখল তার চেহারা। কোনও অস্বাভাবিকতার ছাপ নেই। বরং প্রসাধনের ফলে এখন তাকে বেশ তাজা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ তার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই বোধহয় সাজানো, সুপরিকল্পিত। কৌশলে একটা টোপ ফেলা হয়েছে। এডিথ টোপ গেলে কিনা তাই ওরা দেখতে চায়। হয়ত, কেউ সেলুনের ভিতরে বা বাইরে থেকে এডিথের কার্যকলাপ দেখছে, অথবা ক্লোজসার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা আছে কোথাও। জো হয়ত সব কিছুই দেখেছে অন্য কোথাও বসে। নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে এডিথ।

পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করল সে। জো ও ডসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ডেকের উপর জো'র প্রেম নিবেদন, একটা অজুহাত দেখিয়ে একলা তাকে হুইল হাউজে রেখে জো'র প্রস্থান, টেবিলের উপর চার্ট, পেন্সিল, ছোট এক টুকরো কাগজ— সমস্তটাই একটা বিশেষ সিদ্ধান্তের দিক নির্দেশ করে। অথচ এখন আর কিছু করবার নেই। ধরা পড়ে গেছে সে জো'র চালাকির কাছে।

কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল এডিথ। ম্যাগাজিনটা টেনে নিয়ে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল। অশান্ত মনটার রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করল। তারপর

একটা সময় এল যখন এডিথ বুঝল সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। উত্তেজনার অবসান ঘটেছে। যে-কোনও পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার সাহস তার ফিরে এসেছে। আর জো যখন ফিরে এল তখন সে যে মিষ্টি হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল তা সে আগের মুহূর্তেও কল্পনা করেনি।

এডিথের হাসির জবাবে মাথা নাড়ল জো। সে নিজেও বোধহয় হাসবার চেষ্টা করল বলে এডিথের মনে হল। কিন্তু হাসিটা ফুটল না। এই প্রথম জো'র মুখ থেকে নির্বিকারত্বের মুখোশটা যেন আলগা হল। চিন্তার রেখা পড়েছে জো'র মুখে। তবে কি?

শিউরে উঠল এডিথ আবার। কিন্তু জো এডিথের দিকে এতক্ষণ পর্যন্ত ভাল করে তাকায়নি। একটা সেফ খুলে কি যেন করছে।

ওখান থেকেই জো বলল, 'তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বোধহয় তোমাকে একা থাকতে হবে।' জো তার কর্কশ কণ্ঠে একঘেয়ে সুরে বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল। তার হাতে একটা অটোমেটিক। ফ্যাকাসে হয়ে গেল এডিথের মুখ। জো এ তক্ষণে আবার তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ধরেছে এডিথের দিকে। ঢোক গিলল এডিথ। এডিথের মুখের উপর দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রেখেই জো বলল, 'স্টুয়ার্ড আজকে রাতেও একজনকে লুকিয়ে জাহাজে উঠতে দেখেছে। কালরাতেও এসেছিল একজন তোমাকে তো বলেছি। হয়ত আজকেও সে-ই এসেছে। কিন্তু আজকে আর বাছাধনকে পালাতে হবে না।'

'সত্যি!' অবাক হওয়ার সার্থক ভান করল এডিথ, আর একটু অবাকও হল। কে আজকের এই অভিযাত্রী, কুয়াশা? কামাল? চোর? না কোনও ডিটেকটিভ? কে?

না কি সমস্তটাই জো'র চালাকি? এডিথের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি। সেটাই বোধহয় ঠিক।

'অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই।' এডিথকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল জো।

'না না, ভয় পাব কেন।' ঠোঁট উল্টাল এডিথ। 'কিন্তু আমি থ্রিল্ড ফিল করছি।' মনে মনে নিজের তারিফ করল এডিথ। অভিনয়টা ভালই হচ্ছে। 'কিন্তু তোমার প্রতি নিশাচরদের এমন সুনজরের কারণ কি?'

শ্রাগ করল জো। বলল, 'ছিঁচকে চোর। বোধহয় ভেবেছে যদি দামী কিছু বাগাতে পারে।'

'সবচেয়ে দামী জিনিসটার লোভে আসেনি তো?' এডিথ ঠাট্টা করল।

দাঁত বের করে হাসল জো।

'আমি যাব তোমার সাথে।' নাকি সুরে আবদার করল এডিথ।

'লক্ষ্মীটি, তুমি বরং এখানেই থাক। মিছিমিছি...'

'আমার কিন্তু এতটুকু ভয় করছে না। তাছাড়া তোমার কাছে তো অটোমেটিক

আছেই। বিশ্বাস কর, তোমার কোনও অসুবিধা ঘটাব না।' আবদারের মাত্রাটা বাড়াল এডিথ।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল জো। তারপর দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'এস তাহলে, কিন্তু সবসময় আমার পিছনে থাকবে।'

কেবিন থেকে বেরোতে বেরোতে জো বলল, 'লোকটা এখনও পালাতে পারেনি, ইয়টেরই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

জো'র কথা এডিথের মস্তিষ্কে কোনও তরঙ্গ সৃষ্টি করল না। অজ্ঞাত আগন্তুকের কাহিনী সে এখনও বিশ্বাস করে না। এডিথের ধারণা, এটাও তাকে মানসিক দিক থেকে নিষ্পেষণ করার একটা কৌশল মাত্র। জো পাকা শিকারী। শিকার বাগে পেয়ে তাকে নিয়ে খেলছে।

জো'র পিছনে পিছনে ডেকহাউসের পাশে এসে দাঁড়াল এডিথ। সে তখন কল্পনাও করতে পারেনি যে ঠিক তার মাথার কাছেই রয়েছে কুয়াশা—এত কাছে যে কুয়াশা ইচ্ছা করলে তার চুল ছুঁয়ে দিতে পারে।

হঠাৎ অন্ধকার আকাশ থেকে বজ্রপাত হল। এডিথ অবাক হয়ে দেখল লাফ দিয়ে নামল একটা লোক। তার একটা পা পড়ল জো'র হাতে ধরা অটোমেটিকের উপর। অন্য পা'টা পড়ল জো'র কপালে। জো চিৎ হয়ে ধপাশ করে রেলিংয়ের উপরে পড়ে গেল। হাত থেকে অটোমেটিকটা ছিটকে পড়ল পানিতে। ঝপ করে একটা শব্দ হল।

ডেকের উপর নেমে এসেছে লোকটা। পরের মুহূর্তে সে রেলিং টপকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটা ঘটনা ঘটে গেল। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে এডিথ দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দেখতে পেল না এডিথ লোকটার। কিন্তু দীর্ঘদেহটা দেখে অনায়াসে চিনতে পারল সে। নির্মেঘ আকাশ থেকে যদি বজ্রপাত হয় নিশ্চয়ই সে বজ্রের নাম কুয়াশা।

বিস্ময়ে আর আনন্দে নির্বাক হয়ে সুমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এডিথ।

নয়

ধীরে অতি ধীরে চেতনা ফিরে এল কামালের। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। যেন একটা শূন্যতা বোধ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে মনে হল তার। চোখ মেলে চাইল কামাল। চারদিকে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোর রেশ নেই। আর অদ্ভুত নিস্তব্ধ। কোনও শব্দ তার কানে এসে পৌঁছুল না।

আমি এখন কোথায়, নিজেকে প্রশ্ন করল কামাল। তারপর আস্তে আস্তে তার সব কথা মনে পড়ল। তাহলে সে এখন জো স্টিফেনের ইয়টে বন্দী হয়ে আছে।

উঠে বসবার চেষ্টা করল কামাল। সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। কোমরটা টনটন করছে ব্যথায়। পকেটে হাত ঢোকাল কামাল। সিগারেট লাইটারটা নেই।

কতক্ষণ এমনি করে ছিল কামাল তা বলতে পারবে না। হাতের ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে অন্ধকার এই কক্ষে বন্দী হয়ে আছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে, হয়ত অনন্তকালের জন্যই তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু জো স্টিফেন কি এতটা নির্দয় হবে?

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কামাল। এমন সময় কাছেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কারা যেন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে।

দাঁড়াল না কামাল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হল। তারপর আলো জ্বলে উঠল। সে আলোয় কামাল নিজেকে আবিষ্কার করল একটা ছোট কক্ষের মধ্যে। বড় জোর দু'হাত বাই চার হাত কক্ষটা।

দরজাটা খুলে যেতেই কামাল মুখ ফিরিয়ে দেখল দুজন লোক এসে দাঁড়াল তার সামনে। সেই ভয়াল দর্শন বেঁটে মোটা লোকটা। দ্বিতীয় লোকটার চুল লম্বা। দাড়ি গোঁফ কামানো। হাতে একটা বিরাট লোহার রড। সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কামাল ফ্যালফ্যাল করে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

মোটকা লোকটাই এগিয়ে এল তার কাছে। খ্যান খ্যান করে হেসে বলল, 'এই যে, বাছাধন, ঘুম ভেঙেছে? এবারে বল তো বাপু খবরটা কি?'

কামাল চুপ করে বসে রইল। ওরা দুজন, তার ওপর হিপ্পিটার হাতে যে লোহার রড আছে তার এক আঘাতেই সে খতম হয়ে যাবে, সুতরাং ওদের সাথে লড়তে যাওয়া পাগলামির নামান্তর।

'কথা বলছিস না কেন?' জুতোর ডগাটা দিয়ে কামালের গালে আঘাত করল লোকটা। কামাল হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে পা-টা সরিয়ে দিল।

লোকটার চেহারা আরও হিংস্র হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে চুলের মুঠি চেপে ধরল। আর সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটল। খটাং করে একটা আওয়াজ কানে গেল কামালের। কামালের চুলের মুঠিটা আলগা হয়ে গেল আর সেই মুহূর্তেই আকাশ ফাটানো একটা আর্তনাদ তার কানে এসে পৌঁছুল। মোটকা লোকটা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে। গোঁ গোঁ করে আওয়াজ বেরোচ্ছে লোকটার মুখ দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল দেহটা। শিউরে উঠল কামাল।

লম্বা চুলওয়ালা লোকটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল সে। দেখল, তার চোখে জিঘাংসা আর ঘৃণা। মেঝের দিকে তাকাল আবার। মেঝেটায় রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তার গায়েও রক্তের ছিটে এসে লেগেছে। কি বীভৎস।

কামালের চেতনা আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। পড়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু কে তাকে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। চোখটা খুলল কামাল। সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটা। সে যেন কি বলছে তাকে। কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল কামাল।

…একটু পরেই আবার জ্ঞান ফিরে পেল সে। কে যেন আস্তে আস্তে তার দেহটা নাড়ছে। চোখ খুললো কামাল। দেখল সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটা তার মুখের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

কামাল চোখ মেলে চাইতেই সে বলল, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও এখুনি উঠে পড়। এর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না, জো'র হাতে মারা পড়তে হবে।'

প্রাণ…মৃত্যু এসব কথার মানে কি ভাবতে চেষ্টা করল কামাল। কিন্তু লোকটা তাকে সময় দিল না। দৃঢ় হাতে তার একটা হাত ধরে টেনে তুলে বসাল। লোকটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি।

এতক্ষণে পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়েছে কামাল। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে আর কোনও কষ্ট হচ্ছে না। প্রাণ…মৃত্যু…এসবের মানে জানে সে।

মাটিতে একটা সুইম স্যুট পড়েছিল। লোকটা সেটা তুলে কামালের হাতে দিয়ে বলল, 'এক মিনিট সময় দিলাম। কাপড়টা বদলে এটা পরে ফেল। কুইক। দেরি করলে দুজনকেই মারা পড়তে হবে।'

কৃতজ্ঞতায় তখন কামালের বুকটা ভরে উঠেছে। সে নীরবে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে লোকটার দিকে তাকাল। কিন্তু লোকটা বিরক্ত হল। কাপড় বদলে সুইম স্যুট পরল কামাল।

এক মিনিটে হল না, দু'মিনিটেও না। লাগল তিন মিনিট। তাও লোকটা সাহায্য করল বলেই।

কাপড়গুলো গুছিয়ে কামালের হাতে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটা দরজা খুলল সাবধানে। বাইরে উঁকি দিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বোধহয় সুইচ টিপল বলে মনে হল কামালের। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে রুমের ভেতর আর বাইরে অন্ধকার হয়ে গেল।

দ্রুত আবার কক্ষটাতে ঢুকল লোকটা। কামালের হাত ধরে টান দিল। বাইরে অস্পষ্ট আলো। সেই আলোতে একটা সরু প্যাসেজের মধ্যে এসে পড়ল ওরা। লম্বা চুলওয়ালা লোকটা সামনে আর কামাল তার পিছনে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে। মোড়টা ঘুরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সমুদ্র।

কামাল তখন মনের জোর ফিরে পেয়েছে। রেলিং পেরিয়ে সে সমুদ্রে নামল।

ডেকের উপর পায়চারি করছিল জো। এডিথ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এর

পাশে। তার পাশে প্রফেসর রোজেনবার্গ। তিনি ঘন ঘন দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন। কেউ কোনও কথা বলছে না। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য জো'র মুখ থেকে নির্বিকার ভাবটা অন্তর্হিত হয়েছিল। এখন আবার সেটা সেঁটে বসেছে।

জো পায়চারি করতে করতেই ডাকল, 'আলফানস।'

আলফানস একটু দূরে একটা বাক্সের উপর দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ফেরাল। জো তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ডসন কোথায়?'

আলফানস বলল, 'নয় নম্বর কেবিনে।'

'এতক্ষণ সে কি করছে ওখানে? যাও তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

আলফানস চলে গেল।

একটা টেণ্ডার এসে ভিড়ল ইয়টের পাশে। জো পায়চারি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাউকে দেখতে পেলে?'

ফ্লাশলাইট হাতে একটা লোক ইয়টে উঠতে উঠতে বলল, 'কাউকেই না। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না।'

প্রফেসর রোজেনবার্গ বললেন, 'কি আশ্চর্য। এর মধ্যেই পালিয়ে গেল! তবে আমার মনে হচ্ছে চোরটা কাছে পিঠেই কোথাও আছে। চলুন, যাই একবার দেখে আসি।'

জো বলল, 'তাতে কোনও লাভ হবে না মি. প্রফেসর। লুকিয়ে থাকবার জায়গার তো অভাব নেই। তাছাড়া দেরিও হয়ে গেছে অনেক। এখন খোঁজ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।'

প্রফেসর বললেন, 'তাইতো, তাইতো।'

'আলফানস ফিরে এল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। জো'কে বলল, 'মি. স্টিফেন, একটু এদিক আসবেন? জরুরী প্রয়োজন।'

এডিথ ও প্রফেসরের কাছে ক্ষমা চেয়ে জো আলফানসের সাথে চলে গেল। প্রফেসরও বিদায় নিলেন। এডিথ ডেকহাউজের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি অন্ধকার সমুদ্রের দিকে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জো প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, আলফানস?'

আলফানস বলল, 'বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মি. স্টিফেন। মি. ডসন মারা গেছেন। তার মাথার পিছনে মোটা লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, থেঁতলে গেছে একেবারে।'

জো আর এডিথ টেণ্ডার থেকে জেটিতে নামল। ককপিটে বসা লোকটাকে বলল, 'তুমি অপেক্ষা কর আমি আসছি।'

এডিথ জো'কে বলল, 'একাই আমি যেতে পারব, জো, একটা ট্যাক্সি নিয়ে।'

জো জবাব দিল না। এডিথের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল নীরবে। অনেকটা

পথ অতিক্রম করে জো বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এডিথ। সন্ধ্যা থেকে নানা হাঙ্গামায় তোমার দিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। নিশ্চয়ই তুমি কিছু মনে করনি?'

এডিথ বলল, 'তুমি মিথ্যেই কুণ্ঠিত হচ্ছ, জো। আমার কিছু মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনে। তোমাকে অবহেলা করে একটা সামান্য চোরের পিছনে ধাওয়া করা সত্যি আমার উচিত হয়নি। কাল তুমি নিশ্চয়ই আসছ, এডিথ লক্ষ্মীটি?'

এডিথ মাথা নাড়ল। 'কাল নয়, জো। অন্য একদিন যাব তোমার ইয়টে।'

'না না। তোমাকে কালকেই আসতে হবে। কোনও মানা আমি শুনব না। কালই তো আমরা চলে যাচ্ছি। আর তুমিও যাচ্ছ আমাদের সাথে।'

'তা হয় না, জো। আমাকে অন্তত দু-একটা দিন ভাবতে দাও।'

'কিন্তু সময় তোমাকে দিতে পারছি না। কালকে আমাকে যেতেই হবে। আর তোমাকে যেতে হবে আমার সাথে,' দৃঢ় স্বরে বলল জো।

'তাতে তো আমার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এটা জীবনের একটা বড় সমস্যা। চিরদিনের জন্য তুমি আমাকে কিনে নিতে চাচ্ছ। তোমার কাছে ব্যাপারটা তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু মেয়ে মানুষের জীবন যে একটাই।'

'তবুও তুমি কাল আসছ।'

'তুমি বড্ড বেশি নিশ্চিত হয়ে আছ। যেন ধরেই নিয়েছ। বেশ তাই হবে, জো। তোমার কথাই থাকবে।'

আর কোনও কথা হল না। নীরবে দুজন অতিক্রম করল বাকি পথটা। হোটেলের দরজায় পৌঁছে জো শুভরাত্রি জানাল এডিথকে। এডিথও জো'র শুভরাত্রি কামনা করল।

জো বলল, 'যদি দরকার হয় তাহলে তোমার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করার জন্য একজন স্টুয়ার্ড পাঠাতে পারি সকালে।'

'না, তার দরকার হবে না। নিজেই করে নিতে পারব।'

দশ

রাত একটা বেজে গেছে। দিনার্দ পুলিস স্টেশন নিস্তব্ধ। ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া সামনে ফাইল খুলে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। দরজা খোলার আর জুতোর মচমচ শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। চোখ দুটো ডলতে ডলতে দেখলেন, অপরাধ তদন্ত বিভাগের স্থানীয় প্রধান শার্লস মরিয়া ও হারবার পেট্রোলের চীফ কনস্টেবল ফাঁসোয়া রেগাঁ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

চীফ কনস্টেবল রেগাঁ হাসতে হাসতে বললো, 'কি হে ইন্সপেক্টর, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, ভয় নেই, আমরা লাশ-টাস নিয়ে আসিনি। আর নক-আউট পাঞ্চ করে তোমাকে ধরাশায়ী করব না।'

তার কথায় কান না দিয়ে ইন্সপেক্টর শার্লস ও রেগাঁকে বসবার ইঙ্গিত করে বললেন, 'এতরাতে কোথা থেকে আসছ?'

'আর বল কেন, তোমরা জেনারেল পুলিসরা তো ডায়েরী লিখেই খালাস। দুনিয়ার যত ঝক্কি পোহাতে হয় আমাদেরকে।' দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল শার্লস মরিয়া।

শার্লস মরিয়া লোকটা রোগা আর পাতলা। চৌকোণা লম্বাটে মুখ। থুতনিতে সামান্য দাড়ি। চুলের মাঝখানে সিঁথি। চোখে চশমা। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। সুযোগ্য অফিসার। গতকাল যে যুবতী চ্যানেলে নিহত হয়েছে তার তদন্তের ভার পড়েছে তার উপর।

ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'তা পুলিসের চাকুরি যখন নিয়েছ তখন ঝক্কি তো পোহাবেই।'

চীফ কনস্টেবল রেগাঁ প্যাকেট থেকে সিগারেট নিতে নিতে বলল, 'শুধু ঝক্কি নয় হে, ইন্সপেক্টর। রীতিমত ভাবিয়ে তোলবার মত ঘটনা। এটা তোমার সেই বীচের আর দশটা প্রেম-ঘটিত হত্যাকাণ্ড নয়। আরও অনেক জটিল। অবশ্য প্রথমে আমারও প্রেম ঘটিত হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা হয়েছিল, কিন্তু শার্লস ভায়া—তদন্ত করতে গিয়ে যে সব ঘটনা জানতে পেরেছে তাতে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক বলে মনে হচ্ছে।'

ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া শার্লসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শার্লস সঙ্গে করে নিয়ে আসা একটা ফাইল থেকে একটা চিঠি বের করে ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা পড়ে দেখ।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিয়ে পড়লেন দুবোঁয়া। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। চিঠিটা এসেছে প্যারিসের ফ্রেঞ্চ অপরাধ দমন বিভাগের সদর দফতর থেকে। তিন লাইনের চিঠি। তার মর্মার্থ হলঃ যারা সমুদ্রের তলে নিমজ্জিত জাহাজে লুণ্ঠন করে বেড়ায় তাদের একটা র‍্যাকেট মাস তিনেক হল দিনার্দ হারবারে অবস্থান করছে। তাদের খোঁজ খবর করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে।

চিঠি ফেরত দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'কিন্তু গতকালকের হত্যাকাণ্ডের সাথে ঐ পাইরেটদের সম্পর্ক আছে এ ধারণা তোমার হোল কেন? তা না-ও তো হতে পারে?'

'ব্যাপারটা জানতে পারি অনেকটা আকস্মিক ভাবে। এতে আমার তেমন কৃতিত্ব নেই।'

'কি রকম?' ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন।

'দুপুরে একটা বেনামী টেলিফোন কল পেয়েছিলাম। তাতেই ক্লুটা পাওয়া গেল। টেলিফোনকারী অবশ্য গতরাতে নিহত মেয়েটার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। পরিচয়টা দিয়েই লাইন কেটে দিল।'

'টেলিফোনটা যে করেছিল সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক?'

'পুরুষ।'

'কর্কশ কণ্ঠস্বর, কেমন খন খনে আর একঘেয়ে?'

'তা তো মনে হল না।'

'কি বলল সে?'

'মেয়েটার নাম এথেল ফাউলার। ইংরেজ মেয়েটা হোটেল ডি স্যানিওতে থাকত। মাস তিনেক হল দিনার্দে এসেছে। তখন থেকে ঐ হোটেলেই আছে। অত্যন্ত রাশভারী ধরনের মেয়ে। গম্ভীর। বড় একটা কারও সাথে মিশত না। সব রকম হৈ-চৈ হুলোড় এড়িয়ে চলত। মদ পর্যন্ত খেত না। কখনও-সখনও একটা হিপ্পি এসে দেখা করে যেত। তাও পাঁচ দশ মিনিটের জন্য।' থামল শার্লস।

সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'হোটেলে মেয়েটার রুমে পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল। তাতে ঠিকানা ছিল। তখনি রেডিও ফোটোতে পাসপোর্টের ছবি পাঠিয়েছিলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। কিছুক্ষণ আগে জবাব এসেছে। সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেরই এক প্রাক্তন অফিসারের সন্তান। ভদ্রলোক এক ডিপসী পাইরেট দলের হাতে খুন হয়েছিলেন। মেয়েটা তখন অক্সফোর্ডে রিচার্স করত। বাবার হত্যাকাণ্ডের পর সে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। সম্ভবত তখনি সে কন্টিনেন্টে চলে আসে। আমার ধারণা সে তখন থেকেই প্রতিশোধ নেবার জন্য পিতার হত্যাকারীর পিছনে পিছনে ঘুরছে। আর যে ডিপসী র‍্যাকেটের হাতে ওর বাবা খুন হয়েছিলেন সম্ভবত সেই দলটাই এখন দিনার্দে এসেছে। মেয়েটাও এসেছে পিছনে পিছনে।'

'এতে নিশ্চিত ভাবে কিছু প্রমাণিত হয় না।' ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া বললেন।

মৃদু হাসল শার্লস। বলল, 'অবশ্যই হয় না, কিন্তু সন্দেহ করা চলে এবং সেই সন্দেহকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়া চলে। তাছাড়া, মেয়েটার রুমে যে সব কাগজ পত্র পাওয়া গেছে তাতে আমার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কয়েকটা মানচিত্র পাওয়া গেছে মেয়েটার রুমে বিভিন্ন সাগর মহাসাগরের। অতীতে যেখানে যেখানে ধনরত্নবাহী জাহাজ ডুবেছে, মানচিত্রগুলোতে সেই সব স্থান আঁকা আছে। ডিপসী পাইরেটরা যে সব ডুবে যাওয়া জাহাজ লুঠ করেছে তাদের একটা তালিকা পাওয়া গেছে। আর একটা তালিকায় আছে যে সব ডুবে যাওয়া জাহাজ এখনও উদ্ধার করা হয়নি তার নাম।'

'তাহলে তো তোমার ধারণাই নির্ভুল বলে মনে হচ্ছে,' ইন্সপেক্টর অবশেষে স্বীকার করেন।

শার্লস বললেন, 'আমার ধারণা হারবারের মেয়েটা সেই পাইরেট দলের

আস্তানাতেই হানা দিতে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই সুইমস্যুট পরে গভীর রাতে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে চ্যানেল ক্রস করতে নামেনি বা অভিসারে বেরোয়নি। নিশ্চয়ই তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল।'

ইন্সপেক্টর দুর্বোঁয়া ভীতিমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তো সত্যি বড় বিপদের কথা। তোমাকে খুব সাবধানে এগোতে হবে, হে শার্লস। আমি যতদূর শুনেছি এই ডিপসী পাইরেটরা যেমন ধূর্ত তেমনি হিংস্র। আজ পর্যন্ত এদের কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। বরং ওদের কবলে অনেক পুলিস অফিসার প্রাণ হারিয়েছে। খুব সাবধান, শার্লস। খুব সাবধান।'

'থাক, তোমার আর আমাকে সাবধানতা শেখাতে হবে না। এখন তোমার এদিকের খবর কি তাই বল। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেয়েছ?'

'মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর। বললেন, 'ও তো জানা কথাই। উরুতে গুলি লেগেছে। একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে। প্রচুর রক্তপাতে মারা গেছে।'

'যে লোকটা মেয়েটার লাশ নিয়ে এসেছিল তার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল? হোটেল রিজে নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া যায়নি? মিথ্যা ঠিকানা দিয়েছিল নিশ্চয়ই। কি না নাম লোকটার?'

'মি. ল্যাম্প। ঠিকানাটা মিথ্যা দেয়নি। হোটেল রিজে তার নামে একটা সুইট আছে বটে। মাসখানেক আগে রিজার্ভ করা হয়েছে। সে দিন তিনেক ওখানে কাটিয়েছে। পরে সেখানে আর যায়নি। কিন্তু সুইটের ভাড়া অগ্রিম দেওয়া আছে দু'মাসের। ম্যানেজার বললেন, 'মি. ল্যাম্প বৃটিশ পাসপোর্ট নিয়ে এলেও সে সম্ভবত কোনও কমনওয়েলথ কান্ট্রির লোক। এখনও সে দিনার্দেই আছে বলে ম্যানেজার জানালেন। গতকাল উনি হারবারে গিয়েছিলেন। একটা ইয়টের ডেকে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। তবে ইয়টের নামটা স্মরণ করতে পারলেন না।'

'বল কি?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চীফ কনস্টেবল রেগাঁ। 'তুমি নিশ্চয়ই রিজ হোটেলের ম্যানেজারকে নিয়ে হারবারে গিয়েছিলে?'

মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর। 'তা আর হল কই? ম্যানেজার ভদ্রলোক জরুরী কাজে প্যারিস যাচ্ছিলেন ঐ সময়ই। কিছুতেই তাকে আটকাতে পারলাম না। অবশ্য আমার ধারণা উনি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন। এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে আবার হোটেলের বদনাম হয় কিনা।'

'তাকে গ্রেফতার করলে না কেন?'

'তাতে লাভ হত না। বরং ভদ্রলোক কথা দিয়েছেন আগামী পরশু প্যারিস থেকে ফিরে এসেই তিনি আমাকে নিয়ে হারবারে যাবেন। তবে দিনে নয়, রাতে। তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। উপায় নেই।'

'কিন্তু তার আগেই হয়ত পাইরেট দলটা বন্দর ছেড়ে যাবে।' হতাশ হয়ে ধপাশ করে আবার বসে পড়লেন চীফ কনস্টেবল। 'আমার মনে হয় ল্যাম্প নামের

লোকটাই ডিপ্রসী পাইরেট দলের লোক। দলপতিও হতে পারে। আর সে নিজেই বোধহয় খুন করেছে।'

'আমি তো এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত যে ঐ লোকটাই মেয়েটাকে খুন করেছে।' ইন্সপেক্টর সায় দিলেন।

'তোমরা দুজনই বেশ হাসির কথা বলছ। এরকম কাকতালীয় সিদ্ধান্ত কি করে তোমাদের মগজে এল?' ব্যঙ্গ করল শার্লস। যে লোকটা খুন করেছে সে নিজে লাশ বয়ে এনেছে থানায় এরকম কথা শুধু ডিটেকটিভ কাহিনীতেই শোনা যায়। রিয়াল লাইফে তা ঘটে কদাচিৎ।'

'কেন, তুমি এটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে চাও? ফয়েরের ক্রিমিনোলজিতে আছে…' ইন্সপেক্টর চটে গিয়ে বললেন।

'রাখ তোমার ফয়েরের ক্রিমিনোলজি।'

'আর লোকটার গায়ে কি অসুরের মত শক্তি। তুমি…'

হো হো করে হেসে উঠল শার্লস। বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হলেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। রেগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'তু-তু-তু-মি ব্যাপা-ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও?'

হাসি থামিয়ে শার্লস বলল, 'শক্তি যদি অপরাধ হয় তাহলে হারকিউলিস, রুস্তম থেকে শুরু করে জো লুই পর্যন্ত সবাই অপরাধী।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমি ঠিক তা বলতে চাইনি, আমার বক্তব্য হল…'

টেলিফোনটা বেজে উঠল এই সময়। ইন্সপেক্টর তাঁর বক্তব্য অসমাপ্ত রেখেই রিসিভার ধরলেন, 'দিনার্দ পুলিস স্টেশন, ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া বলছি। ও হ্যাঁ, মসিয়ে রেগাঁ। আছেন এখানে, ধরুন।'

ইন্সপেক্টর ইশারায় চীফ কনস্টেবল রেগাঁকে রিসিভার ধরতে বললেন। রিসিভারটা তুলে বললেন, 'হ্যালো…রেগাঁ বলছি। হ্যাঁ-হ্যাঁ…। আচ্ছা আসছি আমরা। এক্ষুণি আসছি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে চীফ কনস্টেবল বললেন, 'নাও, ওঠ এবারে। চ্যানেলে আর একটা লাশ ভাসছে। তুমিও চল ইন্সপেক্টর। শার্লস, যাবে নাকি তুমি?'

'সেটা ঠিক হবে না। এই মুহূর্তে আমি নিজেকে প্রকাশ্যে এসব খুনোখুনির সাথে জড়িয়ে ফেলতে চাই না। আমি আপাতত গোপনেই কাজ করব।'

তিনজন উঠে দাঁড়াল। শার্লস বলল, 'এক মিনিট রেগাঁ, তোমাকে কতগুলো খবর জোগাড় করতে হবে।'

'বল।'

'প্রথমত, হারবারে এখন যে সব জাহাজ আছে তার তালিকা হারবার অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যেকটা জাহাজের ঠিকুজি-কুষ্ঠি যতদূর সম্ভব জানতে চেষ্টা করতে হবে। ঠিক তিনমাস আগে কোন্ কোন্ জাহাজ হারবারে এসেছে এবং

এখনও আছে তার একটা পৃথক তালিকা চাই। গতকাল কোন্ কোন্ জাহাজ হারবার ছেড়ে গেছে তা জানতে চেষ্টা করবে, সম্ভব হলে কোন্‌দিকে জাহাজগুলো গেছে তাও। আগামীকাল থেকে যে সব জাহাজ বন্দর ছাড়বে সেগুলোর নামের একটা তালিকা তৈরি করবে।'

'বেশ। আর কিছু?'

'আপাতত এই পর্যন্ত। আর হারবার পেট্রল আরও জোরদার করতে হবে।'

'তথাস্তু।'

এগার

ঘুম ভাঙতেই পোর্ট হোলের ভিতর দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল কুয়াশা। সকাল হয়ে গেছে। উজ্জ্বল ঝলমলে সকাল। ঘড়িতে দেখল আটটা বাজে। দ্রুত শয্যা ত্যাগ করল কুয়াশা। আধঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট শেষ করে কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল সে। সিগারেট ধরিয়ে ডেকে গিয়ে দাঁড়াল। অদূরে রোদের আলো রোজমেরীর গায়ে ঠিকরে পড়ছে। ডেকে একটা লোকও দেখতে পেল না কুয়াশা। কি যেন একটা সন্দেহ হল তার মনে।

সেলুনে ফিরে কুয়াশা ফিল্ড গ্লাস বের করল। ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে পোর্ট হোলের ভিতর দিয়ে রোজমেরীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। রোজমেরীর ডেক হাউসের ছায়ায় হাঁটুর উপর বিনকিউলার নিয়ে একজন বসে আছে। কুয়াশার মনে হল লোকটার দৃষ্টি তার পোর্ট হোলের দিকেই নিবদ্ধ।

ফিল্ড গ্লাসটা রেখে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কুয়াশা। তাহলে তার সম্পর্কে জো এখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে। এখন আর লুকোচুরির বালাই নেই। লড়াই হবে এবার সামনাসামনি।

কিন্তু কিছু একটা করতে হবে এডিথের জন্যে। জো শুধু যে তার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে তাই নয়, সম্ভবত সে এডিথের উদ্দেশ্যও নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছে। এডিথ একবার যদি জো'র খপ্পরে পড়ে তাহলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। অথচ মেয়েটাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। ভবিষ্যতে রোজমেরীতে যেতে বাধা দিতে হবে তাকে।

ফোন করে নিষেধ করতে হবে। এডিথের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। দি ফগের দিকে জো যেমন লক্ষ্য রেখেছে তেমনি হোটেল ডি এলিসাতেও নিশ্চয়ই ছড়িয়ে রেখেছে অনেক লোক। ছদ্মবেশ পরে যাওয়া হয়ত চলে, কিন্তু যে কেউ এডিথের সাথে দেখা করলেই ওর উপর সন্দেহ বেড়ে যাবে। ফলে কামালকে পাঠালেও কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া তাকে হয়ত চিনেও ফেলতে পারে। ভাগ্যের জোরে আর এক অজ্ঞাত বন্ধুর কৃপায় কামাল রোজমেরী থেকে পালিয়ে

আসতে পেরেছে।

কুয়াশা দি ফগে ফিরবার আধঘণ্টা পরেই শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় ফিরেছে কামাল। সুস্থ হয়ে ওঠার পর জো স্টিফেনের ইয়টেই তার পরম শত্রু আছে জানতে পেরে কুয়াশা অবাকও হয়েছে খুশিও হয়েছে। কুয়াশার ধারণা যে হিপ্পিটা গতকাল তাকে অনুসরণ করেছিল সম্ভবত সে-ই কামালকে রোজমেরী থেকে পালাতে সাহায্য করেছে। সন্দেহ নেই লোকটা জো'র নির্দেশেই তাকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু তার নিজেরও বোধহয় কোনও উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্যটা অসাধু নাও হতে পারে।

বাইরে খুক খুক কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। কুয়াশা শব্দ শুনে বুঝল চার্লি বাইরে অপেক্ষা করছে। সে ডাকল, 'চার্লি।'

'জ্বি,স্যার।'

'মি. আহমেদ কি এখনও ঘুমোচ্ছেন?'

'জ্বি, স্যার।'

'তাকে ডেকে তুলে প্রস্তুত হয়ে নিতে বল। আর ইয়টটা আজকে ধুয়ে ফেলা দরকার, কি বল?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

'তাহলে মি. আহমেদকে ডেকে দিয়ে তুমি নোঙর তুলে ফেল।'

ন'টার সময় চ্যানেল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে এগোল দি ফগ। মাইল খানেক ঘুরে যেখানে গিয়ে দি ফগ নোঙর করল সেখান থেকে রোজমেরীকে দেখা যায় না। এতক্ষণ চারদিকে খেয়াল রেখেছে কুয়াশা। কেউ তার বোট অনুসরণ করছে না। এটা বীচের পূর্ব প্রান্ত। জায়গাটার নাম প্লেজ দ্য একলুজ। হুইল ছেড়ে ডিঙিতে নামল কুয়াশা।

কামাল ততক্ষণে চার্লির বীচ রোব পরে ফেলেছে। কুয়াশার পিছনে পিছনে সে-ও ডিঙিতে নামল। কুয়াশা বলল, 'তুমি বীচেই থাকবে। অন্তত আধঘণ্টা পরে যাবে হোটেলের দিকে। তার আগে নয়।'

মিনিট তিনেক পরে সূর্য স্নানার্থীদের ভিড়ে মিশে গেল কুয়াশা। কামালকে পিছনে ফেলে সে একটা ক্যাসিনোতে ঢুকল। এডিথকে টেলিফোন করতে হবে।

ফোনে এডিথকে পাওয়া গেল না। কাউন্টার ক্লার্ক বলল, 'মিস গ্রে এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন। কোনও মেসেজ থাকলে দিতে বলে গেছেন। আর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনার নামটা বলতে পারেন। সেই রকমই বলে গেছেন মিস গ্রে। বাই দা ওয়ে উনি প্রফেসর রোজেনবার্গের বক্তৃতা শুনতে গেছেন জিওগ্রাফি সোসাইটিতে।

'আমার নাম জন আর্থার ফগ। মিস গ্রেকে জানাবেন।'

'ওহ আপনি মি. ফগ? আপনার জন্য মিস গ্রে একটা মেসেজ রেখে গেছেন।

যদি দয়া করে এসে নিয়ে যান।'

'ও. কে, আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি।'

পঁচিশ মিনিট পরে হোটেল ডি এলিসার কাউন্টারে পৌছুল কুয়াশা। কাউন্টার ক্লার্ক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। কুয়াশা অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, জন আর্থার ফগ।

প্রাচীন কাউন্টার ক্লার্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুয়াশাকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ড্রয়ার থেকে সীলমোহর করা একটা এনভেলাপ বের করে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল কুয়াশা।

ট্যাক্সিতে উঠেই খামটা ছিঁড়ে ফেলল কুয়াশা। একটা ছোট চিরকুট। তাতে লেখাঃ অক্ষাংশ, ৪৯° ৪১°.৫৬ উত্তর, দ্রাঘিমা ২২৩° ৪৫° পশ্চিম। ছিঁড়ে ফেলুন।

টুকরো করে চিরকুটটা ছিঁড়ে ফেলল কুয়াশা। ট্যাক্সির অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিল টুকরোগুলো।

বীচে ফিরে গেল কুয়াশা। অসংখ্য নরনারীর ভিড়। চিৎকার, হৈ চৈ বেদম চলছে। একটা ক্যাসিনোর দিকে এগোল কুয়াশা। গলাটা শুকিয়ে গেছে, ভিজিয়ে নিতে হবে। ক্যাসিনোতে ঢুকেই সে অবাক হল। জো আর সেই হিপ্পি বসে আছে। জো'র দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ। চোখে চোখ পড়তেই জো তাকে হাত তুলে ইশারা করল। কুয়াশা মৃদু হেসে এগিয়ে গেল।

কুয়াশাকে একটা চেয়ারে বসবার ইশারা করে জো তার স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমি সকালে গিয়েছিলাম আপনার খোঁজ করতে। আপনার ইয়টটাই দেখতে পেলাম না।'

'ওয়াশ করতে নিয়ে গিয়েছিলাম,' ঢোক গিলল কুয়াশা। 'প্রফেসর কোথায়?'

'উনি গেছেন জিওগ্রাফি সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে। আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম। অবশ্য পেপারটা আমি আগেই পড়েছি। মিস গ্রেও গেছেন প্রফেসরের বক্তৃতা শুনতে।'

'কে গেছেন?' কুয়াশা প্রশ্ন করল। 'কোন্ মিস গ্রে?' হুইস্কিতে সোডা মেশাতে মেশাতে নির্বিকারভাবে বলল, 'মাফ করবেন, আমি ঠিক চিনতে পারছি না। কে এই ভদ্রমহিলা?'

'কাল ক্যাসিনোতে যিনি আমাদের সাথে—ও অত্যন্ত দুঃখিত। আমারই ভুল হয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল গতকাল যখন আমাদের দেখা হয়েছিল মিস গ্রে তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উনি আমাদের সাথে যাচ্ছেন প্রফেসর রোজেনবার্গের এক্সপেরিমেন্ট দেখতে। অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি আমার দার্শনিক বন্ধু মসিয়ে গুস্তভ আতোয়ান। উনিও আমাদের সঙ্গী হবেন। ইনি মি. ফগ।

কুয়াশা আর আতোয়ান অভিবাদন বিনিময় করল।

আতোয়ান এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। নীরবে গ্লাসে চুমুক দিয়েছে আর ওদের কথা শুনেছে। কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল কুয়াশার দিকে নিবদ্ধ। কুয়াশা জানে, লোকটা তার শক্তি যাচাই করছে।

আতোয়ান জিজ্ঞেস করল, 'জো, মি. ফগও কি আমাদের সঙ্গী হচ্ছেন?'

'আমার তো তাই ধারণা। সেটা জানবার জন্যেই তো সকালে ওঁর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। মি. ফগ, আপনি নিশ্চয়ই আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টাননি?'

'মোটেও না। কিন্তু যাত্রা করছেন কবে?'

'কাল রওনা দেব আমরা। আজকে রাতে আমরা প্রফেসর রোজেনবার্গের অভিযানের সাফল্য কামনা করে একটা ডিনার দিচ্ছি। অবশ্যই অতিথির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। মি. ফগ, আপনি অবশ্যই আসছেন আমাদের ডিনারে।'

'সানন্দে। কিন্তু কোথায়?'

'এই ক্যাসিনোতেই। সেই ব্যবস্থা করতেই এখানে এসেছিলাম। প্রফেসর আর মিস গ্রে এক্ষুণি এখানে আসবেন। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতে হবে, মি. স্টিফেন। আমি এবারে উঠব।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কুয়াশা।

'আসছেন কিন্তু ডিনারে।'

'অবশ্যই।' ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে গেল কুয়াশা। দু'জোড়া দৃষ্টি তাকে পর্যবেক্ষণ করছে তা সে জানে। কিন্তু তাদের একজনকে ভয় পাবার কিছু নেই।

বার

বিরাট হলঘর ভর্তি শ্রোতা। প্যারিস ইনস্টিটিউট অব জিওগ্রাফির ছাত্রদের জন্য দিনার্দ জিওগ্রাফি সোসাইটি প্রফেসর রোজেনবার্গের এই বক্তৃতার আয়োজন করেছে। বক্তৃতার বিষয় ঃ 'মহাসাগরের অতলে'।

সামনের সারিতে বসেছিল এডিথ। জো স্টিফেন বক্তৃতা শুনতে না আসায় খুশি হয়েছিল সে। মন দিয়ে প্রফেসরের বক্তৃতা শুনছিল। প্রফেসর বক্তৃতা দেন অপূর্ব। গলাটা চমৎকার, ভাষা সুন্দর আর প্রকাশভঙ্গী মনোজ্ঞ। মুগ্ধ হল এডিথ।

প্রফেসর বললেন, 'এই মহাশূন্য যুগেও কিন্তু আমাদের নিজেদের গ্রহ সম্পর্কে আমরা সবটা জানি না। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ জলাভূমি। এই জলাভূমির অতলে কি আছে আমরা তার কতটুকুই বা জানি? সেখানে যেমন আছে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ তেমনি আছে বিপুল খাদ্য সম্ভার আর আছে হাজার হাজার অজ্ঞাত প্রাণী। আজকের পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তাতে করে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে মহাসাগরের অতলের খাদ্যসম্ভারের দিকে। আমার বিশ্বাস মহাসাগরগুলোর অতলে যে বিপুল খাদ্যসম্ভার

আছে তা যেমন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ক্ষুধা দূর করতে সহায়তা করবে তেমনি সেখানকার খনিজ দ্রব্যও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। মানুষের জ্ঞানের সীমাও সম্প্রসারিত হবে। মহাসাগরের অতল গর্ভে এমন অনেক প্রাণী আছে, মানুষ এখনও যাদের কথা শোনেনি। হয়ত তারা কোনদিনই সূর্যের আলোর দেখা পায়নি। হয়ত সারা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বাইওগ্লুবিন নিয়েই জন্মেছে।

'সমুদ্রের সেই অতলে হয়ত দেখা মিলবে সী সার্পেন্টের। যুগ যুগ ধরে মানুষ যার সম্পর্কে কল্পনা করে এসেছে।'

প্রফেসরের কণ্ঠ স্বপ্নালু হয়ে উঠল।

মাঝেমাঝে ফ্লাশগান জ্বলে উঠছে। পিছনের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল ছাত্ররা বক্তৃতা নোট করছে।

প্রফেসর বলে চলেছেন, 'মহাসাগরের অবতরণ নিয়ে আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। আমি নিজেও যৎসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে, আশা করি, মহাসমুদ্রের গভীরতম স্থানে অবতরণ কিছু দিনের মধ্যেই সম্ভব হয়ে উঠবে।'

বিপুল করতালির মধ্যে প্রফেসরের বক্তৃতা শেষ হল। তিনি ডায়াস থেকে নামতেই একদল সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। এডিথ অতিকষ্টে সাংবাদিকদের ব্যূহ ভেদ করে বের করে আনল প্রফেসরকে। বিব্রত প্রফেসর ধন্যবাদ জানালেন এডিথকে।

এক সাংবাদিক এডিথকে প্রশ্ন করল, 'মাফ করবেন। প্রফেসরের সাথে আপনার সম্পর্ক জানতে পারি?'

'আমি ওঁর ছাত্রী। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন।' ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলল এডিথ।

ডিনারেই জো কুয়াশার সাথে এডিথকে আলাপ করিয়ে দিল, 'ইনি মি. জন আর্থার ফগ। আমার নতুন বন্ধু। ইনি মিস এডিথ গ্রে, আমার বান্ধবী।'

'হাউ ডু ইউ ডু।'

'হাউ ডু ইউ ডু।'

চমৎকার অভিনয় করল এডিথ। সুন্দর করে সেজে এসেছে সে। প্যারিসের শ্রেষ্ঠ ফ্যাশন হাউজের ম্যানিকুইন বলে মনে হচ্ছিল ওকে ক্যাসিনোর উজ্জ্বল নীলাভ আলোয়। ক্যাসিনোতে গাদা গাদা মেয়ের মধ্যে অনন্যা বলে এডিথকে মনে হল কুয়াশার।

এডিথ কুয়াশা আর প্রফেসরের মাঝখানে বসল। রসনাতৃপ্তিকর চমৎকার খাবার। প্রফেসর একাই ডিনার টেবিল সরগরম করে রাখলেন। জো, আতোয়ান

আর কুয়াশা—এরা বড় একটা কিছু বলল না। নীরবে খেতে খেতে প্রফেসরের কথা শুনল আতোয়ান। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। খাওয়া শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ গল্প গুজব হল। একসময় এডিথ প্রস্তাব করল, 'আসুন, মি. ফগ। একটু নাচা যাক।'

অপ্রস্তুত হল কুয়াশা। এডিথ এমন বেয়াড়া প্রস্তাব করতে পারে এর আগে ভেবে দেখেনি কুয়াশা। ঢোক গিলে কুয়াশা বলল, 'আমাকে বলছেন, মিস গ্রে? আমি অত্যন্ত দুঃখিত। পায়ে একটা ব্যথা আছে। আমার পক্ষে নাচাটা বোধহয় সম্ভব হবে না। ডাক্তারের নিষেধ আছে।'

'কিছু ক্ষতি হবে না, আমি বলছি। আসুন।' আবদার করল এডিথ।

কুয়াশার দুরবস্থা অনুভব করে বোধহয় প্রফেসরের মায়া হল। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন, মিস গ্রে। আমার সাথে। আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছে।'

'সেই ভাল। আমি বরং আপনাদের নাচ দেখি।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল কুয়াশা।

দ্রুত সুরে বেজে চলেছে ওয়ালজের সুর। গুচ্ছের জোড়া জোড়া মেয়ে পুরুষ নাচছে। প্রফেসর ও এডিথ তাদের সাথে মিশে গেল।

জো, আতোয়ান ও কুয়াশা আবার গ্লাস ভর্তি করল। এক রাউণ্ড শেষ হতেই চলে এলেন প্রফেসর। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। চেয়ারে বসতে বসতে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ওহ গড, নাচটা একদম ভুলে গেছি। কতদিন অভ্যাস নেই।'

কুয়াশা প্রফেসরের গ্লাস ভর্তি করে দিল। এডিথ তখন অন্য একজনকে পাকড়াও করে নাচছে।

প্রফেসর কিছুক্ষণ পরেই বললেন, 'মাফ করবেন, মি. ফগ, আমাকে এবার উঠতে হবে।'

জো দ্রুত বলল, 'আমি দুঃখিত, মি. ফগ। প্রফেসরের অনেক কাজ। আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। আতোয়ান, তুমি প্রফেসরকে নিয়ে চলে যাও।'

আমি একাই যেতে পারব, মি. স্টিফেন। প্রফেসরের কণ্ঠে বিরক্তির আভাস।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আতোয়ানকেও ফিরতে হবে ইয়টে।' জো তার স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বলল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। আসুন, মঁসিয়ে, আমরা এগোই।'

আতোয়ান কুয়াশার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। জো কুয়াশাকে বোঝাল, 'প্রফেসর রোজেনবার্গ অত্যন্ত ভুলোমন। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই। সঙ্গে কাউকে না কাউকে সবসময় রাখতেই হয়।'

কুয়াশা জবাবে শুধু হাসল।

ক্যাসিনোতে নারী বিবর্জিত পুরুষরা হচ্ছে লা-ওয়ারিশ মাল। কুয়াশা ও

জো'কে নারীসঙ্গীহীন অবস্থায় বসে থাকতে দেখে জনাকয়েক তরুণী ছুটে এল ওদের দিকে। কুয়াশা অতি কষ্টে নাচের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেও জো বিনা আপত্তিতে রাজি হয়ে গেল।

নাচের তখন আর এক রাউণ্ড শেষ হয়েছে। নতুন রাউণ্ড শুরু হবার আগেই এডিথ এসে কুয়াশার সামনে বসল। কুয়াশা হাসল। সে জানে এডিথ এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

অনেকক্ষণ নেচে এডিথ পরিশ্রান্ত হয়েছিল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল এডিথ। কুয়াশা একটা গ্লাস ভর্তি করে ওর দিকে এগিয়ে দিল। জো তখন এক তরুণীর বাহুলগ্ন হয়ে নেচে চলেছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে ঠোঁটে গ্লাস তুলল এডিথ। দুই-এক চুমুক দিয়ে এডিথ বলল, 'ইউ আর রিয়েলী গ্র্যাণ্ড, মি. ফগ।'

প্রশংসা কানে তুলল না কুয়াশা। অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কখন ফিরেছিলেন, মিস গ্রে?'

'রাত একটার দিকে। আসতে কি দিতে চায়। কত খোশামোদ।' চোখ দুটো বড় বড় করে গ্রীবাভঙ্গী করল এডিথ।

কুয়াশা হেসে বলল, 'থেকে গেলেই পারতেন।'

'আজ রাতে আবার যাবার কথা ছিল।'

'যাবেন নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল এডিথ, 'কাল যাব বলেছি। কালকেই ওরা যাবে সেন্ট পিটার পোর্টে। সেখানেই প্রফেসরের বাথিস্টল পরীক্ষা করা হবে। আপনি নিশ্চয়ই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি অবশ্যই যাচ্ছেন না।' দৃঢ় গলায় বলল কুয়াশা।

তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় চমকাল এডিথ। কুয়াশার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তা হয় না, মি. ফগ। যেতে আমাকে হবেই। আমার মন বলছে জো'র দিন ঘনিয়ে আসছে। আর তার সর্বনাশটায় যদি নিজে অন্তত কিছুটা অংশ নিতে না পারি তাহলে আমার বাবার আত্মা শান্তি পাবে না। প্লীজ, মি. ফগ, বাধা দেবেন না আমাকে।'

কুয়াশা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন।'

'আপনি থাকতে আমি কোনও কিছুতেই ভয় পাই না।'

কুয়াশা বলল, 'ওটা বোকামি। সাবধানের মার নেই। আপনার অসাবধানতার ফলে কিছু একটা ক্ষতি হয়ে গেলে তখন আমার করবার কিছুই থাকবে না।'

'আমার মেসেজ পেয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল কুয়াশা। বলল, 'কাজটা কিন্তু বোকার মত হয়েছে। ওটা জো'র হাতে পড়তে পারত।'

এডিথ সে-কথা কানে না তুলে বলল, 'ওটাতে কি আছে আমি নিজে কিন্তু তা জানি না। চার্টটা দেখে আমি অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা বের করে টুকে রেখেছিলাম কাল রাতেই। ওখানে কি কোনও জাহাজ ডুবেছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছিনা। খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি, ওখানে কখনও কোনও জাহাজ ডুবেছে এমন কোনও তথ্য কোথাও পাইনি। আমার ধারণা এখানেই আছে জো'র গোপন ধনাগার।'

এডিথের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, 'মি. ফগ, আমিও তাহলে কিছু কিছু ভালো কাজ করতে পারি।'

'নিশ্চয়ই পারেন, মিস গ্রে,' স্বীকার করল কুয়াশা।

'এরপরও কি আপনি আমাকে রোজমেরীতে প্রফেসর রোজেনবার্গের অভিযানে যোগ দিতে নিষেধ করবেন?'

কুয়াশা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'নিষেধাজ্ঞা তো আগেই প্রত্যাহার করেছি, মিস গ্রে।'

'অন্তর থেকে করেননি।'

হেসে ফেলল কুয়াশা। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'কামালের খবর শুনেছেন কিছু, মিস গ্রে?'

'না তো। কেন, কিছু হয়েছে?' ভীত কণ্ঠে বলল এডিথ।

গতরাতের ঘটনা খুলে বলল কুয়াশা।

সমস্তটা শুনে খুশিতে উপচে পড়ল এডিথ। 'তাহলে, তাহলে রোজমেরীতেও—'

জুতোর উপর জোর একটা চাপ অনুভব করতেই থেমে গেল এডিথ।

'এই যে মিস্টার স্টিফেন ফিরে এসেছেন এতক্ষণে। সময়টা নিশ্চয়ই চমৎকার কাটল আপনার?' কুয়াশা হাসিমুখে প্রশ্ন করল।

জো বসতে বসতে বলল, 'মন্দ নয়। তুমি আমার সাথে নাচবে, এডিথ?' কর্কশকণ্ঠে অনুনয় করল জো।

এডিথ রাজি হয়ে গেল।

তের

কুয়াশার ডিঙি নিঃশব্দে দি ফগের পিছনে ভিড়ল। চারদিকে গভীর অন্ধকার। ডেক থেকে মলিন নীল আলো দি ফগের চারদিকের অন্ধকারকে ঈষৎ ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। নিঃশব্দে ডেকের উপর উঠল কুয়াশা। ডিঙিটাকে বাঁধল দি ফগের সাথে।

স-শ-স।

খসখসে একটা শব্দ ভেসে এল ইয়টের সামনের দিক থেকে। কুয়াশার মনে হল তার স্টাডি থেকে শব্দটা আসছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। শব্দটা আর পাওয়া গেল না।

ঝনন ঝনন ঝনন।

সরোদের ঝংকার। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। সরোদের তারে আঘাত লেগেছে। কেউ নিশ্চয়ই ঢুকেছে তার স্টাডিতে। কে হতে পারে? নিশ্চয়ই বোকা চার্লিটা। রাতদুপুরে ঘর গোছাতে লেগেছে।

নিঃশব্দে স্টাডির দিকে এগোল কুয়াশা। কিচেনের পাশ দিয়ে যেতেই আধো অন্ধকারে দেখতে পেল দরজাটা খোলা। ডেকের অনুজ্জ্বল আলো পড়েছে কিচেনের মেঝেতে। চমকে উঠল কুয়াশা, কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নিচু হয়ে লোকটার মুখ দেখবার চেষ্টা করল। লোকটা আর কেউ নয়, তারই বাটলার চার্লি। চার্লির হাতের কাছে ছোট একটা লোহার রড।

মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কুয়াশার মাথার মধ্যে। আরও ভাল করে দেখল কুয়াশা চার্লিকে। চিৎ করে শোয়াল। বাঁ হাতের শার্টের হাতাটা রক্তে ভেজা। হাতাটা সরিয়ে দেখল গুলি লেগেছে হাতে। কিন্তু ক্ষতটা গভীর নয়। চামড়া ছুঁয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। রক্ত পড়েছে বিস্তর। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। আরও দু-এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা চলবে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে চার্লির।

আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিল চার্লিকে। মাথার চুলগুলো নেড়ে দিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল চার্লি। কুয়াশা উঠে দাঁড়াল।

খটাং করে একটা শব্দ কানে এল কুয়াশার। মেঝেতে পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলে নিল। হাত দিয়ে পকেটে পিস্তলের অস্তিত্ব একবার অনুভব করল। এবারে শব্দটা এল সেলুন থেকে।

অতি সাবধানে কুয়াশা এগিয়ে গেল সেলুনের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছুতেই খুলে গেল সেলুনের দরজা। একরাশ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল ডেকের উপর, আর সেই আলোতে একটা ছায়া নড়ে উঠল। পর-মুহূর্তেই একটা ছায়ামূর্তি পিস্তল হাতে দাঁড়াল তার সামনে। পিস্তলটা দীর্ঘ দেখাচ্ছে সাইলেন্সার লাগানোর ফলে।

ছায়ামূর্তি ধমকের সুরে বলল, 'কাছে এস না, মারা পড়বে।' কুয়াশা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াল। সতর্ক পদক্ষেপে লোকটা এগিয়ে এল কুয়াশার দিকে।

'কিন্তু তোমার আচরণটা মোটেই অতিথির মত নয়। প্লীজ, আমি ভয় পাচ্ছি। তোমার ঐ অস্ত্রটা নামাও।' লোহার রডটা নাড়তে নাড়তে বলল কুয়াশা।

'ইয়ার্কি মারা হচ্ছে?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ঘুরে দাঁড়াও।'

'তা দাঁড়াচ্ছি। গুলি-টুলি কর না যেন আবার।' ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কুয়াশা

বলল, 'তোমার হাতে যে অস্ত্র রয়েছে ওটাকে কাজে না লাগালেই আমি খুশি।'

'সেকথা মনে থাকে যেন। গোলমাল করার চেষ্টা কর না। এতটুকু ঝামেলা করেছ কি শেষ হয়ে যাবে।'

কুয়াশা তা ভাল করেই জানে। সুতরাং সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানে সময় তার আসবেই। ছায়ামূর্তি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। দেখাই যাক্ না ওর দৌড় কতটা।

'হাতের জিনিসটা নামিয়ে ফেল।' কঠোর স্বরে আদেশ করল লোকটা।

'কি ফেলে দেব? আমার ছোট্ট ছাতাটা?'

'ছাতাই হোক আর মাথাই হোক। ফেলে দাও।' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা।

'কিন্তু মাথা ফেলব কি করে বুঝতে পারছিনা।'

'ঠাট্টা করার চেষ্টা কোরো না। নামাও ওটা।'

কুয়াশা মাথাটা নুইয়ে লোহার রডটা রাখল পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা ছাইদানীর উপর।

'এবার দু-পা এগিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান, চালাকি করবার চেষ্টা করবে না।'

মেপে দু-পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। মনে মনে হাসল সে। সুযোগ এসে গেছে। কান খাড়া করে রইল ক্ষীণ একটা শব্দের অপেক্ষায়। ছাইদানীর উপর রেখেছে লোহার রডটা। তুলতে গেলে একটু শব্দ হবেই। সে শব্দটা যতই ক্ষীণ হোক কুয়াশার কানে পৌঁছুবেই। আর সেই শব্দই লোকটার পরাজয় ডেকে আনবে।

পেশীগুলো দৃঢ় করল কুয়াশা আসন্ন মুহূর্তের জন্যে। চোখের কোণ দিয়ে লোকটার কার্যকলাপ দেখবার চেষ্টা করল একবার। কিছু দেখা গেল না।

তারপর এল সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি। লোকটা নিঃশব্দে লোহার রডটা তুলে নেবার চেষ্টার কসুর নিশ্চয়ই করেনি। কিন্তু তবুও অতি ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এল কুয়াশার। আর সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দেহটা নড়ে উঠল।

লোকটা তা বুঝে উঠবার আগে কুয়াশার ডান পা-টা পিছন দিকে চলে গেল। যেন লুনার মডিউল নিক্ষিপ্ত হল এপোলো-১১ থেকে। লোহার রড তুলতে গেলে তার মাথাটা যে পর্যন্ত নামবে ঠিক সেই খানে চলে এল কুয়াশার ডান পা। আর আগন্তুকের মাথাটা ঠিক সে জায়গাতেই ছিল।

প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল লোকটা। হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা ছিটকে পড়ে ঠকাস করে শব্দ হল।

ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। কাত হয়ে পড়ে গেছে লোকটা। যন্ত্রণায় মুখটা কুৎসিত হয়ে গেছে। ন্যাড়ামাথা থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। তবুও উঠে বসবার চেষ্টা করছে সে ইতিমধ্যেই।

কুয়াশা পকেট থেকে ধীরেসুস্থে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা

সিগারেট ধরাল। একটু পরেই লোকটা উঠে বসল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে। সে দৃষ্টিতে আছে ভয়, বিস্ময়, অসহায়তা আর কাতর প্রার্থনা।

নীরবে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল কুয়াশা। লোকটাকে আর কোনও দৈহিক শাস্তি সে দেবে না। ওর প্রভু জো স্টিফেনের মত মানসিক শাস্তি দেবে কিছুক্ষণ।

পিছনে একটা শব্দ শুনতে পেল। চার্লির পরিচিত পদক্ষেপ। মুখ ফিরিয়ে কুয়াশা দেখল চার্লি এগিয়ে আসছে। তার হাতে মস্ত বড় একটা লোহার ডাণ্ডা।

শব্দটা লোকটার কানেও গিয়েছিল। চার্লিকে লোহার রড নিয়ে এগোতে দেখে আঁতকে উঠল সে। চার্লির চোখে সে স্পষ্ট খুনের নেশা দেখতে পেল। সারা দেহ একবার কেঁপে উঠল। চোখ দুটো বন্ধ করল।

কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেছে। লোকটা চোখ খুলল ভয়ে ভয়ে। দেখল লোহার রডটা তার মাথার উপর শূন্যে থেমে আছে।

তার কানে এল, 'করছ কি, চার্লি, লোকটা মরে যাবে যে।'

'আমি ওকে মেরেই ফেলব। ব্যাটা খুনে। আর একটু হলে আমাকেই খুন করেছিল!' চিৎকার করে উঠল চার্লি।

কুয়াশা বলল, 'উত্তেজিত হয়ো না, চার্লি। তোমার মনের অবস্থা দিয়ে ওর মনের অবস্থাটা এখন চিন্তা করে দেখ।'

'কিন্তু আমি তো চোর-ডাকাত নই, খুনেও নই। ও যে খুনে। প্লীজ, স্যার, আমাকে বাধা দেবেন না।'

'তা হয় না, চার্লি। মানুষকে ক্ষমা করতে শেখ।'

'অত্যন্ত বিরক্ত হল চার্লি। সে বলল, 'স্যার, অপাত্রে ক্ষমা করা অর্থহীন। সুযোগ পেলে ও আবার আসবে খুন করতে।'

'তুমি এবার এখান থেকে যাও। সেলুনের ড্রয়ারে ফার্স্ট এইড বক্স আছে। বের কর। তোমার হাতটা বেঁধে দিতে হবে।'

'কিন্তু, স্যার।'

'প্লীজ, চার্লি।'

মাথা নত করে চলে গেল চার্লি। যাবার সময় ক্রুদ্ধদৃষ্টি হেনে গেল আহত আগন্তুকের দিকে। সে এতক্ষণে ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় তার স্নায়ুতে কোনও তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারছিল না।

চার্লি দৃষ্টির আড়াল হতেই কুয়াশা বলল, 'তুমি এবারে যেতে পার।'

লোকটা বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিল না তার কান দুটোকে। সে কুয়াশার দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

'তুমি এবার যেতে পার,' আবার বলল কুয়াশা। 'কিন্তু পিস্তলটা রেখে যেতে হবে। ওটা আমার পুরস্কার।'

লোকটা কোনও কথা বলল না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। কুয়াশার কথা সে

যেন এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে। পিস্তলের দিকে সে ফিরেও তাকাল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ইয়টের পিছন দিকে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার মূর্তি।

চোদ্দ

পরদিন সকাল দশটায় দিনার্দ বন্দর ত্যাগ করল রোজমেরী। চার্লির হাতে দি ফগ-এর দায়িত্ব চাপিয়ে কুয়াশা সঙ্গ নিল জো স্টিফেনের।

সেইদিন রাতে দি ফগের সেলুনে বসেছিল কামাল, শহীদ ও মহুয়া। কুয়াশাকে না জানিয়েই কামাল কায়রোতে কেব্‌ল্ পাঠিয়েছিল শহীদের কাছে দ্রুত দিনার্দ হারবারে আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে। কামালের ধারণা কুয়াশা এবার তার জীবনের চরম বিপদের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে। খবরটা অন্তত মহুয়া বৌদিকে না জানালেই নয়। হাজার হলেও কুয়াশা তো মহুয়ার সহোদর ভ্রাতা। সে কেব্‌ল্ পাঠিয়েছিল তাই মহুয়া আর শহীদের কাছে। কুয়াশার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় কেব্‌লে। তাই লিখেছিলঃ আমি বিপদাপন্ন। চলে এস এক্ষুণি। কামাল জানে এই কেবল পেলে শহীদ একমুহূর্ত দেরি করবে না।

আর ঘটেছেও তাই। টেলিগ্রাম পেয়ে দেরি করেনি শহীদ খান। প্রথম বিমানেই চলে এসেছে প্যারিসে মহুয়া আর গফুরকে নিয়ে। প্যারিস থেকে ট্রেনে বিকেলেই এসে পৌঁছেছে দিনার্দ।

সকালে কুয়াশা রোজমেরীতে যাবার আগে কামালকে বলেছিল যে সে ইচ্ছে করলে দি ফগ-এ থাকতে পারে। প্রস্তাবটা মনঃপুত হয়েছিল কামালের। তাই পোঁটলা-পুঁটুলি বেঁধে হোটেলের সুইট ছেড়ে দিয়ে সকালে আশ্রয় নিয়েছে কুয়াশার ইয়টে। শহীদদেরকেও নিয়ে এসেছে এখানেই।

জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় চার্লি খুশি হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমান গফুরকে পছন্দ হয়নি তার। গফুরেরও চার্লিকে তেমন পছন্দ হয়নি। ইতিমধ্যেই দুজনের মধ্যে ক্রুদ্ধ ভাব বিনিময় হয়েছে। কিন্তু একজন অন্যের ভাষা না জানায় আর মহুয়ার চেষ্টায় ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি।

রাতের খাওয়া শেষে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিবরণ দিচ্ছিল কামাল। মহুয়া সবটা শুনে বলল, 'এতটা ঝুঁকি নেওয়া দাদার ঠিক হয়নি।' তার গলায় আশঙ্কার রেশ।

শহীদ হেসে বলল, 'একথা তোমার মুখে শোভা পায় না, মহুয়া। তোমার ভাই সম্পর্কে এতটা জানবার পরও একথা কি করে তুমি বল? এরকম একটা শয়তানকে শুধুমাত্র কুয়াশাই শায়েস্তা করতে পারে। অবশ্য আরও একজন লোক আছে। সেও পারে জো স্টিফেনকে শাস্তি দিতে।'

'কে সে?' মহুয়া প্রশ্ন করল।

'তোমার একমাত্র দেবর।' গম্ভীর হবার ভান করল শহীদ।

'কামাল?' চটে গেল মহুয়া।

কামালও চটল।

মহুয়া রাগে গর গর করতে করতে বলল, 'এটা কি ঠাট্টার ব্যাপার হল নাকি?' প্রচণ্ড ক্রোধের জন্যই বোধহয় আর কোনও কথা সে বলতে পারল না।

কামাল চটে গিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে অনেকগুলো পদশব্দ শোনা গেল। খোলা দরজা দিয়ে একটা আবছা ছায়াও দেখা গেল। তিনজনেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হল দরজার দিকে।

'স্যার,' কম্পিত কণ্ঠ শোনা গেল চার্লির।

'কে চার্লি? ভিতরে এস।'

'পু-পুলিস স্যার।'

'পুলিস?' শহীদ অবাক হয়ে বলল। 'বেশ তো কি চায়? নিয়ে এস এখানে।'

পুলিসের পোশাক পরা দুজন এসে ঢুকল সেলুনে। তাদের পিছনে ঢুকল সাদা পোশাক পরিহিত অন্য এক ভদ্রলোক।

শহীদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুকদের দিকে। পুলিসদের মধ্যে ছিলেন দিনার্দ পুলিস স্টেশনের চীফ ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখিত, মশিয়ে···'

'শহীদ খান।' আবৃতি করল শহীদ। 'উনি কামাল আহমেদ, আমার বন্ধু। ইনি আমার স্ত্রী।'

ইন্সপেক্টর মাথাটা সামান্য নুইয়ে বললেন, 'আপনাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। তবে কিনা পুলিসের চাকরি। আনপ্লেজেন্ট জব।'

ততক্ষণে পুরোপুরি ধাতস্থ হয়েছে শহীদ। সে বলল, 'বসুন, মসিয়ে ইন্সপেক্টর। কিন্তু এই ইয়টে কি মনে করে?'

'আমি···আমি এসেছি মশিয়ে ল্যাম্বের খোঁজে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে।'

'মশিয়ে ল্যাম্প।' সাদা পোশাক পরা ভদ্রলোক শুধরে দিলেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মশিয়ে ল্যাম্প।'

'কিন্তু আমরা তো ঐ নামের কাউকে চিনি না!' বিস্মিত শহীদ বলল।

ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'না চেনাটাই স্বাভাবিক। আমি জানতাম আপনারা চিনবেন না,' বক্রোক্তি করলেন তিনি।

'তাহলে আর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?' পাল্টা বক্রোক্তি করল শহীদ।

ইন্সপেক্টর কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন শহীদের দিকে। তিনি বললেন, 'এই ইয়টের মালিক কে জানতে পারি?'

'ইয়টের মালিকের নাম মি. ফগ। আর্নেষ্ট হ্যারল্ড ফগ।' জবাব দিল কামাল।

'তা হতে পারে। কিন্তু মি. ল্যাম্প এই ইয়টেই বাস করছেন। এমন কি গতকালও তাকে এই ইয়টে দেখা গেছে। এখন বলুন কোথায় তিনি?'

শহীদ বলল, 'আমার মনে হয়, মসিয়ে ইন্সপেক্টর, কোথাও কোনও ভুল হয়ে গেছে আপনার।'

মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। 'ভুল হতেই পারে না, মশিয়ে খান। আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইনি, হোটেল ডিলা মেয়ারের ম্যানেজার, তার স্বাক্ষী। মি. ল্যাম্প এর হোটেলে ছিলেন কয়েকদিন।'

শহীদ কি যেন ভেবে বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে মশিয়ে ফগকেই আপনি মশিয়ে ল্যাম্প বলে চেনেন।'

'তা কি করে হবে। ও হ্যাঁ, তা-তাতা হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ তা হতে পারে বৈ-কি। তা সেই মশিয়ে ফগ রূপী মশিয়ে ল্যাম্প কোথায়?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন।

'মি. ফগ এখন এখানে নেই।'

'গেছেন কোথায়?'

'তাও জানি না।'

'জানেন ঠিকই, বলবেন না।'

'আপনার যা খুশি ভাবতে পারেন। কিন্তু তার জন্য হঠাৎ সদলবলে ইয়টে হানা দিয়েছেন কেন, ব্যাপারটা জানতে পারি? তার অপরাধটা কি?' হালকা সুরে প্রশ্ন করল শহীদ।

মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর। 'দুঃখিত, মশিয়ে। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। তাছাড়া আশা করি আপনারা সবই জানেন। কারণ, আপনারা নিঃসন্দেহে তার দলের লোক।'

'আপনার ধারণাগুলো তো চমৎকার রকমের উদ্ভট বলে মনে হচ্ছে।'

'ইন্সপেক্টর আবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন শহীদের দিকে। তিনি বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাইরে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন পুলিস এসে ঢুকল। সে বলল, 'মি. ল্যাম্পকে ইয়টের কোথাও পাওয়া গেল না মশিয়ে ইন্সপেক্টর।'

ইন্সপেক্টরের কোনও ভাবান্তর হল না। তিনি শহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মি. ল্যাম্পকে কোথায় পাওয়া যাবে একথা আপনারা বলতে রাজি নন বলে বোধহয় ধরে নিতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'তাহলে আপনাদের সবাইকে আমি গ্রেফতার করলাম।'

'আমাদের অপরাধ?'

'অনেক। প্রথমত আপনারা মি. ল্যাম্পের ডীপসী র‍্যাকেট দলের লোক বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত আপনারা মি. ল্যাম্পের হদিস জেনেও তা প্রকাশ করেননি, অর্থাৎ পুলিসের সাথে অসহযোগিতা করেছেন। তৃতীয়ত, তৃতীয়ত...'

'আর তৃতীয়ত মসিয়ে ইন্সপেক্টরের সাথে ঠাট্টা করেছি।'

আবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া।

শহীদ বলল, 'আপনি মারাত্মক ভুল করছেন, ইন্সপেক্টর। আমরা কোনও র‍্যাকেটের সদস্য নই। আমরা অতিশয় নিরীহ শান্তিপ্রিয় কয়েকজন বাঙালী সন্তান। দিনার্দ বীচে বেড়াতে এসেছি। আমাদের পাসপোর্ট দেখতে পারেন ইচ্ছা করলে।'

'পাসপোর্টে ও সব লেখা থাকে নাকি, মশিয়ে?'

'থাকে না। তবে মানুষের চেহারায় আর পাসপোর্টের ছবিতে চরিত্রের কিছুটা প্রতিফলন থাকে। যেমন আপনার চেহারায় একটা নির্বুদ্ধিতার ছাপ---।'

'আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, মশিয়ে।' রাগে গর গর করতে করতে বললেন ইন্সপেক্টর। 'চলুন আপনারা সবাই পুলিস স্টেশনে। একদিন লক আপে থাকলে ইয়ার্কি বেরিয়ে যাবে।'

'লক আপ থেকে বেরোলে আপনারও ইয়ার্কি বেরিয়ে যাবে।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল শহীদ। বাংলাদেশের নিরীহ নির্দোষ নাগরিককে স্রেফ অকারণে গ্রেফতার করছেন। এর পরিণামে ফরাসী সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে লজ্জায় পড়তে হতে পারে। আর তার পরিণামে উপরওয়ালাদের কাছে আপনার বেইজ্জতি হবার আশঙ্কাটা উড়িয়ে দিতে পারেন না। চাকরি নিয়ে টানাটানি হওয়াও বিচিত্র নয়।

'সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না। এবার দয়া করে উঠে পড়ুন। মহুয়ার দিকে চেয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মাফ করবেন ম্যাডাম। আপনাকেও উঠতে হবে।'

মহুয়ার মুখটা অপমানে লজ্জায় কালো হয়ে গেল। সে করুণ দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকাল।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কোনও চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। কম করেও একশ জন পুলিস ঘিরে রেখেছে এই ইয়ট।'

শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ, চলুন।'